# আমির

# পিয়ারীলাল

অরুণ কুমার মজুমদার

ক্যালিয়ন
পাবলিকেশনস্
কলিকাতা ১২

রচনাকাল

[illegible]

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক

সুরেন্দ্র নাথ রায়

ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস্

৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর

নির্মল সরকার

নিও প্রিণ্টার্স

৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট

খাণী কুমার মজুমদার

দাম পাঁচ টাকা

# আমিন পিয়ারীলাল

অরুণ কুমার মজুমদার

## নিবেদন

ছোট বেলায় দেখেছি, গ্রামে জরীপের তাঁবু পড়েছিল একবার, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে কেমন উত্তেজনার জোয়ার এসে লাগলো। ভারী কৌতূহলী হয়ে দেখতাম ঐসব কর্মচারীদের। এরপরে এই জরীপ বিভাগের সংস্পর্শে এসে দেখলাম, বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিভাগ। তখন ভেবেছিলাম, এদের কথা লিখলে কেমন হয়? ১৯৫৮ সনে ডায়মণ্ডহারবারে প্রথম কিছুটা শুরু করি, এক বন্ধুকে পড়ে শোনাতে, সে হেসে বলে, কিছু হয়নি, কেউ ও লেখা কষ্ট করে পড়বেনা। কেন কাগজ কলম নষ্ট করছিস? লেখা সেই হতে স্থগিত থাকে।

তারপর আবার লিখতে শুরু করি বন্ধুবর শ্রীনীরেন রায়ের প্রেরণায়। দীর্ঘ ছ'মাস তিনি আমাকে কাবুলিওয়ালার মত তাগাদা দিয়েছেন। সেইজন্যই আজ এ লেখা প্রকাশ সম্ভব হোল। সুতরাং এ-বই প্রকাশের সমস্ত নিন্দা ও প্রশংসা তারই প্রাপ্য।

আর একটা কথা বলে রাখি, এ বইয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা, সন, সাহেব অফিসারদের নাম এবং কথা ছাড়া আর সব ক'টি চরিত্রই উপন্যাসের জন্য সৃষ্টি। যদি কেউ কোন চরিত্রের সঙ্গে কারুর কোন মিল খুঁজে পান, তবে সেটা নিতান্তই আকস্মিক। এ রচনায় অনেকের মুখের গল্পের সাহায্য নিয়েছি, তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। সেগুলিও গল্প ছাড়া কিছুই নয়। বইখানা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা পাঠক পাঠিকারা বিচার করবেন।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯ সন

কলিকাতা

অরুণ কুমার মজুমদার

উৎসর্গ

সমগ্র সেট্‌লমেণ্ট কর্মচারিদের
করকমলে

Amin Pyarelall, A novel

by

Arun Kumar Mazumder

**Price Rupees Five only**

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

মতিলাল সরকারের দেশ ছিল ফরিদপুর জেলায় নারাণপুর গ্রামে। তারা পাঁচপুরুষ সেখানে বাস করছে। মতিলালের পিতা ছিলেন চাষী, তবে তাদের বংশের এক পূর্ব্বপুরুষ নাকি জাফরখাঁন-মুর্শিদকুলিখাঁয়ের সময় যে জরীপ হয়, তাতে আমিন ছিলেন। তার পরিচয় তেমন কোথাও নেই। মতিলালের বাবা মতিলালকে কেন যে জরীপের কাজে ঢোকায় তা বলা মুস্কিল, সম্ভবতঃ বেশী পয়সা এবং সম্মানের মোহে। ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে মতিলাল পাশ করে বেরিয়েছিল, এবং ভাল আমিন হিসেবে একটা খ্যাতিও ছিল তার সেট্‌লমেণ্ট বিভাগে।

মতিলালের বিয়ের আগেই তার বাবা মারা যায় তখনও তার মা এবং বোন কাজুলী জীবিত। পিয়ারীর যেবার জন্ম হয় সে বছরই মার মৃত্যু হয় আর তার বছর তিনেক পরে যেবার গ্রামে খুব বসন্ত লাগে কাজুলী সেবার মারা পড়ে। আমিনের চাকরীতে দেশ বিদেশ ঘুরতে হয় বলে মতিলাল দেশে বড় একটা থাকতে পারত না। স্ত্রী সুশীলা, ছেলে পিয়ারীকে নিয়ে পাড়াপড়শীর ভরসায় দেশের ভিটেতেই পড়ে থাকতো। পশ্চিম পাশের চক্রবর্তী বাড়ীর জনার্দ্দন বাবু, এবং তার স্ত্রী সময়ে অসময়ে সুশীলার খবরাখবর করতেন। মতিলালের টাকা আসতো মাসে মাসে, কোন রকমে তাদের দিন চলে যেত। মতিলাল পূজায় একবার করে দেশে ঘুরে যেত।

১৯২৪ সনের কথা। মতিলালের ছেলে পিয়ারীর বয়স তখন একুশ। মতিলাল খুলনায় সাতক্ষীরার দোভাট্টা থানার মনিরামপুরে কাজ করছিল। অনেকদিন দেশে আসেনি। পিয়ারীর দিন, গ্রামের বন্ধু ক্ষুদীরাম, কেনা, বসন্ত প্রভৃতির সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মন্দ কেটে যাচ্ছিল না। শুধু অসুবিধে হল রেঁধে খেতে হচ্ছিল, কারণ মা সুশীলা অনেক দিন যাবৎ শয্যাগত।

পিয়ারী মার অসুস্থতার কথা চিঠিতে জানিয়েছে বাবাকে, মতিলাল

টাকা পাঠিয়েছে কিন্তু আসেনি। তার হাতে নাকি অনেক কাজ তখনও বাকী। সুশীলা অভিমান করে আর পত্র লিখতে পিয়ারীকে নিষেধ করেছে। সেদিনটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। সুশীলার শরীর ভাল না থাকায় পিয়ারীকে বলেছিল কাছে কাছে থাকতে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দেখে মা ঘুমুচ্ছে, তখন পিয়ারী আস্তে আস্তে ঘরের দরজার শিকল তুলে, একটু দূরে ক্ষুদিরামের বাড়ী আড্ডা দিতে গেল। গিয়ে দেখে ক্ষুদি তার নতুন বিয়ের হারমোনিয়ামটা নিয়ে গাইছে, "ও আমার দরদী আগে জানলে, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না।" উদ্দেশ্য হয়তো অন্তরালবর্ত্তিনী নতুন বৌ মায়াকে শোনান। পিয়ারীও ঐ যন্ত্রটী নতুন বাজাতে শিখেছে, উৎসাহ তাই প্রবল। ক্ষুদিরামের গলা থেকে ওটা নিয়ে, পিয়ারী বাজাতে স্থুরু করল, তারপর কত সময় পার হয়ে গেল, সে খেয়াল নেই। মার কথা মনে হল, যখন ক্ষুদিরামের বোন টেপী একটা হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়ে গেল। সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। পিয়ারী তাড়াতাড়ি উঠে ক্ষুদিরামকে বলল, দে ত ভাই একটা বিড়ি, বাড়ী যাই।" ক্ষুদিরাম একটা বিড়ি ওর হাতে দিয়ে অনুরোধ করে, "আর একটু বোসনা ভাই, ডি, এল রায়ের একটা গান শোনাই তোকে, নতুন শিখেছি।" বিড়িটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পিয়ারী মাথা নেড়ে বলে, না রে মার আবার একটু বাড়াবাড়ি, আজ যাই।"

ঘরে তেমনি শেকল তোলাই আছে। শেকল খুলে দেখে ঘর অন্ধকার। আলো জ্বাললো। মা তেমনিই ঘুমচ্ছেন। মাকে ডাকতে মা সাড়া দেয়না, শেষে গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই দেখে গা বরফের মত ঠাণ্ডা। সুশীলা যেন কোন সময়ে মরে কাঠ হয়ে রয়েছে। ঠিক এমনি সময় ঘরের চালে একটা তক্ষক কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠতেই পিয়ারী একটা চিৎকার করে জ্ঞানদা চক্রবর্তীর বাড়ীর দাওয়ায় এসে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল।

গ্রামের সবাই এলো। কিন্তু সে রাত্রে আর দাহ করা গেল না, কারণ সমস্ত দিনের গাম্ভীর্য্যের পরে রাত্রে প্রচণ্ড বর্ষণ স্থুরু হয়ে গেল। পিয়ারীকে মৃতের পাশে বসে সারারাত পাহারা দিতে হল।

মতিলাল এদিকে সতীশ রায়ের বারান্দায় বসে একবাটি মুড়ি-গুড় চিবোচ্ছিল। মুড়ি মেখে দিয়েছে সতীশ রায়ের অবিবাহিতা ভাগ্নী পারুলবালা। মুড়ি খেতে খেতে সে পারুলের দিকে বার বার চেয়ে দেখছিল, আর পারুলবালা মুচকে হাসছিল। বাসার অন্য সকলে তখন রান্নায় ব্যস্ত, সতীশবাবু বাইরে।

পারুলকে মতির ভারি পছন্দ। পারুলকে প্রথম সে দেখে যখন সে একজন চেন-ম্যান নিয়ে সতীশ রায় আর হারাধন মণ্ডলের বাড়ীর মধ্যেকার পুকুরটার পুরুষানুক্রমিক বিবাদের ফর্দ লিখছিল। দুই বিবদমান পক্ষ যে যার কাগজ পত্র দেখাচ্ছে, আর চেন-ম্যানরা পুকুরের পাড় বরাবর চেন ফেলে দেখছে কত চেন, কত লিঙ্ক, পাড়গুলির দৈর্ঘ্য। এমন সময় পারুলবালা কি কাজে ঘাটে হাত ধুতে এসেছে। হঠাৎ চোখ পড়তেই মতিলাল অবাক। বাঃ বেশ তো, ডাগর মেয়েটি, সাদাপানা গায়ের রং। কে মেয়েটি, সতীশবাবুর কি হয়? আমিনবাবুকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে পারুলবালা ফিক্ করে হেসে মুখের জল ফেলে লজ্জিত মুখে চলে যায়।

সেদিনের মাপের বিচারের রায়ে হারাধনবাবু খুসী হতে পারেনি। যাবার সময় বলে গেল, "বেশ, তজদিগের সময় দেখা যাবে। সেখানে তো হাকিম বসবে।" সেই দুপুরে আমিনবাবু সতীশবাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করল।

গ্রামের যে বাড়ীটায় মতিলাল থাকত, সেটি একদম গ্রামের প্রান্তে একটা বটগাছের নীচে। প্রত্যহ রাত্রে বিবদমান লোকদের কথা শোনা, তাদের একটা উপায় করে দেবার পক্ষে স্থানটি ছিল চমৎকার নিরিবিলি। সমস্ত দিনের কাজের পর একটা সতরঞ্চি পেতে দাওয়ায় বসে মতিলাল বিশ্রাম করত আর চেনম্যান বংশীবদন রান্না চাপাত।

পারুলবালাকে কিছু দিন দেখে দেখে, তার মুখের মিষ্টি হাসিতে সাড়া পেয়ে এই ছন্নছাড়া জীবন আর ভাল লাগেনি তার। কথায় কথায় সতীশবাবু কেএকটু আভাস দিতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কারণ, যখন জমি জমা চাষ ক'রে, প্রজার খাজনা আদায় করেই খেতে হবে তখন সরকারি আমিনবাবুকে হাতে রাখাটাই সুবিধাজনক। তার উপর

পারুলটার যদি একটা গতি হয়। বয়স ত কম হ'ল না। দেখা যাক্ মেয়েটার ভাগ্যে যদি বিয়ে থাকে।

কিন্তু মতিলালের ভাগ্যটা নেহাৎ খারাপ ছিল না। বাইরের দিকের ভাল ঘরখানাই সে পেয়েছিল। পেছনে পুকুর ; পারুলবালা এ পথেই ঘাটে যেতো। খুব ভোরে উঠে পারুলের হাতের মাখা চিড়ে দই খেয়ে, চেনম্যানদের মাথায় প্লেন্ টেবিল, গাণ্টার চেন পিন চাপিয়ে আর নিজের হাতে মেটাল স্কেল, অপটিকাল স্কোয়ার, ম্যাপের চোঙ্গা নিয়ে গ্রামান্তরে মাঠে রওনা হতো।

গতকাল বিকেলে যেখানে কাজ শেষ হয়েছে, আজ তার পরের প্লটে টেবিল পড়তো। কোন দিন মাঠে, কোন দিন ছায়াচ্ছন্ন গাছের নীচে, কোন দিন মজা পুকুরের পাড়ে কচুগাছের ঝোপের মধ্য থেকে কাজ সুরু হত। তাকে ঘিরে থাকত প্রজারা দাখিলা পাট্টা হাতে। দুপুরে সতীশবাবুর বাড়ী হতে ভাত আসতো। সেই সময় যা একটু বিশ্রাম। ভাত খাবার পরে একঘণ্টা অন্যান্য পিওনদের ছুটি। মতি তখন একটা গাছের নীচে শুয়ে বিড়ি খেতে খেতে চিন্তা ক'রতো আকাশ কুসুম, কত কি ; পারুলবালার সুডৌল মুখ, নিটোল হাত, স্বাস্থ্য-স্থূল পায়ের গোছা, একমুখ হাসি। এতদূর গড়িয়েছে, আর একটু এগুলেই তো—। কিন্তু সতীশবাবু কি রাজি হবেন ?

চেনম্যান ফিরে আসে, ছায়ায় অপেক্ষারত প্রজারা এগিয়ে আসে। তারপর টেবিল সামনে চলে, রৌদ্রভরা মাঠের দিকে। যে দাগে টেবিল পড়ে, সেখানে মতি জিজ্ঞেস করে, এ জমি কার ? নাম কি ?

একজন এগিয়ে এসে জবাব দেয়, "কৃষ্ণদাস মণ্ডল"। পিতার নাম ? সাকিন্ ? কত শতক জমি ? খাজনা কত। দেখি দাখিলা। সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যায় খতিয়ান, খসড়া। আবার টেবিল এগিয়ে যায় লম্বা লম্বা পা ফেলে। লোকজনও চলে, যার কাজ শেষ হ'ল সে ছাতা মাথায় বাড়ী ফেরে। এমনি করে কাজ চলে মাঠে মাঠে। লেখা হয় গ্রামের জমির বিবরণ, গো মহিষের ফর্দ, কৃষি উৎপাদন, ঘরবাড়ী, মসজিদ প্রভৃতির সংখ্যা।

রাত্রে আমিন ফিরে আসে ঘরে, ম্যাপ ঠিক করে, খতিয়ান খুলে

দেখে। কোন কোন দিন দুচারজন লোক হ্যারিকেন দুলিয়ে আসে। মতিলাল বাইরে যায়। দাওয়ার আঁধারে ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা হয়। মতিলাল বলে, অত কমে হবে না বাপু। একটা অস্পষ্ট কাকুতি-মিনতি, মরে যাব বাবু। কিছুক্ষণ পরে মতিলাল ঘরে এসে ঢোকে, হাত মুঠো করে। এদিক ওদিক তাকিয়ে মতিলাল সুটকেশ খোলে, কেউ দেখেনিতো ? একটা নারীমূর্তি অন্ধকারে কবাটের আড়ালে আড়ি পেতে দেখে, পলকে মিশে যায় উঠোনের অন্ধকারে। পারুলবালা।

এমনি করে একটির পর একটি দিন কাটছে। মতিলাল প্রাণপণে কাজ করছে, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, যে কদিন বর্ষা না আসে কাজ করতে হবে। বর্ষায় তো কাজ হবে না, পয়সাও নেই। মাঝে মাঝে পিয়ারীর চিঠিতে সুশীলার অসুস্থতার খবর সে পেয়েছে। তখন মন খুব খারাপ থাকতো। কিন্তু কি করে সে যায়। হয়তো বা তেমন কিছু নয়। তার চেয়ে, কটা টাকা পাঠিয়ে দিলে হয় না !

কয়েকদিন পরে, প্রায় তখন বিকেল। হঠাৎ দেখা গেল দূরে সাইকেল চেপে কে একজন আসছে। তার পরণে খাকী হ্যাফ প্যাণ্ট, আর মাথায় খাকী শোলার টুপি। তীব্রদৃষ্টিতে মতিলাল একবার তাকালো, তারপর বলল, "এই বংশীবদন, নে টেবিল তোল, সাহেব আসছেন, চাকরী থাকবেনা।" মতিলাল নিজেও ম্যাপ খুলে পর্চাটি লিখতে সুরু করে, "কৈ, ফটিক চন্দ্র বিশ্বাস, পিং·········।

কানুনগো সাহেব এসে নামেন। সাইকেল মাটিতে শুইয়ে রেখে, টুপি খুলে, প্লেন টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ান। রুমাল দিয়ে মুখ ঘসতে ঘসতে ডাকেন "আমিন বাবু।" মতিলাল তটস্থ হয়ে আভুমিনত হয়ে প্রণাম করে। "দেখি ম্যাপ। কোন প্লটে আমরা দাড়িয়ে আছি ?

আজ্ঞে এই সাতশো কুড়ি প্লটে।"

"আচ্ছা কত রিটার্ন দিচ্ছেন ডেইলী ? কত ? পঞ্চাশ ? হু'ম্। এখানে একটা পরতাল দেয়া হয়নি কিস্তোয়ারের সময়। টানুনতো এই চাঁদা হতে ট্রাভার্স পেগ পর্যন্ত।" বংশীবদন আর একজন লোক চেন টানল। মতিলাল কাটানগুলো লিখে আনল। কানুনগো সাহেব মিলিয়ে দেখলেন, তারপর পরতাল সই করে বললেন, ঠিক আছে। মোট

লেন্থ হ'ল একুণ চেন দশলিঙ্ক! ততক্ষণে ডাব এসে গেছে। ডাব খেয়ে, কানুনগো সাহেব সাইকেলে উঠলেন। যাবার সময় পকেট হতে মতিলালের নামের একখানা পোষ্টকার্ড দিয়ে গেলেন। চিঠিখানা লিখেছে নারানপুর থেকে জ্ঞানদা চক্রবর্তী। চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে মতিলাল অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়, তারপর মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। চিঠির অক্ষরগুলো চোখের সামনে একঝাঁক পোকার মত কিল-বিল করে উঠে ঝাপসা দৃষ্টির মাঝে মিলিয়ে যায়। ততক্ষণে কানুনগো সাহেবের সাইকেল মাঠ পার হয়ে, গ্রামের মধ্যে তাল, সুপারী, নারিকেল গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। চোখ তুলে আর একবার তাকায়। কাঁদেনা, ব্যথায় মূক হয়ে যায়। চিঠিখানা বয়ে এনেছে সুশীলার মৃত্যু সংবাদ।

## ॥ দুই ॥

মতিলাল যেদিন দেশে ফিরল, সেদিন ছিল মঙ্গলবারের হাট। জ্যৈষ্ঠ্যের বাংলার হাট। আমকাঁঠালের গন্ধে ম-ম করছে। কোথাও বড় বড় কালো জাম ডালায় করে বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিমা আম যে বিক্রেতা এনেছে তার আদর বড় বেশী। মজুমদারদের হাট, হাটের ওপর স্থাপিত পাথরের কালিবাড়ী। এদিকে পূর্ব্বপ্রান্তে শ্মশানের বড় বড় বটগাছগুলির পাতায় পাতায় বাউলের সুর। শ্মশানের এখানে সেখানে পোড়া কাঠ ছড়ান। যেখানে সুশীলাকে দাহ করা হয়েছিল তার অদূরে পিয়ারী বসে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছছিল। তার রান্নাবান্না নেই ক্ষুদিরামের বাড়ীতেই চলছে হবিষ্যি।

পূর্বপ্রান্ত দিয়ে মতিলাল আসছে, উসকো-খুসকো চুল, বিবর্ণ পোশাক। মতিলালকে দেখেই পিয়ারী ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। মতিলাল আর সামলাতে পারে না, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সেও কেঁদে ওঠে। তারপর বাপ আর ছেলে মিলে শূন্য ঘরে এসে ওঠে। জ্ঞানদাবাবুর বাড়ী থেকে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। মতিলালের

মন আজ এত- দিন পর স্ত্রীর শোকে যেন উথাল পাথাল। কতদিনের স্মৃতি, কত বর্ষা, শরৎ, শীত, গ্রীষ্মের সঙ্গিনী। এমন বন্ধু আর কে ছিল। তারই ঘরবাড়ী, সম্পত্তি পাহারা দিয়েছে। তাকে জীবিত অবস্থায় কত গালমন্দ করেছে, অবহেলা করেছে। আজ মতিলাল বুঝল, সুশীলা ছিল তার কতখানি আপন।

বাইরে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থামে হেলান দিয়ে ভাবে সুশীলার কথা। তার অনুতাপের আর অবধি থাকে না। হয়তো সুশীলা অন্তিম সময়ে কত ইচ্ছা করেছে তাকে কাছে পেতে, পথের দিকে ঘাটের দিকে তাকিয়েছে। একবারও সে তার আশা পূরণ করেনি। হতাশায় তার জীবনটা গেছে।

সে রাতের নৈশ জলযোগ ক্ষুদিরামের বাড়ীতেই সম্পন্ন হ'ল। পর দিন দুপুরে জ্ঞানদা চক্রবর্তীর বাড়ী গেল মতি। তখন তিনি সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। চক্রবর্তী-গৃহিণী রামায়ণ সুর করে পড়ছিলেন—

"পুনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জিয়া উঠিল।
কাটিয়া গজেন্দ্রমুণ্ড ভূমিতে পড়িল॥
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে দেহ আর ভিতে।
লাফ দিয়া বীরবাহু দাঁড়ায় ভূমিতে॥"

মতি যেতেই পড়া বন্ধ হ'ল। জ্ঞানদাবাবু এলেন, নানা কথা বললেন, সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে বোঝালেন। বললেন, "সংসার হ'ল—

সরসিদ্বলগত জলমতিতরলং।
তদ্বৎ জীবনং অতিশয় চপলম্॥

কে কার এ সংসারে, মায়ার সংসারে সবই মায়া। মনস্থির করে শেষ কাজ কর, আর ছেলের একটা ব্যবস্থা কর, বয়স ত হ'ল। আমার লক্ষ্মীর দু' তিন বছরের বড়। মতিলাল বলে "ওকে এবার আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, আমার কাজেই ঢোকাব ভেবেছি।"

জ্ঞানদাবাবু বললেন, "তাই ভাল, পিতার বৃত্তি ছেলে নিলে দক্ষতা সহজে জন্মাবে।"

এরপর একদিন শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকল। মতিলাল বৃষোৎসর্গ করল।

তারপর বাড়ী ঘরের ভার জ্ঞানদাবাবুর হাতে দিয়ে, ছেলের হাত ধরে রওনা হলেন কর্মস্থলে—সাতক্ষীরার মণিরামপুরে। সতীশবাবু আদর করে পিয়ারীকে ঘরে নিলেন। পারুলবালা খুব যত্নআত্তি করল।

ঠিক হ'ল চেষ্টা চরিত্র করে ছেলেকে সেট্‌লমেণ্টে ঢোকাতে হবে ; তার আগে ভাল করে কাজ শিখুক। পারুলবালার চিন্তাও ধীরে ধীরে মতিলালকে পেয়ে বসল। ছেলে বড় না হ'লে অত ভাবনার কিছু ছিল না। অনেকেই তো দুটো এমন কি তিনটি বিয়ে করে।

কথাটা, একবার ভাবল সতীশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবে। তারপর ভাবল, দেখাই যাক না, সতীশ রায় নিজে কিছু বলে কি না। সময়ে সব শোকই স্তিমিত হয়ে আসে। পারুলবালার মোহ, মতিলালের স্ত্রী বিয়োগের শোকও ধীরে ধীরে ভুলিয়ে দিল। যা অবশিষ্ট রইলো, তা হ'ল শুধু স্মৃতি। সে ত সারা জীবনেরই সাথী।

রোজ সকালে মতিলাল বেরয়। সঙ্গে থাকে পিয়ারীলাল। পিয়ারী প্রথমটা রোদ্দুরে খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো নতুন জীবনে। কাজের চাপে মা'র মৃত্যুর শোকটাও যেন অস্থাতে কমে আসতে থাকলো। কাজের রহস্যটা তার মনকে হরণ করল। সে শিখল প্রথমে পি-৭০ সীটের উপর ট্রাভার্স পার্টি। যে খুঁটি করেছে, তার অস্তিত্ব সরজমিনে খুঁজতে হবে। প্রথমেই সীট কানুনগো সাহেব দেবে না, ওর একটা নকল তুলে ঐগুলি মেপে কানুনগো সাহেবের কাছে আনতে হবে। তিনি সীটের ঐ খুঁটিগুলি মিলিয়ে দেখবেন, তারপর কতগুলি মোরববা অর্থাৎ চতুর্ভুজ বা বহুভুজ তৈরী করে দেবেন। এবং অর্ডার লিখে দেবেন, কিস্তোয়ার অর্থাৎ প্লট করে ম্যাপ তৈরী করো।

ম্যাপ তৈরীর মাঝে মাঝে কানুনগো সাহেব বা অন্য অফিসাররা এসে চেক্ করেন ম্যাপের মাঝে পরতাল লাইন টেনে। তার পর যখন ম্যাপ তৈরী হল, তখন নীল কালি লাগান হল, এবং বায়ু কোণ হতে এক, দুই, তিন···করে প্লটের নম্বর হ'ল। এই হ'ল কিস্তোয়ার অর্থাৎ ম্যাপ তৈরী। এরপর খানাপুরী বুঝারত বা প্রাথমিক রেকর্ড রচনা, সঙ্গে খসড়া বই তৈরী। গো-মহিষাদির ফর্দ, সাধারণের ব্যবহার্য্য তালিকা প্রভৃতি তৈরী।

মতিলাল ওকে যে কটা মৌজা কিস্তোয়ার বাকী ছিল তাই দিল

করতে। চেন পিওন বংশীবদন ওর খুব বাধ্য, ভুল হলে সেও দেখিয়ে দিত। ক্রমে অপটিক্যাল প্রিজম্, সাইট ভেন্, শেষে এমন সুন্দর ডিভাইডার ধরতে শিখলো যে মতিলাল পর্যন্ত অবাক।

মাস দুয়েকের মধ্যে পিয়ারী কিস্তোয়ারে চোস্ত হয়ে উঠলো। এরপর খানাপুরি ধরল বাবার সঙ্গে। খতিয়ানের ঘরগুলি, খসড়ার ঘরগুলি ; সেট্‌লমেণ্টের কায়দাটা শিখে গেল। চেনম্যান খুব বাধ্য ছিল বলে কাজ খুব চমৎকার হ'ত। হাতের লেখাও চমৎকার, খতিয়ান লেখাগুলিও পরিষ্কার হ'তে থাকল।

•মতিলালের দিনগুলি ভালই কেটে যাচ্ছে, পারুলবালাকে নিয়ে। সতীশবাবু ভাবগতিক দেখে যেন একটু বেশী গা ঢাকা দিচ্ছেন। মেয়েরাও আড়াল হতে একটু রগড় দেখছে। শুধু পিয়ারীকেই যেন একটু লজ্জা।

গ্রামের লোকদের কিন্তু বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, মতিলাল পারুলবালাকে বিয়ে করবে। কথাটা আরও বেশী করে রটিয়েছে হারাণ মণ্ডল। গ্রামের রসনা এরকম চাটনী পেয়ে আরও যেন উগ্র হয়ে পড়েছে। শুধু মতিলালকে চটাতে কেউ সাহস পায়না, তাই প্রকাশ্যে কোন কথা হচ্ছে না। মতিলাল আর পারুলবালা গোপনে কেবল পরামর্শ করে, শুধু ছেলেকেই ভয় ভয়, লজ্জা লজ্জা, এই যা।

বর্ষা এসে গেল। যখন তখন যেন বৃষ্টি নামছে আকাশ ভেঙ্গে। মতিলালের শরীরটা ভাল যাচ্ছেনা, একটু আমাশা আমাশা ভাব। এসব ক্ষেত্রে ছেলের ওপর নির্ভর করা চলে বলে, ওকেই মাঠে পাঠাচ্ছে। তাছাড়া মাঠে প্রায় জল উঠি উঠি ভাব, কে আসবে ইন্‌সপেকশানে। ছেলেও কাজ চালাচ্ছে বেশ।

ছেলেকে ডেকে সে বলত, "দেখ কাজ করলেই যখন পয়সা, কেন বসে থাকব। তাছাড়া তুইতো বেশ কাজ শিখেছিস্, শ্যামপুর মৌজার খানাপুরিটা সেরে ফেল। ডিস্‌পিউট থাকলে রাত্রে আমার কাছে আসতে বলবি।'

সেদিনটা বোধ হয় ছিল রবিবার। আমিনদের যেখানে কাজ করলেই পয়সা, সেখানে রবিবার ও যা সোমবারও তা। এরপর মাঠ ঘাট থৈ থৈ করবে। তখন কাজতো লবডঙ্কা।

পিয়ারীলাল বেরিয়ে যায় চেন পিওন বংশীবদনকে নিয়ে। বেলা এগারটা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি এলো। যারা বাইরে যায়নি, তারা বাইরে বেরন বন্ধ করল।

একটু যেন শীত শীত লাগছে। ঝমঝম শব্দে টিনের চালে বৃষ্টির ধারা পড়ছিল। উঠোন জলে ভর্তি হয়ে গেল। স্রোত প্রবলভাবে দু'ঘরের মধ্য দিয়ে পুকুরের দিকে চলেছে। কচু গাছগুলির যেন স্ফূর্তি, দুহাত তুলে হেলছে দুলছে। দীর্ঘদেহ বাঁশবনগুলি অবনত মস্তকে বৃষ্টির ধারা গ্রহণ করছে।

মতিলাল আর স্নান করলনা, পারুলকে বলল ভাত বেড়ে দিতে।

জলের ছাঁটে দাওয়া ভিজে গেছে। তাই রান্নাঘরেই বসল। গরম ভাত বেশ তৃপ্তির সঙ্গে মাছের ঝোল, ভাজা, ডালের সঙ্গে খেল। পারুলবালা লুকিয়ে একটু ঘি দিল পাতে। উঠবার সময় ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল পারুলকে। পারুলবালা এদিক ওদিক তাকিয়ে মার্জারীর মত দেখল কেউ আছে কি না, তারপর বলল, "আচ্ছা।"

মতিলাল ঘরে গিয়ে দেখে জানালা দিয়ে জলের ছাঁট আসছে। জানালাগুলো বন্ধ করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল, একখানা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে। বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি আরও অন্ধকার করে নেমেছে। সতীশবাবু আজ তিন দিন হল সাতক্ষীরায় গেছেন মামলার কাজে। সতীশবাবুর স্ত্রী ও মা দুজনেই খাওয়া দাওয়া সেরে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে। পিয়ারী সকালে খেয়েই বেরিয়েছে। মতিলালের তখন সবে তন্দ্রা এসেছে। খাওয়ার পরে, রান্না ঘরের দরজা দিয়ে, একটি পান ও তর্জ্জনীতে একটু চুন নিয়ে এক দৌড়ে মতিলালের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একটা ধাক্কা দিতেই, মতিলাল ধড়ফর করে উঠে বসল। পানটা তার হাতে দিয়ে সন্তর্পনে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল পারুলবালা।

পান চিবোতে চিবোতে পারুলবালা বলে, এবার যা হয় একটা বিহিত কর।

মতি বলে, সামনের অগ্রহায়ণেই করব। তোমার মামা রাজি হবেন তো ?

পারুলবালা ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, খুউব, বর্তে যাবেন।

বাইরে প্রকৃতি যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। আজ পৃথিবীতে সেই শেষের দিনের প্রলয় ঘনিয়েছে যেন। চারিদিক অন্ধকার, মেঘের ডাক আর অশ্রান্ত বর্ষণ। প্রায়ান্ধকার ঘর। মেঝেতে জল আসছে দেখে, পারুলবালা পা তুলে চৌকিতে বসল। মতিলাল একবার ইতস্ততঃ করে, জোর করে পারুলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে. নিজের কাঁথার অপর প্রান্তটি ওর গায়ে তুলে দেয়। দুজনেই নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মশগুল হয়ে পড়ে। বাইরে কোথায় কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল বুঝি।

॥ ৩ ॥

বর্ষাটা কেটে যেতেই শরতের রৌদ্রস্নাত দিনগুলি উঠল যেন হেসে। পূজার ছুটির আগে আগে মতিলাল ভাবল মনে মনে, সদরে গিয়ে ফকাস সাহেবকে ধরতে হবে ছেলের জন্যে। এখন ধরতে পারলে ওর একটা গতি হয়ে যাবে। তবে ও যেমন বোকা, ওর দ্বারা হয়ত এদিক ওদিক করে দু'পয়সা রোজগার সম্ভব হবে না। একদিন মতিলাল চিঠি ও ছুটির দরখাস্ত দিয়ে বংশীবদনকে এটেস্টেশান ক্যাম্পে পাঠালো। সারাদিন উৎকণ্ঠায় কাটল। সন্ধ্যার সময় দুজনেই অস্থির হয়ে পড়ল। ছুটি কি পাওয়া যাবেনা! রাত আটটায় পারুলবালা ঠাঁই করে খেতে ডাক দিল। খেতে স্মুরু করেছে, এমন সময় বংশীবদন এল। অফিসার লিখেছেন দেখা করতে যাবার কোন প্রয়োজন নেই, আগামী সপ্তাহে তিনি মতি-লালের সীটে যাবেন। কি সর্বনাশ! উত্তেজনায় মতিলাল খেতে পারে না। কোনমতে ক'গ্রাস খেয়ে জল খেয়ে উঠে পড়ল। সতীশবাবুর মা অদূরে বসে লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, উঠছো যে, ঐ মাছের মুড়োটা খেয়ে নাও বাবা। এই দেখ ছেলেও উঠছে, বাবাকে দেখে। ততক্ষণে তারা হাত মুখ ধুয়ে চলে গেছে। সেটেলমেন্ট অফিসারের ইনস্পেকশান যে কি বস্তু, তা বুড়ি কি করে বুঝবে।

অসমাপ্ত খসড়া ও ম্যাপের চোঙ্গাটা নিয়ে কাজশেষ করে ফেলতে

হবে। চোঙ্গা খুলে ম্যাপগুলি টেনে বার করল। তারপর খসড়া খতিয়ান বই চৌকিটার উপরে রেখে মতি একটা বিড়ি ধরায়। পিয়ারী টিনের স্যুটকেস খুলে মেটাল স্কেল ও ডিভাইডার বার করে, বাবার কাছে বসে। পারুলবালা এসে একটা পান ও চুন দিয়ে গেল। পিয়ারীলাল ম্যাপ খুলতে যাচ্ছে, মতিলাল ইসারা করে নিষেধ করল। বলল, গুাখ, যতক্ষণ বিড়ি, পান খাবি বা দোয়াত কলমের কাজ করবি, ম্যাপ খুলবি না। একটু দাগ হলে ম্যাপ আর হল না।

পিয়ারী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল। বিড়িতে শেষবারের মতন একটা সুখটান দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "নে এবার খোল। মৌজা ধারা, জে এল নং ১৮, থানা দোভাট্টা। আমি খসড়া পড়ব, তুই দেখবি আলামত ও এরিয়া ঠিক আছে কিনা। পরে খতিয়ান মেলাব।" পিয়ারী মাথা নাড়ে।

মতি বলে, আচ্ছা বল এক নং প্লট আটশতক শালি, আলামত নেই। ঠিক আছে? পিয়ারী মাথা নেড়ে জানায়, ঠিক আছে। "তুই নং প্লট, শালি এক একর ছ' শতক? পিয়ারী মাথা নাড়ে। বাবা বলছে, ছেলে ম্যাপ মিলিয়ে দেখছে, আর প্লট মেপে মাথা নাড়ছে। রাত তু'টোয় কাজ শেষ হল। ধারা মৌজার সব কাজ শেষ করে, খানাপুরি খতিয়ান গুলি মিলিয়ে তুজনেই শুতে গেল।

সারাদিন কাজ করে পিয়ারী শ্রান্ত, তারউপর রাত হয়েছে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। মতিলালের মাথায় তখন চিন্তার রাশি পাক খাচ্ছিল। সেট্‌লমেণ্ট অফিসার ফকাস্ সাহেব আসছেন, তুর্দ্দান্ত রাগী সাহেব, ২৪ পরগণা আর খুলনা, তুটোর চার্জেই আছেন। যদি খুশী হন, ছেলের জন্য একটি চাকরী চাইবে। হঠাৎ খেয়াল হল, দক্ষিণের জানালায় টুক টুক শব্দ। নিশ্চয় পারুলবালা। তাড়াতাড়ি উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেয় পারুল-বালা, তারপর মতিলালের পাশে গিয়ে শোয়। অদূরে পিয়ারীলাল সারা-দিন পরিশ্রমের পরে ঘুমোচ্ছে, সেদিকে সন্তর্পণে একবার তাকিয়ে পারুলবালা মতিলালের বুকে মুখ রাখল।

ইন্‌সপেকশানের দিন সকাল।

ছুজনে খুব ভোরে উঠে স্কেল, ডিভাইডার, রেকর্ড, সীট সব কিছু গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিল। কাজ হচ্ছিল ধারা মৌজায়, এখান থেকে মাইল ছুয়েক দূরে। সকাল সকাল রান্না শেষ। পিতা-পুত্র, চেনম্যান সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে, মতিলাল পিয়ারীকে আগে বংশীবদনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। মতিলাল একটু বিশ্রাম নিল। অদূরে দণ্ডায়মান সতীশবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "যাবেন তো ?" সতীশবাবু বললেন, "আমি যাচ্ছি, আপনি যান। তারপর গলা নিচু করে বলেন, "এবার বিয়েটা সেরে ফেলুন, আর ভাল দেখায় না যে।" মতি বলে, "নিশ্চয়ই, এই অগ্রহায়ণে বিয়ে করব।" সেও যেন কথাটা বলে আনন্দ অনুভব করে। যাক, সতীশবাবু রাজি তাহলে। একটি বিড়ি ধরিয়ে মতি বেরিয়ে গেল ধারার দিকে।

মতিলাল দৃষ্টির আড়ালে যাবামাত্রই সতীশবাবু পারুলকে ডাকলেন। "ও পারু, পারু শুনি যানা। বলি হইছে, আমিনের বৌ হবিত, তাই এত দ্যামাক হইছে। একটা পান পালি খাতাম।" পারুলবালা হাত মুছে একটা পান এনে দেয়। তার মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, মামার কথায়। আবার একটু গর্ব্বিও যে না হোল এমন নয়। এতবড় আমিনকে ত বশে রেখেছে। সতীশবাবু পান খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধারার দিকে।

ধারার মাঠগুলি আমন ধান বুকে নিয়ে গর্ব্বে সারা হচ্ছে। পুরবৈঁয়া বায়ুতে একবার পশ্চিম দিকে হেসে লুটিয়ে পড়ছে, আবার উঠছে মাথা তুলে। মাঠের কাজ আগেই শেষ হয়েছে, কয়েকটা বস্তির কাজ বাকী। সকলে মন দিয়ে কাজ করছে, দৃষ্টি কিন্তু রাস্তার দিকে। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের পাকা সড়কটা এখনো ডোবেনি।

বেলা বারোটা নাগাদ দূরে তালগাছের, নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে কয়েকখানা সাইকেল আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম দেখল বংশীবদন, তারপর সকলেই। একটু কাছে আসতে দেখা গেল পাঁচ খানা সাইকেল। প্রথমটায় কানুনগো সাহেব পথপ্রদর্শক, দ্বিতীয়টায় সেটলমেণ্ট অফিসার, তৃতীয়টাতে চার্জ অফিসার ও সর্ব্বশেষে ছুইজন আর্দ্দালী। মতিলাল

হাঁকলো, "এই ওদিকে কি দেখছ, কাজ করো। জনতার যে একাংশ ছিল তারা একটু দূরে সরে গেল, কারণ সাহেবের গালাগালি, ছু এক ঘা, তারাও যে ভাগে পায়নি এমন নয়। মতিলালের বুক ছুরু ছুরু করছিল। সাইকেলগুলি নিকটে এসে গেল, সাইকেলগুলিকে মাটিতে শুইয়ে রেখে, মুখ মুছতে মুছতে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার নিজে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। চার্জ অফিসার পাশে দাঁড়ালেন। একটু দূরে কানুনগো সাহেব একজন ভদ্রলোকের কানে কি মন্ত্র দিতেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকলের পরনে খাঁকী হাফপ্যাণ্ট, মাথায় শোলার টুপি, পুরো মোজা পায়ে কালো স্থ। খুলনার সেট্‌লমেণ্ট অফিসার ফকাস্ সাহেব, বাংলায় তার অপূর্ব্ব দখল। প্রথমে ম্যাপটা পরীক্ষা করলেন। বললেন, আচ্ছা দেখি ডিভাইডার স্কেল। মাপো ত এই কোণ থেকে ঐ বটগাছ, কত হোল ? বংশীবদন আর মতি বলল, "তিন চেন আট লিঙ্ক।"

ঠিক ঠিক মিলে গেছে। সাহেব প্রসন্ন হলেন। ছু একটা প্লট তিনি টেষ্ট করলেন, আলামতগুলি দেখলেন, তারপর খতিয়ান নিয়ে উপস্থিত ছু একজন লোকের সঙ্গে কথা বললেন। কোন ত্রুটী ধরা গেল না। চার্জ অফিসারকে বললেন, "একে দিয়ে আমরা বুজারত করাতে পারি, কি বলেন ? চার্জ অফিসার বললেন, "মতিলাল পারবে স্যার।" যে ভদ্র-লোক অদৃশ্য হয়েছিলেন তিনি এর মধ্যে এক কাঁদি ডাব এনে উপস্থিত করেছেন। সেট্‌লমেণ্ট অফিসার পর পর তিনটে ডাব খেলেন। চার্জ- অফিসার খেলেন একটা। ফকাস্ সাহেব ডাব খেয়ে সিগ্রেট ধরান। ফকাস্ সাহেব ডাব খেতে খুব পছন্দ করেন, এই ডাব খাওয়া নিয়ে একটা মজার গল্প সেট্‌লমেণ্টে শোনা যায়। সত্যি মিথ্যে জানা নেই। একবার খুলনা বাগের-হাটে যাবার পথে তিনি প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করেন, সঙ্গে ছুজন কানুনগো। কোন টিউবওয়েল চোখে পরছে না, বাড়ীও নেই। খুব মুস্কিল হল তো। আরও কিছু দূর যেতেই একটি উঁচু পুকুর পারে কয়েকটা ডাবগাছ চোখে পড়ল। গাছে ডাব আছে, কিন্তু যেমন খাড়া গাছ, কে উঠবে ? সঙ্গে কানুনগোর একজন মহিমচন্দ্র গাঙ্গুলী, ব্রাহ্মণ সন্তান। অন্যজন মুসলমান, নাম মুজিবর রহমান। মহিমচন্দ্র ইতঃস্তত: করছে দেখে, মুজিবর জুতো খুলে তড়াক করে গাছে উঠে গেল। ফকাস্ সাহেব নীচে

দাঁড়িয়ে কানুনগোর কার্যে প্রীত হয়ে হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন, "ব্রেভো মুজিবর। মহিম হাততালি দেও, দেখো মুজিবরের কি সাহস। এরকম লোকই সেট্‌লমেণ্টে চাই। টোমার কিছু হোবেনা, টুমি কুঁড়ের হিমালয়।" মহিমচন্দ্র তখন আত্মধিক্কারে মুখর, কেন সে নারকেল গাছে চড়া শিখলনা। মুজিবর গোটা ছয়েক ডাব পেড়ে আনল, সকলে খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করল। কাজকর্ম শেষ হবার পর খুলনা ফেরার সময় ফকাস্ সাহেব মুজিবরকে বললেন, "তুমি পুরষ্কার পাবে, চিন্তা ক'রনা।" ঠিক দু'মাসের মধ্যেই মুজিবর হল সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। অন্যান্য ধুরন্ধর কানুনগোরা হিংসেতে জ্বলে পুড়ে উঠল। ব্যাটা কাজ জানে না, ইংরিজী বলতে পারে না, লিখতে জানে না, শুধু ফকাস সাহেবকে ডাব খাইয়ে সাবডেপুটি। উঃ কি অদৃষ্ট।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। কিছুদিন পরে মুজিবর সাহেবের চিঠিতে ভুল ইংরিজী দেখে আড়ালে মুখটিপে হাসে সবাই। দু' একজন মুখের সামনেই ইঙ্গিত দেয়। এ খবরটা চারিদিকে রটে গেল। মুখে মুখে খবরটা সেট্‌লমেণ্ট অফিসারও শুনলেন। তিনি কোন কথা না বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

পরের মাসে কন্‌ফারেন্সে সকল কানুনগো, সার্কেল অফিসার খুলনায় এলে, তিনি কাজ শেষে বললেন, "লুক্, আমি দেখছি, টোমরা মুজিবরের প্রমোশান দেখে জেলাস্ হয়েছো। তাই টোমরা ওর ইংরিজীর ভুল ধরছো। ওকে আমি প্রমোশান দিয়ে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দিলাম, তাহলে ওকে আর নিজের হাতে ড্রাফ্‌ট করতে হবে না। টোমরা ঠাট্টাও আর করতে পারবে না। কেমন জব্দ।" সকলে আবার একদফা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যাক, সাহেবের ইন্‌স্পেকশান হয়ে গেল, মতিলাল হাত জোড় করে ছেলের কথা সাহেবের কাছে পাড়ল।

ফকাস্ সাহেব বললেন, 'অলরাইট, আমি একজামিন কোরব। ডাক তোমার ছেলেকে।'

পিয়ারী এতক্ষণ একরকম আত্মগোপন করে ছিল। কাঁপতে কাঁপতে এসে হাত জোড় করে আভূমিনত হয়ে নমস্কার করল।

প্রথম প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বল তো গাণ্টার চেনের লেনথ কত ?"

পিয়ারীলাল পট্ করে উত্তর দেয়, "একশো লিঙ্ক বা বাইশ গজ।"

সাহেব উজ্জ্বল চোখে তাকায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো "বেশ এই প্লটটা মাপোতো।"

পিয়ারী একার-কম্বব ও ডিভাইডার দিয়ে মেপে বললো এক একর ত্রিশ শতক।"

সাহেব জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা বলো তো খতিয়ানের কোন কলমে দখল লেখা হয়।"

উত্তর—"তেইশ কলমে।"

সাহেব খুশী হয়ে বললেন, "আই সি, তুমি ভবিষ্যতে একজন গুড আমিন হোবে।" আরও কতগুলি প্রশ্ন করলেন। তারপর পিয়ারীর নাম, ধাম, বয়েস প্রভৃতি লিখে নিয়ে অন্যান্য অফিসারদের নিয়ে সাইকেলে চড়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়কে উঠে অদৃশ্য হলেন।

এই ফকাস্ সাহেবই পরে ডিরেক্টার হন ॥

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

দেখতে দেখতে পুজার ছুটী এসে পড়ল। আজকের কর্মব্যস্ততার মধ্যে ছুটীর বিশ্রামের মধুর প্রতিশ্রুতির যেন আভাস মিলছিল। মতিলাল তৈরী হ'ল দেশে যাবার জন্যে। পিয়ারী খুশীতে আত্মহারা। ছুটীর মাত্র দুদিন আগে মতি সদরে গেল টাকা আনতে, যাবার সময় পিয়ারীকে বলে গেল মোটামুটি গোছগাছ করে রাখতে। মাঝে একটা দিন ত। ম্যাপ, মৌজা এগুলো জমা দিতে হবে, তাই সঙ্গে নিল।

পিয়ারীলাল গোছগাছ সুরু করল। পারুলবালা পাশে বসে সাহায্য করল। অনেক বেলা অবধি ট্রাঙ্ক, টিনের সুটকেশ গোছান হ'ল। পারুলবালা চুপ করে কয়েকখানা চিনির সন্দেশ, কয়েক টুকরো গুড়, কিছুটা সরু চিঁড়ে আর কিছু মিষ্টি আমসত্ত্ব, এই মাতৃহীন ছেলেটার

ট্রাঙ্কের এক কোনে দিয়ে দিল। পিয়ারী পারুলবালাকে একটু লজ্জা লজ্জা করত। পারুল এই ছেলেটীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ যেন কি ভেবে নিল, তারপর বলল, নেও, ওঠ বাবা, বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে পিয়ারী একবার গ্রামে বেরিয়ে পড়ল।

গ্রামের বাইরে বিরাট বট গাছটার নীচে চুপ করে বসে রইল সে। এ বট গাছগুলি যেন উদাসীস্বরে কি এক গান গায়। তা যে কি, পিয়ারী বোঝে না।

অনেকটা এরকম শুনেছিল নারানপুরে এক বাউলের মুখে। সে গান ভারি মিষ্টি, শুনতে খুব ভাল লাগে কিন্তু কি যেন এক বৈরাগ্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। গ্রামের চারদিকের মাঠ, ধানক্ষেত, কত রকমের গাছ, যেন তার সামনে এক অদ্ভুত রূপে আজ উপস্থিত হয়েছে। স্বপ্নাতুর মন তার এ গ্রামকে ছেড়ে যেতে যেন কষ্ট বোধ করছে। কিন্তু সে তো জানে না, আরও অনেক, অনেক নতুন তাকে আহ্বান করবে। বালণ্ডা পরগণার মাঠ, কলিকাতার রাস্তা, মুড়াগাছার প্রান্তর, হাজীপুরের পাকা সড়ক পায়ে পায়ে দ'লে কত নতুনের সঙ্গে সখ্যতা করতে হবে। কত অজানিত পুরুষ ও নারীর সঙ্গে হবে তার সখ্যতা। পুকুর, পথ শ্মশান, শালি জমি, খাল নদী, বিল, নয়ানজুলী প্রভৃতি কত শ্রেণীর জমির পরিচয় সে গ্রহণ করবে, তাদের প্রকাশ করবে। যে দুরূহ কাজ তার জন্য বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করেছেন, তার সবটুকুই তো এখন সামনে। প্রকৃতিকে জানবার, ভাল বাসবার আগ্রহ না হলে তো ভাল আমিন হওয়া যায় না। দীর্ঘ বটের ছায়ায় ও হাওয়ায় তার দুই চোখ ভরে ঘুম এল। শিকড়ের উপর বসে গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বেলা গড়িয়ে গেছে, নাপিত পাড়ার রতন পরামানিক যাচ্ছিল, ঠেলা দিয়ে পিয়ারীকে তুলে দিল, "ও আমিন পো, এখানে ঘুম দিচ্ছো যে? ওঠ।"

পিয়ারী উঠে বসে। ঘামে গলার কাছটা ভিজে গেছে। তারপর লজ্জিত মুখে, বটপুকুরটার কাছে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল। রতন ততক্ষণে চলে গেছে। পিয়ারীও বাড়ীর পথ ধরে।

মতিলাল এল রাত আটটায়। সে শুধু টাকাই আনেনি। পূজার নতুন কাপড় চোপড়ও এনেছে। সতীশবাবু, তার মা, তার স্ত্রী প্রত্যেকে একখানা করে কাপড় পেল। পিয়ারীর জন্য একখানা। পারুলবালার জন্য এসেছে সাতক্ষীরার বাবুদের দোকান হতে তাঁতের শাড়ী। কি সুন্দর সেটা দেখতে! পাড়ের মাঝে আবার জড়ি বসান। সকলেই খুশীতে আত্মহারা। এছাড়া পিয়ারী পেল একজোড়া লাল কাপড়ের জুতো আর পারুলবালা একশিশি "সতীলক্ষ্মী" তরল আলতা।

এ প্রাচুর্য্যের মধ্যে আর একজনের জন্য একটু কষ্ট হয় বৈকি, মতিলালের। সুশীলা যদি আজ এরকম কাপড় পেত কি আনন্দই হত তার।

রাতে ঘাটে মুখ ধোবার সময় সবার আড়ালে পারুলবালা, মতিকে পেয়ে কেঁদে ফেলল, তুমি আবার ফিরে আসবে ত? মতি ত অবাক। ফিরব না মানে। পারুলবালা চোখের জল মুছে বলে, না হলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দেব বলছি। মতি সরে এসে ওকে একটু আদর করতে যায়। ঘাটে যেন কেউ আসছে। তাড়াতাড়ি দুজনে দুদিকে চলে যায়।

মতি বিস্মিত, বিব্রত হয়ে ভাবে, পারুলবালা যে কি জালেই তাকে বেঁধেছে, তার আর মুক্তি নেই।

.

রাত তখনও বেশ আছে, ওরা রওনা হল। পিয়ারীর ঘুমের চোখ। নৌকায় বিছানা পাতাই ছিল, শুয়ে পড়লো। মাঝিরা তামাক খাচ্ছিল, শেষ হলে নৌকা এক ধাক্কা দিয়ে, গলুইএর ওপর উঠে বসল। নৌকা চলতে সুরু করল। পাড়ে দাঁড়ান অস্পষ্ট মূর্তিগুলি হ্যারিকেনের আলোতে কিছুক্ষণ দেখা গেল; তারপর দৃষ্টির আড়াল হল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই, ঘুম ভাঙ্গল খুব সকালে, তখন নৌকা এক নদীর মধ্য দিয়ে চলেছে। পিয়ারী বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল। বাঃ কি সুন্দর! বিস্তৃত নদী, ওপারে ধুধু করে চর, ডান পাড়ে শ্যামল গাছপালা, দুএকখানা গ্রাম। সূর্য উঠছে। নদীতে ছোট ছোট ঢেউ। একটা উদার পরিবেশের মধ্যে যেন ঈশ্বর প্রকৃতি সেজে মানুষকে মুগ্ধ করছেন। সহজে ঈশ্বরের কথা মনে আসে। বাবা তখনও ঘুমচ্ছিল। সে কৌতূহলী হয়ে তখন নদীপারের কাশবন, নদীর পার হতে চলে

যাওয়া ছোট রাস্তা, গ্রামের শ্মশান, সব দেখছিল। এ সমস্ত বিশাল প্রান্তর, অজ্ঞাত দেশ, কেউ তাহলে নামহীন, গোত্রহীন নয়। মানুষ তাকে গাণ্টার চেন দিয়ে মেপে জুকে, হিসেব কষে, পরিচয়, দখল, পরিমাণ, ফসল সব লিখে রেখেছে? বড় আশ্চর্য ত! সমস্ত বাংলা দেশ মাপতে তবে কত আমিন লাগে?

বেলা বেড়ে চলল, সূর্যের আলোতে দুপাশ পরিস্কার হয়ে উঠল। গ্রামের অভ্যন্তরে দুএকটি মন্দির বা জমিদারবাড়ীর চূড়া দেখা যাচ্ছিল। মতিলাল ঘুম হতে উঠে, নদীর জলে মুখ ধুয়ে নিল। জল আর এখন নোনা লাগে না। জোয়ার ভাটার টানটাও তেমন নেই।

মতিলাল বাক্স খুলে একটা কাপড়ে বাঁধা চিড়ে, গুড় আর আমসত্ব বার করল, তারপর চিড়েকে নদীর জলে নিপুণভাবে ধুয়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে দিল। মাঝিদের কাছে একটু নুন চাইতে, তারা বলল, পাটা-তনের মধ্যে আছে, নাও। পাটাতন সরাতে মিলল, ভাতের হাঁড়ি, তরকারির মালসা, আর নারকেলের আঁচিতে লাল নুন। মতিলাল নুন আমসত্ব, গুড় দিয়ে মাখল, তারপর দুভাগ করে একভাগ পিয়ারীকে দিল।

পিয়ারী চিড়েটুকু খেয়ে, নদীর জলে বাসন ধুল, তারপর, পেটপুরে নদীর জল খেল। মতিলালের খাওয়া শেষ হলে সে একটা বিড়ি ধরাল, পরে একটা খাতা বার করে কি করে খানাপুরি বুঝারত করতে হয়, তাই শেখাতে সুরু করল। পিয়ারী ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছে, মাঠে কাজও করেছে খানাপুরির, তবুও মন দিল বাবার উপদেশে।

"দেখ, খতিয়ানের এক হতে দশ ঘর—অর্থাৎ মাথা জমিদারের। বার ঘর হতে ষোল ঘর অর্থাৎ পেট জমির মালিকের। সতের, আঠার, মানে খতিয়ানের পা হল প্রজার। আর খতিয়ানের পেছনের ঘরগুলি দাগের হিসেব, বিবরণ ইত্যাদি।..."

অনেকক্ষণ ধরে এটা ওটা শেখান চলল, শেষে মতিলাল বলে, "দেখ পরিশ্রমে ভয় পাবি না। চৈত্রের ভরা রোদে যখন মাঠে কেউ থাকে না, তখন একমাত্র আমিন আর কানুনগোরা মাঠে থাকে। প্রথম প্রথম কষ্ট হবে, তারপর গায়ের চামড়া পুড়ে গেলে, দেখবি আর কষ্ট হবে না।"

নৌকা কুলু কুলু রবে ভরা নদীতে চলেছে। শরতের খুশীভরা

পরিস্কার আকাশ। নদীর পারে পারে এখন কাশবনগুলি রোদ্দুরে দুলছে, আগমনীর গান গাইছে। ফিঙে নাচছে। শালিকরা কোনখানে জটলা করছে। হঠাৎ একঝাঁক সাদা বক আকাশে দেখা দেয়। মাঝিরা নির্বিকার চিত্তে বৈঠা বাইছে। কালো কুচকুচে তাদের চেহারা, নির্বোধ সরল দৃষ্টি।

বেলা দুপুর হবে, নৌকা একজায়গায় বাঁধা হল। অপরিচিত স্থান, অদূরে একটা গ্রাম। নৌকা হতে চাল, ডাল, আলু, নুন বার করে একটা খেজুরগাছ তলায় খিচুড়ীর আয়োজন চলল। মাঝিরা দুজনে কাঁচালঙ্কা নুন দিয়ে একথাল পান্তাভাত একসঙ্গে বসে খেয়ে নিলে। তারপর গাছতলায় বসে হুঁকো খেতে সুরু করল।

মতিলাল বললে, যা ত পিয়ারী একটা শিশি নিয়ে, গ্রামের দোকানে একটু তেল পাস কি না।

পিয়ারীলাল পয়সা ও শিশি নিয়ে গ্রামের দিকে পা বাড়াল। একটা মাঠের পরে গ্রাম, রাস্তা দিয়ে সেখানে উঠল। দুপাশের বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা। বেশ বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। দুএকটা কুকুর রাস্তায় খেলা করছে। পিয়ারী একটী বৃদ্ধকে প্রশ্ন করে জানল, হারাণ দাসের বাড়ীতে দোকান আছে। এই সোজা গিয়ে, দেখবে একটি বাঁশ ঝাড়, সেটার বগলের রাস্তায় গেলেই পাবে। পুকুরগুলিতে জল টলমল করছে। তাতে গাছের ছায়া পড়ছে। ঘাটে বসে বধূরা বাসন ধুচ্ছে। সেখানে পৌঁছে দেখে বাড়ীর বাইরে একটা ছোট দোকান। একটা ছোটছেলে একখানা বাতাসা নিয়ে চুষছে। নাকের কফ্ ও লালা সব মিশে একাকার। হারাণ দাস তখন একটা টিন হতে চিটেগুড় তুলছিল, অপরিচিত ছেলেকে দেখে অবাক হয়ে বলল, কি চাই তোমার? তোমার বাড়ী কোনখানে? পিয়ারী বলল, বাড়ী ফরিদপুর জেলায়, গোপালগঞ্জ মহকুমার ট্যাংরাখোলার থানার নারাণপুর গ্রামে। দেশে যাচ্ছি সাতক্ষীরের থেকে, একটু তেল চাই।

হারাণ দাস ততক্ষণে গুড় মেপে ক্রেতাকে বিদেয় দিয়েছে। হাতটা টিনের গায়ে কাঁচিয়ে, একটা বালতিতে রাখা জলে ধুল। তারপর পুরান ছেড়া গামছাতে মুছে বাঁশের চোঙ্গায় মেপে দিল একপো তেল। দাম একআনা, আজকাল একটু দাম বেড়েছে।

পিয়ারী দেখে হাতের বাঁশের চোঙ্গাটি তেলে তেলে লাল হয়ে গেছে। দোকান হতে তেল, মিশ্রমসল্লা, চিটেগুড়, তৈজসপত্রের বিচিত্র এক গন্ধ নাকে আসে। পিয়ারীর মন যেন বিচিত্র এক অনুভূতিতে ভরে উঠে। সে অনুভূতি হল, পৃথিবী কত বড়, কত তার গ্রাম, লোকজন। সব স্থানেই যেন একসঙ্গে দিন রাত হয়, লোকের ঘরকন্না চলে। নারানপুরে যেমন চলছে এখানেও চলছে, আরও শত স্থানে সে প্রবাহ বইছে। শুধু তার পরিচয় নেই বলেই তারা অপরিচিত, এইত। এ অনুভূতি সে ভাল করে বিশ্লেষণ করতে পারে না।

বাইরে মনোরম শরৎ প্রকৃতি। চাঁপাফুলের রং রোদ্রে, গাছগুলির পাতায় পাতায় সে রং খেলা করছে। কাল ষষ্ঠী, ঢাকের বাজনা কানে আসছে। তার দেশেও হয়ত প্রতিমায় খড়ি দিচ্ছে।

গ্রামের শেষ বাড়ীখানি পার হয়ে, একটা পুকুরের উঁচু পারে উঠতেই দেখতে পেল, কাঠের ঘাটে বসে একটি ষোল সতের বছরের মেয়ে কাপড় কাচছে। ঘটনাটা কিছুই যেন নয়, তবু ও যেন পিয়ারীর ভেতরের এক অজ্ঞাত পিয়ারী চমৎকৃত হয়ে গেল।

মেয়েটি অপরিচিত এই ছেলেটিকে দেখে একবার বৃহৎ পল্লবঘন চোখ তার দিকে মেলে ধরল, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিজের কাজে মন দিল। কিন্তু পিয়ারী ত চোখ ফেরাতে পারে না, একটা ভাল লাগা এই মুহূর্তে যেন তাকে পেয়ে বসেছে। এ যেন অন্য কিছু, তার বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গী লক্ষী, বা টেঁপী, চপলা কারও মধ্যে সে এমন মাধুর্য্য দেখেনি যা আজ এই আম গাছের তলে কর্মরত শান্ত পল্লীশ্রী কিশোরীর মধ্যে দেখল।

মেয়েটী ধীরে সুস্থে নিজের কাজ করল, তারপর কাচা কাপড়গুলি হাতে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল, যাবার পুর্ব্বে আর একবার তাকিয়ে দেখল ছেলেটী তখনও তার দিকে তাকিয়ে।

বিদেশ, অপরিচিত নরনারী, মাটি। অপরিচিতা এই কিশোরী, তবুও কেন এমন লাগে, তা পিয়ারী ঠিক বোঝেনা। আজ এই কিশোরীর লাবণ্য মাধুর্য্য কাকে যে আকর্ষণ করে ওর পায়ের তলে নিয়ে ফেলতে চেয়েছে, তাই কি ভালবাসা, যা দেশের যাত্রা গানে মাঝে মাঝে শুনেছে?

পিয়ারী জানেনা, এমনি করেই যৌবনের প্রকাশ শুরু হয়, হঠাৎ ভাললাগা থেকে ভালবাসায়।

বেলা বেড়ে চলেছে, সে তেলের শিশিটা নিয়ে নৌকার কাছে ফিরে আসে। বেশী দেরী হলে হয়তো খুলনার ষ্টীমার ধরা যাবে না।

* * * *

নারানপুর পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা প্রায় বারটা গড়াল। এর কারণ হল অত্যধিক কচুরী পানার জন্যে নৌকো একটুও এগুতে পারে নি। ঘাটে নেমেই মনে হল, তাই তো, মা নেই; সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এসে পড়ল। কত দুঃখ পেয়ে সেদিন মা মারা গেলেন। তারপর মনে পড়ল ঘরখানির কথা। বহুদিনের সুখদুঃখ বিজড়িত আশ্রয় দাত্রী, সেও ত মায়ের মতন বন্ধু। নৌকা লাগল মজুমদার বাড়ীর পেছনের ঘাটে। জিনিসপত্র নিয়ে দুজনে হিজল, গাবগাছের তলার প্রায় অন্ধকার সেই পথ দিয়ে মজুমদার বাড়ীর দিকে চলল। পিয়ারী একবার পেছন ফিরে তাকাল, মাঝি তখন গলুইয়ের কাছের পাটাতন সরিয়ে, উপুড় হয়ে সম্ভবতঃ টাকা রাখছে। সামনের গাবগাছ কাঁচা পাকা গাবে ভর্ত্তি। হিজল গাছগুলোর লাল ফুলগুলি কেমন সুন্দর মা দুর্গার কানের লম্বা দুলের মতন দেখাচ্ছে। ডান দিকে তাকাতেই দেখা গেল, খালের স্বচ্ছ চিকন জল, গভীর তলদেশের মাটি পর্যন্ত দেখা যায়। নিচে লাল মাটি, কতগুলি চেলা, পুঁটিমাছ খেলা করছে, বুকটা কেমন শির শির করে ওঠে। পিয়ারীর মনে পড়ে গত বছরও সে ও ক্ষুদিরাম কতো ডুব দিয়ে তাদের পুকুরের তল হতে মাটি তুলেছে।

মতিলাল এগিয়ে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি সে পা চালালো। মজুমদার বাড়ীর উঠানে পড়তেই দেখে, সেখানে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়ে খেলা করছে। প্রবাসী চাকুরেরা পূজোর ছুটিতে দেশে এসেছে। গোপাল কাহার কোদাল দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করছে। মতিকে দেখে, কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে, "আরে মতি দা যে, এই এলে?" মতি সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নাড়ে। গোপাল কোদাল রেখে কোমরের গামছা দিয়ে গায়ের ও গলার মুখের ঘাম মুছে

বলে, তুমি যাও, আমি বিকেলে তোমার ওখানে যাব। একটু জমির পর্চ্চাটা দেখাব।'

মণ্ডপে প্রতিমা তৈরী শেষ। ছেলেরা লাল নীল কাগজ কেটে পদ্ম শিকল বানিয়ে ঘর সাজাচ্ছে। মতি ও পিয়ারী বাঁশের থামে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

মজুমদার বাড়ী পেছনে ফেলে, বটতলার মাঠ ছাড়িয়ে ( মাঠ জলে ভর্তি ), বকশীদের বাড়ীর পাশ দিয়ে তারা নিজেদের বাড়ী উঠল।

দেখল ঘর খানির অবস্থা শোচনীয়। দু এক জায়গায় বেড়া প্রায় পড়ো পড়ো। উঠোনে একরাজ্যের জঙ্গল, দাওয়াটা ভেঙ্গে একদিকে উঠোনে মিশে গেছে। দরজা খুলতেই এক দল চামচিকে পাখা ঝটপট করে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। পিয়ারী গিয়ে জানালা খুলে দিতেই এক ঝলক প্রসন্ন আলোক তাদের অভ্যর্থনা করল দেশের ভিটেতে। ঘর সংস্কার করতে কিছুক্ষণ লেগে গেল। ঘর ঝাড় দিয়ে মতিলাল রান্নাঘরের উনুনটা নিকোতে বসলো। পিয়ারীকে বলল, তুই কিছু কাঠ পাতা জোগার করে এনে দেত। তাড়াতাড়ি রান্না বসাব, স্টীমারে যে ধকল গেছে। খেয়ে দেয়ে একটু ঘুম দিলে তবে শরীর ঠিক হবে।

পিয়ারীকে কিন্তু কষ্ট করে যেতে হল না। জ্ঞানদা বাবু খবর পেয়েছেন। তার বাড়ী হতে বছর আঠার উনিশের একটী মেয়ে ধামায় করে চাল, বাটিতে তেল, কিছু আলু, নুন, দুটো হাসের ডিম নিয়ে এল। সঙ্গে চাকর বুড়ো খগেন, মাথায় একরাশ কাঠ।

এরই নাম লক্ষী, পিয়ারীর বাল্য সঙ্গী। এরই বাবা জ্ঞানবাবু এতদিন এই বাড়ী দেখাশুনা করেছেন, নতুবা এ বাড়ী এতদিনে মাটিতে মিশে যেত। লক্ষী জিজ্ঞেস করল, পিয়ারী দা কেমন আছ? পিয়ারী ঘাড় কাত করে জানালা, ভাল। পিয়ারী অবাক হয়ে ভাবল, কোথায়, সেই লক্ষী তো এ লক্ষীর মধ্যে নেই! সেই যে পাঠশালার পথে লক্ষীর সঙ্গে সে আস্থলির ফলের মধু খেয়েছে, সন্ধ্যামনি ফুলের বাঁশী তৈরী করে বাজিয়েছে, লক্ষী আঁচল পেতে দাঁড়িয়েছে। কোন কোনদিন লক্ষী, টেপি, সে ও ক্ষুদিরাম মিলে ঘরকন্না খেলেছে, সেই

লক্ষী ত কোথায় হারিয়ে গেছে যেন। আজকের লক্ষীর ওপর যেন তার কোন অধিকারই নেই। ভাল করে কথা বলতেই সাহস হয় না। বিয়ের পর লক্ষী আর দেশে আসে নি, বিয়ে হয়েছে পালংএর কালিদাস মুখার্জীর বড় ছেলের সঙ্গে।

আজ ষষ্ঠী। লক্ষী নতুন কোড়া কাপড় পরেছে। মাথায় একরাশ চুল, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, ধবধবে গায়ের রং, নাকে নোলক, সমস্ত মুখ জুড়ে, ঘন পক্ষযুক্ত বৃহৎ শান্ত চোখ, ধীর স্থির গতি, মৃদু কথার শব্দে যেন মনে হয়, সত্যিই লক্ষী মা দুর্গার সঙ্গে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এসেছে। নারায়ণের পাশেই যেন একে মানায়। লক্ষী ধীর পায়ে আম, জাম, বনের ছায়ায় বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

মতিলাল এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষের জীবনে কামনার ত শেষ নেই। হয়ত বা এমনি একটী সুন্দরী লক্ষীকে দেখে মতিলালের একটী কন্যার অভাব সহসা মনে হাহাকার জাগাল। সুন্দরী, সেবাপরায়না, অভিমানিনী পিতৃস্নেহাতুর একটী কন্যা পিতৃজীবনে যেন অপরিহার্য। ক্লান্ত পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে চকিতে তার মনের ভাব বুঝে নেয়, তারপর মিষ্টি তালপাতার বাতাসে শ্রান্তি দূর করে। তাকে স্বামী গৃহে বিদায় দিয়ে, বার বার অশ্রুসজল নেত্রেইতো বছরে একবার আমরা ফিরে চাই। সেই আদরিণীর বিয়োগ দুঃখেই তো আমরা বছরের এই দিনে মূর্তি করে তার পূজা করি। সে পূজা আমাদের কন্যা স্নেহেরই প্রতীক নয় কি! লক্ষী ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জীবনের এ বছরটিকে কোন দিনই ভোলা যায় নি পরবর্তী জীবনে দারিদ্র্যের মধ্যে যখনই পেছনের এই দিনগুলির মনে পড়েছে, তখনই সে তন্ময় হয়ে নেশাগ্রস্তের মতন সুন্দর স্বপ্নের আনন্দে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে পড়েছে।

সারা বাংলা পূজো উৎসবে মেতে উঠলো। ছোটগ্রাম, তবুও, ছ' খানা পূজো। সব চেয়ে ধূমধাম হোত মজুমদার বাড়ীতে। যেমন মনমাতানো ঢাকের বাদ্য, তেমনি রাত্রের আরতি আর ভোগ।

পিয়ারীলাল কেবল ঘুরে বেড়াত, গ্রামের এখানে ওখানে কি যেন

একটি সুখস্পর্শ অনুভব করতে চেষ্টা করত। গ্রামের পূর্বপ্রান্তের কালিবাড়ী, শ্মশানের কাছে বটগাছের নীচে, নৌকা করে চৌধুরীদের পুকুরের ঝোপের কাছে কখনও দুপুর কাটাত। সমস্ত গ্রামে জল, শুধু উঁচু রাস্তা দুটো আর বাড়ীগুলি জেগে আছে। মাঝে মাঝে রাস্তায় ভাঙ্গনে বাঁশের চার ( পুল )। এ দিনেই ত রামচন্দ্র রাবণ বধ করেন, এমন সুন্দর দিনেই তো সীতার সঙ্গে তার মিলন হয়।

সহজ, সরল গ্রামজীবনের তুচ্ছ ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলিকে একান্ত নিজস্ব করে ভাবতে পেরেছিল বলেই ত সে পরবর্তী জীবনে একজন ভাল আমিন হয়েছিল।

নবমীর দিন রাত্রে চক্রবর্তীদের পুকুরের পার দিয়ে আসছিল পিয়ারী। সন্ধ্যা, নবমীর আঁধো আলোতে যেন একটু রহস্য সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীতে; একটু যেন মনটা আলো ছায়াতে কেমন কেমন করে। এমনি সময় পেছন হতে কে যেন ডাক দিল। কাছে আসতে দেখে বছর বারর একটী মেয়ে। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে নজর আসতে চোখে পড়ে ভারি অশান্ত একটা মুখ, একরাশ চুল মাথায়, অবিন্যস্ত। নতুন একটা শাড়ী পড়া, তাও কোনমতে জড়ান। পিয়ারী জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কি খুকী ? মেয়েটি বলে, রাধু। বাবার নাম শ্রীপাঁচু গোপাল দাস॥

'ওহরি, পাঁচুকাকার মেয়ে, রাধু। এখন বড় হয়ে উঠেছে। পাঁচু মতির একজন বাল্যবন্ধু। এককালে মতিলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল আজ আর তেমন গাঢ় নেই সে প্রণয়, তবুও মতিলাল গ্রামে এলে পুরাণ সম্পর্কের জের টেনে ভালমুখে আলাপ আলোচনা চলে। সুশীলার সঙ্গে পাঁচুগোপালের স্ত্রীর ভাব ছিল আরও বেশী। সুশীলার মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই রাধুর মা মারা যায়, রাধুর বয়েস তখন চারবছর। সে অনেকদিনের কথা, পিয়ারীরই ভাল করে মনে নেই।

এ দিনটিও পিয়ারীর স্পষ্ট মনে পড়ে। রাধুর পেছন পেছন এসে দেখে পিয়ারীলাল, পাঁচুকাকা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে আর কাসছে। গলায় একটা কালো কারে বাঁধা তাবিজ। রোগে ভুগে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাঁচুগোপাল এক সময়ে গ্রামের জোয়ান ফুটবল খেলোয়াড় ছিল, আজ দোকানে বসে বসে, কেমন অথর্ব হয়ে পড়েছে। আর তার

বাবা কঠিন পরিশ্রম করে বলে, এখনও সমর্থ আছে। বাবা ঠিকই বলে, মাটির মানুষ মাটির কাজ করলেই সুস্থ থাকে।

পাঁচুগোপাল অনেক কথা বলে। দেশের লোকের অকৃতজ্ঞতা। ধার নেয় না এমন লোক নেই, কিন্তু একবার নিলে আর এপথ দিয়ে যায় না। লোক সে ভালকরেই চিনে নিয়েছে। এখন একমাত্র চিন্তা এই রাধুকে নিয়ে। বড় হচ্ছে, তারপর পাগল, একটুও বুদ্ধি নেই।...

যতক্ষণ সে কথা বলেছে, দেখে রাধু তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেমন একটু মমতা জাগে যেন, আহা, অতটুকু বয়স হতে মা নেই।

রাত বেড়ে যায় দেখে, সে উঠে পড়ল। কাঁঠাল সুপারী বনের মধ্যে দিয়ে পথ। মজুমদার বাড়ীতে আরতির বাজনা বেজে ওঠে, রাধু চঞ্চল হয়ে ওঠে, একলাফে দাওয়া হতে নেমে, অন্ধকারের মধ্যেই মিশে যায়। পেছন হতে পাঁচুকাকা বলে, দেখলেত বাবা। পিয়ারী মুখ ঘুরিয়ে হাসে, বলে, ছেলেমানুষ ত। তারপর বাড়ীর পথ ধরে।

কোজাগরী পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীপূজো। তার কদিন পরেই আলিপুর হতে তার নিয়োগপত্র এল। ফকাস্ সাহেব কথা রেখেছেন। সেদিনের আনন্দ আজও অম্লান। চিঠি খুলে পড়তেই যারা ছিল, তারা উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠল। ক্ষুদিরাম ওকে কাঁধে করে নাচ শুরু করল। মতিলাল দশজনকে গিয়ে বলে এল। শুনে তারাও আনন্দিত হল। লক্ষ্মী হেসে ফেলেছিল, সে আমিন হয়েছে শুনে। তারপর বলে, বড় কঠিন কাজ পিয়ারীদা রোদ্দুরে, রোদ্দুরে। পিয়ারী বলে, রোদ্দুরে না ঘুরলে কে বসে খেতে দেবে। জীবনে যত আনন্দের দিন এসেছে, তার মধ্যে ঐ দিনটাও একটা।

কিন্তু সেদিনের আনন্দের মধ্যে আর একটা জিনিস ছিল প্রচ্ছন্ন, যা মূর্খ গ্রাম্য যুবক বুঝতে পারেনি তখন। সে বোঝেনি যে এই যে সে কাজের চাকায় বাঁধা পড়ল, সমস্ত জীবন ধরে সে তার জীবনের আনন্দ, সৌন্দর্য শুষে নেবে। যতই সে তার দাবী মিটাবে, ততই তার ক্ষুধা বেড়ে চলবে। এ কথা সে আজ যেমন বোঝে তখন যদি বুঝত তাহলে কৈশোরের দিনগুলিকে হয়ত আর একটু উপভোগ করা যেত। সেদিনের

আনন্দের আর একটা কারণ ছিল হয়ত এই, যে বাইরের জগৎ তার পৌরুষকে, তার ক্ষমতাকে প্রথম স্বীকৃতি দান করেছে। তাও নিয়োগপত্র আবার যারতার নয়, সেট্‌লমেণ্ট অফিসার ফকাস্‌ সাহেবের। কত কল্পনা মনে আছে, কত শূন্য প্রাসাদ তৈরী হয় মনে মনে। কত নিজের বাহাদুরীর মনগড়া সৃষ্টি সে নিজের মনে মনে করে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার মনে হয়, এমনি দিনে যদি মা থাকতেন, তাহলে কত ভাল লাগত। হয়ত বাড়িয়ে ফলিয়ে দশজনের কাছে গল্প করতেন। সেদিনের দুপুরে সে যদি ক্ষুদিরামের বাড়ী না যেত, তবে হয়ত মা মরতেন না। সবই কপাল।

তাদের পাঠশালার পণ্ডিত বানেশ্বর বক্‌সীর কাছে যেতেই তিনি "জয়োঽস্তু" বলে আশীর্বাদ করলেন। পিয়ারী তাঁর পায়ে প্রণাম করে একটা আধুলী রাখল। সবার সঙ্গে দেখা শেষ করে, পাঁচুকাকার বাড়ী যেতেই, রাধু তাকে ছড়া কেটে ক্ষেপাতে সুরু করল,

"কানুনগোর ঘোড়া আইল, ক্ষেত খামার সাবধান।
পিয়ারীলাল আমিন হইল, জমি জমায় পড়ল টান্‌—ন্‌—ন্‌॥

পিয়ারী ত অবাক। এ শিখল কোথা হতে। পাঁচুগোপাল এক ধমক, পাজী মেয়ে। রাধু ততক্ষণে ছড়া কাটতে কাটতে সুপুরী-আম-কাঁঠালের বনের মধ্যে নাচতে নাচতে অদৃশ্য হয়ে গেল॥

## ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রথম চাকুরীর স্মৃতি আজও পিয়ারীর মনে অম্লান। ইংরিজী ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাস। বাবা জীবিত, সংসারের দায়ধাক্কা নেই। এই সুযোগে প্রথম কলকাতা দেখা। মতিলাল চিঠি লিখেছিল আগেই, তাই শিয়ালদহ ষ্টেশনে শচীন গুহ এসেছিল তাকে নিতে। ষ্টেশনের ভীড়ে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। একটা ট্রেণ হুইস্‌ল দিয়ে ছাড়ল, 'কৃষ্ণনগর লোকাল'। শচীন গুহ তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে। বাপরে কি ভীড়! কত দোকান, খাবার খেলনা। এখানে বার মাসই মেলা।

নাকি। একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে শচীনবাবু তাকে বেহালা নিয়ে যায়। বেহালায় তখন ট্রাম হয়ে গেছে। শচীনবাবু মতিলালের সঙ্গে খুলনায় কাজ করেছেন, তারপর এদিকে বদলী হয়ে এসেছিলেন।

প্রথম দিন ভারি অদ্ভুত লাগছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বালান, চাবি ঘোরালেই কল থেকে হু হু করে জল পড়ে বালতি চৌবাচ্ছা ভরে যায়। যে মেসটায় তারা উঠেছিল সেটা বেহালার রায়েদের একটা ঘর। সেট্‌ল-মেণ্টের আমিন, পেস্কার, ড্রাফ্‌ট্‌সম্যানরা থাকে।

পরদিন শচীনবাবু তাকে যখন আলিপুর গোপালনগর রোডের সার্ভে বিল্ডিংএর সামনে নিয়ে গেল, সে ত অবাক। উঃ কতবড় বাড়ীরে বাবা, সব লাল ইঁট বার করা কেন ? ভয়ে ভয়ে শচীনবাবুর হাত ধরে উঠল তিনতলায়, একটা লালমুখ সাহেব গটমট করে ওদিকে চলে গেল। শচীনবাবু একটু আড়ালে গেল, কার্টার সাহেব যাচ্ছেন ডিরেক্টারের ঘরে। তিনতলায় হেড ক্লার্কএর ঘরে গিয়ে শচীনবাবু শশব্যস্তে নমস্কার করে অর্ডারটা তার হাতে দিল। হেডক্লার্ক অর্ডারটা দেখে, একবার উঠে পাশের ঘরে অর্ডারটা দেখিয়ে নিয়ে এল। তারপর বলল, জয়েনিং রিপোর্ট দাও। শচীন বাবু লিখে পিয়ারীকে বললেন, এইখানে সই কর। পিয়ারী কাঁপা কাঁপা হাতে সই করে। কিছুক্ষণ বসে রইল, তারপর বড়বাবু একজনকে ডেকে কি যেন বলে জয়েনিং রিপোর্টটা দিলেন, সে আধঘণ্টা পরে একটা অর্ডার এনে পিয়ারীর হাতে দিল, সঙ্গে একটা খাতা। বলল, খাতার এইখানটায় সই কর। সই করে দিল। শচীন বাবু অর্ডারটা পড়ে বললে, তোমার ভাগ্য ভাল, তোমার প্রথম পোষ্টিং হল, বারুইপুর ক্যাম্পে। আজও তার এই প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। উঃ সেকি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! সে তাহলে এখন হতে একজন আমিন,। বাবাও যেমন সেও তেমনি।

আর দেরি চলে না শচীনবাবু তাকে যথাসম্ভব উপদেশ দিয়ে বললেন, যদি খুব অসুবিধে হয়, তাহলে যেন তাকে বেহালা অফিসে চিঠি লেখে। শচীনবাবু বেহালা ক্যাম্পে কাজ করে। শিয়ালদহ এসে ট্রেণে চড়ে বারুইপুর এসে নামল। বারুইপুরে তখন এখনকার মতন জৌলুস ছিল না। রাস্তাঘাট প্রায়ই সবই কাঁচা, ইলেক্‌ট্রিক আলো নেই, সব ফাঁকা

কাঁকা, আর সঙ্গল। এটেষ্টেশন ক্যাম্প খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না তেমন।

অফিসারের নাম রজনীকান্ত ঘোষ। বেশী কথা বলেন না। নমস্কার করে অর্ডারটা হাতে দিতে, পেস্কারকে ডাকলেন। শশব্যস্তে বৃদ্ধ পেস্কার এল। অফিসার বল্লেন, এর জয়েনিং রিপোর্টটা নিন্ আর কাজ কর্ম একটু বুঝিয়ে দেবেন। যান্। দেখা গেল পেস্কারবাবু তাঁকে রীতিমত ভয় করেন।

কাজকর্ম বুঝে নিতে বেগ পেত হল না। সকলেই তার বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে কাজ সুরু করল। শীঘ্র এ কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল, নতুন আমিনবাবু খুব ভাল কাজ বোঝেন, প্রাণ দিয়ে খাটেন আর সর্বোপরি কোন জলপানি নেন্ না। অফিসার ঘোষও খুব প্রীত হলেন।

এখানে যোগদানের প্রায় মাস ছয়েক পরে মতিলালের পত্র মারফৎ পিয়ারী খবর পেল যে মতিলাল পারুলবালাকে বিয়ে করেছে এবং দেশে গিয়ে বসবাস সুরু করেছে। মতিলাল আরও জানিয়েছে: তার বয়স হয়েছে এখন সেবার প্রয়োজন এবং বিশ্রাম করলেই ভাল হয়। বিশেষতঃ পিয়ারী যখন উপযুক্ত হয়েছে। তবে দেশে বসে যতটুকু প্রয়োজন সে কাজ করবে।

যে রাত্রে চিঠিটা পেল, সে রাত্রিটা পিয়ারী আর ভাত খেতে পারল না। বিছানায় শুয়ে কান্নাকাটি করল। পেস্কারবাবু, অনেক সাধ্যসাধনা করল, কিন্তু ও না খেয়ে শুয়ে রইল। রাত্রে স্বপ্নে যেন মাকে দেখল পরিস্কার, তার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হয়ে এল। আমিন জীবনের কর্মের প্রবল টানে কোথায় গেল সব চিন্তা। শুধু মাটি, মাঠ, জল, নদী, তাকে পেয়ে বসল। কোন জমির কি শ্রেণী, কোনটার কি পরিমাণ হবে, নতুন দিয়ারা চর মাপার কি সহজ উপায় এ চিন্তায় তার দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। কিস্তোয়ার, বুজারত শেষ হয়ে এখানে এটেষ্টেশন চলছে। দখল তদন্তে তাকে যেতে হত কোনদিন রামনগরে, কোনদিন বলবলিয়া কোনদিন নবগ্রাম, সূর্য্যপুর, কোনদিন বা পিয়ালীর চরে। নতুন পরিচয়ে তার অভিজ্ঞতার থলি ভরে উঠত। লোকে কত সম্মান দেখাত তাকে। বৃদ্ধ পেস্কার রসিকবাবু মাঝে মাঝে উপদেশ দিতেন, পিয়ারী, ঠিকমত

খাওয়া দাওয়া কর, সারাদিন বাঁশ, চেন, পিন নিয়ে মাঠে মাঠে থাকলেই কি চলবে। আর শোন, যদি কিছু পাও, ছেড় না, এ চাকরির ভবিষ্যৎ নেই। পেনশানও নেই, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডও নেই। যেদিন চাকরী থাকবে না ওরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। পিয়ারী হাসত পেস্কারবাবুর কথায়।

এখানে প্রায় একবছর ছিল সে, তারপর বদলী হল ক্যানিংএ। বারুইপুর ছেড়ে আসতে প্রথমে খুব কষ্ট হয়েছিল, তারপর ক্যানিং এসে ক্রমে সব ভুলে গেল।

ক্যানিং-বারুইপুরের মতন এটেস্টেশন ক্যাম্প ছিল না, ছিল তিনধারার অবজেকশান ক্যাম্প। এটেস্টেশান হাকিমের বিচারে যারা খুসী হতে পারত না, তারা যেসব আপত্তি দাখিল করত, তার বিচার চলত, এই রেভেনিউ কোর্টে। অফিসারের নাম ছিল, বলরাম বসু। ইনিও খুব রাশভারি লোক, কথাই বলতেন না। পিয়ারীর ভারি ভয় হত এর সামনে কথা বলতে। শুধু পিয়ারী কেন, এঁকে ক্যাম্পশুদ্ধ লোক ভয় করে চলত। সারাদিন নিষ্ঠাভরে কাজ করতেন, বিকেলের দিকে মাতলার পারে চুপ করে বসে থাকতেন। পিয়ারী এ ধরণের হাকিম সেট্‌লমেণ্টে পরে খুব দেখেনি।

এ ক্যাম্পে আর একজন আমিন ছিল, নাম পীরবক্স, বাড়ী নোয়াখালী। লম্বা কাল চেহারা, বেশ কর্মঠ। বেশ বদমেজাজী। পিয়ারী দেখেছে, অধিকাংশ আমিনের বাড়ীই নোয়াখালী। কিস্তোয়ার, খানাপুরী তারাই সচরাচর করত। রেটে কাজ, শত একর প্রতি ফি।

একদিনের কথা পিয়ারীর খুব মনে আছে। পীরবক্সের সঙ্গে অফিসার তাকে শ্রীনগর মৌজায় দখল দেখাতে পাঠিয়েছিল। ঘুটিয়ারী শরীফ ষ্টেশন হতে অনেকটা হাঁটা পথ।

বিবদমান দুই পক্ষ উপস্থিত। পীরবক্সের হাতে ম্যাপ। সে আপত্তি কারী মণিরামকে বলল, তোমার প্লটের চারপাশ ঘুরে এসতো। সে দৌড়ে অনায়াসে ঘুরে এল। বিপক্ষ দলও ঠিক প্লট চিনল। দু'দলই ফসল কেটেছে বলল। পীরবক্স বললে, ইয়া আল্লা! তবে দাগ কার? তোমরা তো মুখোমুখী আছ, বল।"

দেখতে দেখতে ছুই দলে ঝগড়া বেধে উঠলো। পিয়ারীলাল সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে, মারামারি বাধবে নাকি ? পীরবক্স স্থির দৃষ্টিতে ওদের ঝগড়ার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছিল। তারপর এক সময় পিয়ারীকে বলে, চলো। পিয়ারী তো অবাক, হয়ে গেছে ? পথে যেতে পীরবক্স বোঝাল, মাঠের জমির দখল, প্রমাণ করা খুব কঠিন, কারণ মাঠে ত কিছু নেই। ফসল কাটাও কবে শেষ। ছু দলই বলছে, তারা কেটেছে। এরকম ঝগড়া বাধিয়ে বুঝবি কোন পক্ষের দখল ঠিক। পিয়ারী বুঝল, পীরবক্সের কাছে সে এখনও শিশু মাত্র।

ওরা ষ্টেশনের পথে এসে ঘুটিয়ারীশরীফ বাজারে বসে। আগে হতেই কয়েকজন লোক বসেছিল, তারা ওদের দেখে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরে ওরা এল গরম রসগোল্লা আর জল নিয়ে। পরিশ্রমও খুব হয়েছিল, পিয়ারী খেল খুব তৃপ্তিতে। মাঝে পীরবক্স একবার চটকরে উঠে গেল কি কাজে.। পিয়ারী একটি পাসিংশো সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে সুরু করল। ট্রেনের ঘন্টা হল, হঠাৎ দেখা গেল ছুটতে ছুটতে পীরবক্স আমিন আসছে। ট্রেনও এসে গেল।

ট্রেনে বসে পীরবক্স বলে, দেখ পিয়ারী, শালার সাহেব তোকে আমার সঙ্গে পাঠিয়েছে কেন জানিস ? পিয়ারী সহজ সুরে বলে, সাহায্যের জন্যে। ছুর বোকা, তোর মতন ছুঁচো আমায় কি সাহায্য করবে রে ? আসলে যদি আমি ঘুষ খাই, এই ভয়ে। পিয়ারী অবাক হয়ে যায়। পীরবক্স বলে চলে, তা আমি কি আর অত বোকা ? আমি ঠিক টাকা নিয়ে নিয়েছি। পিয়ারী চমকে তাকায়। তাই তো, কখন নিলে। পীরবক্স হাসতে থাকে, বলে, 'বাবা, আমি হলুম পীরবক্স আমিন। লোকে বলে পীরবক্সের চেন, বাড়ী-ঘর, পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে চলে। যেমনি মাপব, ঠিক তেমনি পয়সা গুনব। না হলে তিনটে বিবিকে কি করে পুষব রে। তোর সাহেব ক'পয়সা মাইনে দেয়। দেখ, নদীর ঢেউ যদি গুণতে দেয় তবে ঢেউ গুণে পয়সা নেব। তবে হ্যাঁ, গুণতে ফাঁকি দেব না। পিয়ারীলাল তো হাঁ। গাড়ী দেখতে দেখতে ক্যানিং ষ্টেশনে পৌছে গেল।

ষ্টেশনে পৌছতেই, যেই নামতে যাবে, সাহেবের আর্দালী হৃদয়কৃষ্ণর

সঙ্গে দেখা। হৃদয়ের মুখ গম্ভীর। পীরবক্সের এত লম্ফঝম্ফ, হৃদয়কে দেখেই সব স্থির, ঠাণ্ডা। হৃদয় গম্ভীর স্বরে বলে, সাহেব তোমাকে জুতো পালিশ করতে বলেছিল, কর নি। যাও তোমার কপালে দুঃখ আছে। চাকরী থাকবে না।

পীরবক্সের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। তাইতো, কি মারাত্মক ভুল। যার সহজে ভুল হয় না, এমনকি এই তল্লাটের বাঁশড়া, মাতলা, শ্রীনগর, সোনাখালি, পাতিখালি প্রভৃতি যার মুখস্ত, তার ভুল অপ্রত্যাশিত।

পীরবক্স, হৃদয়ের হাত জড়িয়ে ধরে, চট করে একটা টাকা গুঁজে দেয় হাতের মধ্যে, বলে, হৃদয় তুই আমার ধর্ম্মভাই রে। তোকে বাঁচাতেই হবে। হৃদয় টাকাটা পেয়ে, ষ্টেশন প্লাটফরমেই বুড়ো আঙ্গুল ও মধ্যমার ওপর বসিয়ে টুং করে ওপরে ছুড়ে দিল। তারপর সেটি দু হাতের তালুর মধ্যে শব্দ করে লুফে নিয়ে বলে, ঠিক আছে। তুমি এখনই সাহেবের সঙ্গে দেখা করনা, আমি সব ঠিক করে দেব। হৃদয় মুহুর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। পীরবক্স ও পিয়ারীলাল, দুজনে নিঃশব্দে সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্যাম্পের পথে পা বাড়ায়। অদূরে তখন মাতলা নদীর জল অন্ধকারে চক চক করছিল।

* * * * *

ফকাস সাহেব যখন ডিরেক্টার হয়ে এলেন, তখন ২৪ পরগনার সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হিল সাহেব। ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাস। হিল সাহেবের বিদায়ের কথা হচ্ছিল। অফিসাররা তার বিদায়ের আয়োজন করছিল। তাদের মধ্যে ছিল মুনসীফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ক্যাডাষ্ট্রাল অফিসার, রেভেনিউ অফিসার ও কানুনগোরা।

পিয়ারীলাল চার্জ অফিসার কার্টার সাহেবের আদেশে গত বছর অন্যান্য আমিনদের সঙ্গে সদরে যোগ দিয়েছিল। টালিগঞ্জ রিজেণ্ট পার্ক, কলকাতা গলফ ক্লাব, যোধপুর গলফ ক্লাবের কতগুলি বিবাদের মাপজোকের জন্য। এগুলি নিয়ে সে সময়ে ভারি গোলমাল হচ্ছিল। পিয়ারী এসে বেহালার পুরানো সেট্‌লমেণ্টের মেসে উঠল। শচীনবাবু ছিলেন না, বদলী হয়ে বসিরহাট গিয়েছিলেন। নতুন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল।

যথা সময়ে হিল সাহেব চলে গেলেন, এবং বার্জ সাহেব এলেন সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হয়ে। নভেম্বরে খুব শীত পড়ল। সবাই বলাবলি সুরু করল, এমন শীত নাকি অনেক দিন পড়েনি।

ক'মাস কঠিন পরিশ্রম করে, এই ডিসপিউটগুলির গোল মেটাল। কার্টার সাহেব সকলকে ধন্যবাদ দিলেন।

দিন বেশ যাচ্ছিল। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকই ছিল। প্রতি মাসে তার টাকা আর চিঠি যেত বাবার নামে। পারুলবালাও তাকে স্নেহপূর্ণ চিঠি পাঠাত। পিয়ারীর মনটা পারুলবালার ওপর আর বিরূপ ছিল না। সর্বাপেক্ষা আনন্দের খবর সে পেল এই শীতে; গত মাসে তার একটি ছোট ভাই হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে বনোয়ারীলাল। বাবা লিখেছে, আরও কয়েকটা টাকা বেশী পাঠাতে পারলে সুবিধে হয়, এবং এটাই হল সবচেয়ে অসুবিধে। কারণ অন্যান্য আমিনদের মত সে টাকা আয় করতে পারতনা; সে ছিল সহজ সরল, ছলচাতুরী তার আসত না। অফিসাররা অবশ্য এজন্য তাকে খুব ভালবাসত এবং কঠিন কঠিন কাজে ঝানু আমিনদের সঙ্গে তাকেও পাঠান হত। শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় জমির গোলমালের সময় তাকেও অনেক যায়গায় পাঠান হয়েছে।

রিপোর্টের পাতায় যখন কোন কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন বড় বড় অফিসারদের কথাই থাকে, গত সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্টে মিউনিসিপ্যালিটী এলাকার জমির কঠিন রেকর্ডগুলি তৈরীর জন্য কৃতিত্ব কার্টার সাহেবের নামেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু যদি খোঁজ নেয়া হত এবং আমিনদের নাম উল্লেখ থাকত তাহলে মনমোহন মজুমদার, ইয়াকুব আলি, বরেন পাঠক প্রভৃতির সঙ্গে পিয়ারীর নামও লেখা থাকত।

আর একটি লোকের কথা পিয়ারীর খুব মনে আছে। সে হল ভবতারণ সিংহ, পেস্কার, বেহালা ক্যাম্পের। ভারী অদ্ভুত লোক। বাড়ী যশোরের বনগ্রাম থানায় গোপালপুরে। লোকটি একটু ক্ষ্যাপাটে এবং ভয়ানক স্পষ্টবক্তা। কতদিন অফিস কামাই করে এসে পিয়ারীর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েছে। ডাকলে বলত, দেশের কাজ করছি। ফাঁকি দিচ্ছিনা। স্বাধীন দেশে কাজ করব। এসব কথা শুনে পিয়ারীর

ভয় হত। এর মুখে জরীপের গল্প সে শুনেছে। আগে পিয়ারীর ধারণা ছিল ইংরেজরাই বুঝি এদেশে প্রথম জরীপ সুরু করে। ভবতারণ বাবু বলতেন, মুখে মুখে :

"সে আজ বহুদিন আগের কথা, দিল্লীর মসনদে তখন বাদশাহ আকবর রাজত্ব করছেন। দিল্লীর জাঁকজমক পাশ্চাত্য দেশে তখন একটি রূপকথার মত। সে সময় বাদশাহের আদেশে তোডরমল্ল বাংলা জরীপের কাজ সুরু করেন।

প্রথম রাজস্ব জরীপ সরকারে সরকারে, পরগনায় পরগনায় জমির শ্রেণী ভাগ করে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। তোডরমল্ল এক শ্রেণীর জমিজরীপ-অভিজ্ঞ ঠিক করলেন, তারপর সুবে বাংলাকে উনিশ সরকারে ভাগ করলেন। কানুনগো নির্বাচিত হল, আমিনরা দেশ ছেয়ে ফেলল, বাংলা দেশ ছশো বিরাশিটী পরগনায় ভাগ হয়ে খালসা জমির হিসাব স্থির হল আকবরী সিক্কা টাকায়। বাংলার রাজস্ব স্থির হল এক কোটী ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনসত্তর আকবর শাহী টাকা।

আইন-ই-আকবরীর পাতায় যে বিবরণ লেখা আছে তাতে দেখা যায় আঠার নং সরকার সাতগাঁও মহাল তেপ্পান্নটী মহল বা পরগনায় ভাগ করা হয়েছে, বর্তমান চব্বিশ পরগনার সঙ্গে তা অভিন্ন। এই জেলার খাজনা তখন ছিল একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার একশ আঠার টাকা। তোডরমল্ল এর নাম দেন 'আস্‌লি জমা তুমার'। তারপর ?

তারপর একদিন আকবর শা রইলেন না। জাহাঙ্গীর গেলেন, শাজাহান এলেন। শাজাহান স্থির করলেন বাংলার খালসা জমির আর একবার পরিমাপ হোক। তাজমহল তৈরীতে রাজকোষ শূন্যপ্রায়। সম্রাটপুত্র শাহ সূজা ছিলেন বাংলার শাসক। আবার কানুনগো, আমিনরা মাঠে ছুটল। উড়িষ্যা সহ বাংলার সরকার স্থির হল চৌত্রিশটী, পরগনা হল তেরশ পঞ্চাশটী। খাজনা বেড়ে গেল চল্লিশ লক্ষ টাকা।

ইতিহাস কিন্তু থেমে রইল না। দিল্লীর বাদশাহ্‌রা তখনো দুর্বল হননি, বাংলার সুবেদার তখন জাফর খাঁন মুর্শিদকুলি খাঁন। সম্রাট আরংজেব তার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন, কারণ তিনি আরও অতিরিক্ত

রাজস্বের ইঙ্গিত দিলেন। আবার জরীপ হল। এবার বাংলা ভাগ হল ষোলশত ষাটটি পরগনায়, খাজনা ধার্য হল এককোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাশী হাজার একশত ছিয়াশী টাকা। তাছাড়া সম্রাটের আরও পাওনা রয়েছে 'আবওয়াব' হতে। তখন সতেরশ বাইশ খৃষ্টাব্দ। এই রাজস্ব জরীপের নাম হল "জমা-ই-কমিল তুমার।"

আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। হিন্দুস্থানের রূপ আর রূপোর লোভে সমুদ্রে পাড়ি জমাল বিদেশী বণিকেরা। ইংরেজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসীরা ব্যবসার অন্তরালে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখল। কিন্তু ভাগ্যদেবতার টসে বারবারই জয়লাভ করল ইংরেজ। "জমা-ই-কমিল তুমারের" মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর পরেই তারা লাভ করল কলকাতার দক্ষিণ হতে কুল্‌পী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ। কি করে, তাই বলছি।

বাংলার রাজধানী মুর্শিদকুলী খাঁর তৈরী মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে তখন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছেন। চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র। ইংরেজদের স্পর্দ্ধা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে করলেন অভিযান। ইংরেজরা হেরে গিয়ে সন্ধি করল। ১৭৫৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ ফিরে জয় করে নিল কলকাতা। ইংরেজদের তখন জোর বরাত। মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত দুরন্ত ক্লাইভ অসীম সাহস বুকে নিয়ে, মীরজাফরের ভরসায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে অগ্রসর হল বাংলার রাজধানী অভিমুখে; পলাশীর চষা মাঠে গঙ্গার পারে হল যুদ্ধ। সিরাজদ্দৌল্লা হেরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু রেহাই পেলেন না।

জাফরআলি খাঁ সিংহাসনে বসলেন। পনেরই জুলাই সে বছরই সন্ধি হল ইংরেজবণিক আর অহিফেনসেবী নবাবের মধ্যে। সন্ধির নয় ধারায় হল ইংরেজদের জামিদারী প্রাপ্তি। আর বিশে ডিসেম্বর ইংরেজদের অনুকূলে বের হল নবাবের তিন নম্বর পরওয়ানা, খাস নবাবের সীলমোহর করা। চব্বিশটি মহল দান করা হল ইংরেজদের, সেই থেকে চব্বিশ পরগনা নাম হল।"

ভবতারণ সিংহ থেমে নস্যি নেন। পিয়ারীলালের ভারি ভাল লাগে এসব গল্প শুনতে। সে বলে, ইংরেজরা কবে থেকে সেট্‌লমেণ্ট সুরু করে সেইটি বলুন।

ভবতারণ বাবু হেসে বলেন, "সেটা তোমাদের অফিসাররাই শোনাবে। যে গল্পটি ওঁরা ট্রেনিংএর সময় চেপে যান সেটি আমি বললাম। তাও শেরশাহ্‌র পাঁচবছর রাজত্বকালের যে জরীপ সেটাতো বাদই দিলাম গো।"

দিন কেটে যাচ্ছিল। তখন বোধ হয় ১৯২৮ সনের ২৮শে আগষ্ট; খবর এল চার্জ অফিসার কার্টার সাহেব বিদায় নেবেন। মনটা খারাপ হল একটু। প্রকৃত খবরটা নেবার জন্যে আলিপুর গেল। জানল, ঠিক তাই। আলিপুর অফিস হতে ফেরবার পথে মাঝেরআট রেল ব্রীজের কাছে সে একটু দাঁড়ায়। মনটা খারাপ, অনেকদিন বাবার চিঠি পায়নি। পশ্চিমের দিকে রেলপথ সোজা বজবজের দিকে চলে গেছে। খিদিরপুরের গঙ্গায় জাহাজের কয়েকটি মাস্তুল চোখে পড়ে।

পেছন হতে হঠাৎ কে যেন নাম ধরে ডাকে। বৃদ্ধ আমিন মনমোহন মজুমদার। মনমোহনের বয়স বেশ হয়েছে, কিন্তু সরকারের খাতায় বয়েস কম লিখিয়েছে বলে এখনও চাকরী বজায় আছে। মাথার চুল সব সাদা, মুখের চামড়া কুঁচকে কদর্য হয়ে গেছে, সারাজীবন রৌদ্রে আর মাঠে কাটিয়ে গায়ের রং দাঁড়কাকের মতন কালো। বিবর্ণ ধুতি পরা, ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে লালকাপড়ের জুতো ধুলিধুসরিত।

মনমোহন মজুমদার বলে, "কি পিয়ারী, মেসে যাবে না ?"

পিয়ারী বলে, চলুন।

মনমোহন বাবু প্রশ্ন করে, "কি, বাবার জন্যে মন কেমন করছে ? যাওনা ঘুরে এসনা কদিন।"

পিয়ারী বলে, "কিন্তু চাকরী যে থাকবে না, তাহলে।"

মনমোহন মজুমদার বিবর্ণ-কাল ঠোঁটের মধ্য দিয়ে একটু হাসে, বলে মতির তবু ভাগ্য ভাল, যে তোমার মতন একটী ছেলে আছে। সে নিজেও ভাল আমিন। তুমিও বেশ কাজ শিখেছ। আর আমার এই বয়সে ? একটি ছেলেও যদি থাকত। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না।"

মনমোহনের দুঃখে পিয়ারীর মন খারাপ হয়ে যায়। এই মনমোহন সম্পর্কে অনেকের মুখে অনেক কথা শুনেছে, কিন্তু বিশ্বাস হয় নি।

মনমোহন বাবু যে গ্রামে তিনমাসের বেশী বাস করত, সেই গ্রামেরই একটী বয়স্থা মেয়ের পানিগ্রহণ করত। এই সব নিন্দুকদের হিসেব মতে নোয়াখালীর স্ত্রী ছাড়া, মনমোহন বাবুর মেদিনীপুরের গোকুলপুরে একটী, যশোরের কাশীপুরে একটী ও এই চব্বিশ পরগনায় মথুরাপুর থানায় আর একটী স্ত্রী আছে। মাঝে মাঝে সেখানে টাকা পয়সা পাঠায়, এবং কখনও কখনও সে নাকি সেখানে পদধূলিও দেয়। পিয়ারীলালের সে কথা ঠিক বিশ্বাস হতনা।

মনমোহন বাবু বলে, "পিয়ারী তুমি ভবতারনের সঙ্গে অফিসে বেশী কথাবার্তা বোলনা, অফিসাররা ওকে পছন্দ করে না। তোমার নামেও হয়তো কেউ শেষে লাগিয়ে দেবে।"

সামনেই একটা মিষ্টির দোকান, পিয়ারী বলে, "আসুন দাদু, একটু খেয়ে নিন।" মনমোহন মজুমদার এতটা হেঁটে আসতে হাঁপাচ্ছিল, খুসী হয়ে দোকানে ঢুকে একটা বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসে। নির্দেশমত দোকানী দুজনকে চারটে চারটে আটটা রসগোল্লা দেয়। রসগোল্লায় কামড় দিয়ে মনমোহন বাবু যেন একটু দয়াদ্র্র চিত্তে ফিস্ ফিস্ করে বলে "শোন ভায়া তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারতো নেই, ড্রইং সেকসনে কাজ দেখেন হেড্ কোয়ার্টার আর ও, সে তো সীট বোঝে তেমনি। সেজন্য কার্টার সাহেব যাবার আগে কজন ভাল ড্রাফ্ টসম্যান আমাদের মধ্য হতে নিয়ে ওখানে দেবেন। তুমি একটু চেষ্টা কর না।"

বৃদ্ধের কথায় পিয়ারী কৃতজ্ঞতা বোধ করে। বলে, সে চেষ্টা করবে।

মালদা জিলার সেট্‌লমেণ্ট সুরু হয়েছে, কার্টার সাহেব সেখানকার সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হয়ে যাচ্ছেন। এক তারিখ মাইনের দিন কার্টার সাহেবের ফেয়ারওয়েল।

সার্ভে বিল্ডিংএ চার্জ অফিসে সে একবার খোঁজ করে। বড়বাবু বলেন, "কার্টার সাহেব তোমার নাম সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের কাছে পাঠিয়েছিলেন রেকমেণ্ড করে। মনমোহন মজুমদার অ্যাসিসট্যাণ্ট সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের কাছে লাগিয়েছে, তুমি নাকি ভবতারণের সঙ্গে

মিশে সাহেবদের নামে যা তা বল। দেখ বাবা এসব কথা আবার কাউকে বোল না। ভাল একটি চান্স ফসকালো। তাছাড়া—।"

পিয়ারীর চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। একটা বিরাট অভিমান আসে, দুচোখ জলে ভরে যায়। ধীরে ধীরে অফিস হতে মাইনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। না, সে কখনও কার্টার সাহেবের ফেয়ারওয়েলে থাকবে না। মোমিনপুর ট্রামে এসে, বেহালার ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে বসে। মনটায় তার জমাট দুঃখ তখন। পিয়ারীলাল নির্বোধ, অর্বাচীন তাই সে তলিয়ে দেখে না। নইলে কার্টার সাহেবের ফেয়ারওয়েলে সে রইল কিনা তাতে কার্টার সাহেবের কিছুই আসে যায় না। তাছাড়া তার ফেয়ারওয়েলে ডেপুটী, সাবডেপুটি, মুনসীফদের মালা দেবার, বক্তৃতা দেবার গণ্ডগোলে, শত আমিনের মাঝে, তার মত নগণ্য লোকের অনুপস্থিতির কে দাম দেয়। যা ক্ষতি হল সেতো তারই হোল।

মেসে এসে দেখে চিঠি এসেছে দেশ হতে, মতিলালের খুব অসুখ, তার অবিলম্বে যাওয়া প্রয়োজন। লিখেছেন জ্ঞানদা চক্রবর্তী। পিয়ারী-লালের হাত কাঁপছিল। সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বেহালা ক্যাম্পে ভবতারণ বাবুর সঙ্গে দেখা করল।

ভবতারণ বাবু বল্লেন, "একখানা ছুটির দরখাস্ত রেখে রাত্রের ট্রেণে চলে যাও।"

ভবতারণ সিংহ গিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে রাত্রে ঢাকামেলে তুলে দিলেন। যেতে হবে কালুখালি জংশন নেমে, ভাটিয়াপাড়ার ট্রেণে। তারপর ব্যাসপুর ষ্টেশন হতে ছমাইল হেঁটে। ট্রেণের ঘণ্টা হল। ভবতারণ বাবু বল্লেন, "ভয় নেই, বাবা, ভালই আছেন।" দুর্দান্ত ঢাকা মেলটা ছেড়ে দিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

গাড়ী খুব ভোরে পৌঁছল কালুখালি। পিয়ারী নেমে পড়ে। গাড়ী মধুমতীর পারে কামারখালি যাবে। ফিরে আসতে প্রায় আধঘন্টা। পিয়ারী তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে গোপীনাথ সাউর চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। এখানকার সন্দেশ খুব চমৎকার। চা পেটে যেতেই শরীর ও মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঢাকা মেলের ভীড়ে, সারারাত একটুও ঘুম হয়নি। এরপর বাবার কথা আবার মনে হল, কেমন আছে কে জানে। আগেও একখানা চিঠি দিতে পারত। কামারখালি হতে গাড়ী এলে পিয়ারীলাল চড়ে বসে। ভোর হয়ে গেল, বাংলার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ছে। মাঠ সবুজধানে ভর্তি। পাট কাটা হয়ে গেছে। পাট পচাই চলেছে, পুকুরে। এক একটা ষ্টেশন পার হয়ে যায় আর পিয়ারীর উদ্বেগ বেড়ে চলে। বুক দুর্ দুর্ করে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখে ব্যাসপুর কতদূর। চোখে পড়ে কাল কোটপরা একজন চেকার এক কামরা হতে অন্য কামরায় পাদানীর ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পিয়ারী নিজের টিকিট পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করে, না ঠিক আছে।

হঠাৎ গাড়ীটা জঙ্গলটা পার হতেই বাঁকের মাথায় ব্যাসপুর ষ্টেশন দেখা যায়। পিয়ারী হাতে স্যুটকেশটা নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ায়। গাড়ী থামে। নীচু প্লাটফরম, পিয়ারীকে লাফিয়ে নামতে হবে। ষ্টেশন-মাষ্টারের হাতে টিকিট দিয়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে পরিচিত কাউকে দেখতে পেল না।

নৌকা করে পিয়ারী যখন গ্রামে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় বারটা। সারাপথ তবু এক চিন্তা। নিজের বলতে আছে শুধু এক বাবা। হে ভগবান, মাকালী তাকে রক্ষা কর। তোমাকে পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব।

সেনেদের বাড়ী নেমে নৌকা বিদায় করল, এখান হতে কোনমতে হেঁটে যাওয়া যাবে। গ্রামের লোকগুলোর আজ কি হল, একজনকেও

দেখা যাচ্ছে না, যাকে একটু খবর জিজ্ঞেস করবে। দুরুদুরু বক্ষে হাঁটতে থাকে। কি খবর শুনবে, কি দেখবে কে জানে।

লোকে বলে যৌবন হল সুখভোগের সময়। পৃথিবী, মানুষ, প্রতিটি প্রাণী সুন্দর বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যৌবনের আনন্দের দিন সুরু হতে না হতেই মানুষের দুঃখের দিনগুলি একের পর এক আঘাত করতে থাকে। প্রথমে বিদায় নেন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, যাঁদের কোলে পিঠে আমরা মানুষ হই। তারপর যায় পিতামাতা ও তাঁদের সমবয়স্করা। এ আঘাতগুলি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আসে সংসারের কঠিন নিস্পেষণ। প্রতিটি আঘাতের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে মানুষের আশাভরসার উপর অনাস্থা আনে।

বাড়ীর সীমানায় আসতেই দেখে বাইরের বড় আমগাছটা কাটা, সেটার কিছু কাঠ কেটে বার করা, কিছু ইতঃস্তত ছড়ান। মনটা সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ধাক্কা খায়। মাথা ঘুরতে থাকে। আচ্ছন্নের মত উঠোনে পা দিয়ে দেখে পারুলবালা উঠোনের উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে, থানপরা রুক্ষতার প্রতিমূর্তি।

চকিত দৃষ্টিপাতে পিয়ারীকে দেখেই পারুলবালা বুকভাঙা চিৎকার করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। 'বাবারে, একটা দিনও আগে যদি আসতিস্, তোকে চোখের দেখা একবার দেখতে পেত। শেষবার তোর কথা জিজ্ঞেস করেছে,—"পিয়ারী এসেছে?" পরশু রাত্রেই সব শেষ হয়ে গেছে……।" পিয়ারী হাতের টিনের সুটকেশ ফেলে দিয়ে মাটিতে চিৎকার করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে, বাবাগো, তোমায় শেষ বারের মতন একবার দেখতে পারলাম না। —ও-বাবা……বাবা গো…তুমি কোথায় গেলে‥ বাবা…।

মা ও ছেলের বিলাপে, জ্ঞানদাবাবুর বাড়ী, ক্ষুদিরামের বাড়ী, আশে-পাশের বাড়ী থেকে লোকজন এসে উঠোনে জমা হতে লাগল। সকলে মিলে তাদের ধরাধরি করে সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে নিয়ে গেল।

ছোট্ট শিশু-ভাইটা তখন হামাগুড়ি দিয়ে দাদার পা টা জড়িয়ে ধরে হাসছে, ডা-ডা-ডা-ডা……। সামনের দুটো দাঁত উঠেছে, নির্বোধ দৃষ্টি, কচি অসহায় ছোটভাইটিকে দেখেই পিয়ারী দুহাতে ওকে বুকে তুলে

ঝরঝর করে আবার কেঁদে ফেলে ! ও তো জানে না আজ কতটা ক্ষতি হল, কিন্তু তাকে তো বনোয়ারীকে মানুষ করতে হবে। একটা সমুদ্র-প্রমাণ মায়া এসে পিয়ারীকে আচ্ছন্ন করে।

বাবার মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে দুমাস চলে গেল। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। সেদিন সন্ধ্যায় পিয়ারী ছোটভাইকে কোলে নিয়ে জ্ঞানদাবাবুর কাছে গিয়েছিল।' মতিলালের কথা হচ্ছিল। জ্ঞানদাবাবু বললেন, "তুমি পৌঁছবার ঠিক আগের আগের দিন, যে রাত্রে বাড়াবাড়ি, মতিলাল জ্বরের ঘোরে কদিন প্রলাপ বকছিল, সেদিন যেন তাও বন্ধ হয়ে গেল। আমরা পালা করে রাত জাগছিলাম। সে রাত্রে বারটা পর্যন্ত আমার পালা, তোমার খুড়িমা যতক্ষণ আমি না যাব জেগে থাকবেন। বাড়ীতে আর তো কেউ নেই ঐ চাকরটা ছাড়া। আমি গীতাখানা সঙ্গে নিয়ে মতির শিয়রে বসে মনে মনে পড়ছিলাম। দেখ পিয়ারী, জীবনে অনেক গীতা পড়েছি কিন্তু এমন মন দিয়ে কোন দিন আর পড়া হয়নি। সে রাত্রে আকাশের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অবশ্য বৃষ্টি হয়নি। জানিনা কলকাতার দিকে বৃষ্টি হয়েছিল কিনা।" পিয়ারী জানায়, হয়নি।

জ্ঞানদাবাবু বললেন, "তা না হতে পারে। হ্যাঁ, শোন যা বলছিলাম। তোমার নতুন মা—এই খোকাকে নিয়ে পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছেন।' গ্রামের রাত তো, কটা বেজেছে জানিনা। সেই কোড়ল পাখীটা রাতের দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করতে ভাবলাম, যাই ক্ষুদিরামকে ডেকে দিই। ও আমার বৈঠকখানায় ঘুমিয়েছিল। গীতাখানা বন্ধ করে উঠলাম। মতিলাল যেন বেশ ঘুমুচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস বইছে। উঠে সন্তর্পণে গীতাখানা মুড়ে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এলাম। উঠোন পার হবার জন্য পা বাড়িয়েছি, কেমন যেন মনটা অস্বস্তিতে ভরে গেল। ভাবলাম, আর একটু থাকলে হত না! কি হল কে জানে। পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, তোমাদের ঘরের পেছনে পুব কোণে বিরাট এক পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাল মিশ্‌মিশে চেহারা, মাথা প্রায় বাড়ীর ঘরের চালে ঠেকেছে। ভাল করে দেখবার জন্য একটু এগিয়েছি, আর কিছুই চোখে পড়ল না। ভাবলাম, কি দেখতে কি দেখেছি। ক্ষুদিরামকে তুলে দিয়ে শুতে গেলাম।"

হারান মুখুজ্যে ছিল, বলল, 'তারপর ?' জ্ঞানদা বাবু সুরু করেন, "তারপর একটু চোখ লেগেছে, হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শুনে উঠে দেখি ক্ষুদিরাম ডাকছে। বলে, ও খুড়ো পিয়ারীর বাবা যে রা কাড়ছে না, শীগ্‌গীর আসুন তো। গিয়ে দেখি সত্যিই তাই। মতি আর নেই।

হারান মুখুজ্যে বলে, "ওরকম হয়, যমদূতেরা আগে আত্মা নিতে আসে। কিন্তু পিয়ারী, তুমি এই ছেলেটিকে সাবধানে রেখ, ওর হাতে লোহা দেবে। ওকে একলা ফেলে কেউ কোথাও যাবেনা, কারণ মৃতের কিছুদিন ওর উপর একটা টান থাকবে।"

জ্ঞানদাবাবু সমর্থন করলেন, বললেন, "দেখ, মতিলাল গীতা শুনে গেছে, যাবার সময়। যে কেউ এসে থাকুন, মতির বিষ্ণু লোকের নীচে কোনখানে স্থান হয়নি।"

পিয়ারী নির্বাক হয়ে শোনে আর চোখের জল মোছে।

রাত বাড়ছে দেখে, পিয়ারী ছোটভাইকে নিয়ে উঠে পড়ে। ছেলেটা কোলের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। জ্ঞানদাবাবুর বাড়ীর চাকর খগেন এসে হ্যারিকেন নিয়ে পিয়ারীকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিল। এ সময় নাকি একলা রাতে চলাফেরা করতে নেই।

পিয়ারী বাড়ী ফিরে দেখল পারুলবালা রান্না শেষ করে কুপীর স্তিমিত আলোতে বসে ক্ষুদিরামের পিসীর সঙ্গে গল্প করছে। ভাইকে শুইয়ে দিয়ে সে খেতে বসে। আজকাল পারুলবালাকে সে মা বলেই ডাকছে। খেতে খেতে বলে, "মা, আর তো থাকা চলে না, চাকরী তাহলে থাকবে না।" 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাবা। নইলে এ শূন্যপুরীতে আমি মরে যাব।" "তুমি কি ওখানে থাকতে পারবে মা? আমার বদলীর চাকরী। তোমার কত কষ্ট হবে।" "কেন পারব না, এ আর এমন কি কাজ রে বাবা।"

ক্ষুদির পিসী বলেন, "শোকতাপী মানুষকে এখানে রেখে যেওনা, পিয়ারী। সাথে নিয়ে যাও।" পিয়ারী বলে, "তবে তাই হক। পূজোর তো আর কদিন মাত্র বাকি। এ ক'টি দিন এখানে কাটিয়ে চল। এখন তো অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। পারুলবালা সম্মতি জানায়।

এবারের পূজো নিরানন্দ। বিধবার বেশে পারুলবালা আর কোথাও বেরোয় নি। এ পুজোতে লক্ষ্মী আসেনি, টেপি এসেছিল। সে মাঝে মাঝে, ক্ষুদিরামের বৌ মায়ার সঙ্গে এসে খবরাখবর করত। পিয়ারী মতিলালের নতুন বিয়ের পরে আর দেশেই আসেনি, সেই দুঃখ মাঝে মাঝে বড় হয়ে বাজে। ভাবে, অভিমানের মূল্য কি এমনি করেই দিতে হয়!

মাত্র দুবছর আগে জ্যৈষ্ঠের এক দুপুরে মতিলাল পারুলকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। সেদিন গাছের আমে হলুদ রং লেগেছে। মতিলালের পেছন পেছন এসে নিজের বাড়ীঘরে উঠতে, চারবাড়ির লোকেরা এসে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী বধূবরণ করেন। অনুষ্ঠানে ত্রুটি ছিল না। এদের আদর যত্নে পারুলবালার মনে হয়েছে, পুরানো আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে ফিরে এল যেন। অনেকদিন দেখা সাক্ষাত ছিল না, এই যা। পরের দিনই মতিলাল গোপাল কাহারকে ডেকে বাড়ীঘর পরিস্কার করায়। খুব ভোরে ঘুম হতে উঠে মতি দেখে, পারুলবালা গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে বাড়ীঘর ঝকঝকে করে তুলেছে।

মতি বলে, "এই সাত সকালে তুমি ঘর-বাড়ী, ডোয়া লেপতে বসেছো; অসুখ করবে যে।"

পারুলবালা হাসে, "এর চেয়ে কত বেশী কাজ করেছি মামাবাড়ী তুমি দ্যাখনি! হাড়ি কলসি সব এনে দাও, আজ এবেলা হতেই রাঁধব।

মতি মুখ ধুয়ে আসতেই মতিকে চা করে এনে দেয় পারুলবালা। ও জিনিসটা মতির খুব রপ্ত হয়েছে। চা পেয়ে ভারি খুসী।

চা খেয়ে মতিলাল দক্ষিণের পালপাড়া গিয়ে হাড়ি, কলসি কিনে নিয়ে আসে। রান্না চড়ে। নিজের বাড়ীতে কতদিন পরে রান্না।

গরমের দুপুর। পারুলবালা কাঠের উনুনে রাঁধছে, মতি ঘরে বসে কি যেন করছে। ভাত নামতে, তরকারি বসাতে যাবে, হঠাৎ পেছনের প্রবল টানে পারুলবালা উঃ! মাগো বলে একদম, মতিলালের গায়ের ওপর পড়ে যায়, বলে, "রান্না যে হবেনা।"

মতি বলে, "পরে হবে, তুমি একটু শোন না গো।"

পারুলবালা বলে, "কেউ আসবে, দেখবে।"

মতিলাল বলে, "কোথায় কেউ। সবাই যে যার কাজ করছে।" বাধ্য হয়ে পারুলবালা কড়া নামিয়ে মতির পেছন পেছন বড় ঘরে আসে। মতিলাল পাগলামী সুরু করে।

পারুলবালা বলে, "তুমি এটা রাত পেয়েছ ?"

সেদিনটা কি মধুর, কি তৃপ্তি আর আনন্দময়। এমন দিনগুলি পারুল আর জীবনে কখনো দেখেনি।

রাতে মতি বলে, "এত শিগ্গীর ঘুমিও না। এদিকে মুখ করে শোও।" পারুলবালা ঘুরে শোয়, বলে, "দ্বিতীয় পক্ষের বৌকে এত সোহাগ, লোকে মন্দ বলবে তো।"

মতি বলে, "কে আর দেখতে আসছে, এত রাতে।"

হাল ছেড়ে দেয় পারুলবালা। না, আর সঙ্কোচে কি লাভ। এখানে প্রকাশে তো কোন মানা নেই। কোন নিষেধ নেই। মতি তো তার সাথে কোন প্রতারণা করে নি। ঘরের স্তিমিত আলোতে তার গৌর সুন্দর সুডৌল মুখ, হাত-পা, দেখে এক একদিন মতিলালের চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি সে দেখেছে। কতরাতশেষে ঐ কোড়ল পাখীটা যখন শিমূল গাছের মধ্য হতে শেষ প্রহর ঘোষণা করেছে, পারুলবালা সস্নেহ আবেগে মতির মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে, 'নাও এবার ঘুমোও তো, আমি বাতাস করছি।' পারুলবালা বাতাস করে, কিন্তু কখন মতির বাহুবন্ধনে সেও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরে তখন রোদ এসে পড়েছে। গয়লা দুধ নিয়ে এসে ডাকাডাকি সুরু করে।

—প্রথম পূজোর সেই দিনগুলি পারুলের আজও মনে পড়ে। পিয়ারী পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়েছে, লিখেছে, সে আর এবার যেতে পারবে না, বাবা যেন রাগ না করে।

চিঠি পেয়ে, পারুলবালা কাঁদে আর বলে, আমার জন্যেই তোমার এমন ছেলে পর হয়ে যাচ্ছে গো।'

মতিলাল কি যেন একটু ভাবে, তার পর যেন বহু অতীতে ফিরে যায়। বলে "না গো, পিয়ারী আমার বড় ভাল ছেলে, সে কখনো তোমাকে ফেলতে পারবে না, আমার অবর্তমানে।"

কথাটা বলে ফেলে মতিও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়। পারুলবালা মৃদু ধমক দেয়, ও আবার কি কথার ছিরি।

## ॥ দুই ॥

ট্যাংরাখোলা হতে কাপড় এল, নতুন শাড়ী এল তার জন্য। নতুন, সব নতুন, নতুন অনভ্যস্ত জীবন. কেবল মনে করিয়ে দেয়, এ সব আনন্দ তার। আনন্দের আস্বাদনে পারুলবালা পাগল হয়ে ওঠে।

দশমীর দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে। একটু যেন কুয়াশার ভাব। মতি জেগেছে। হাত বাড়িয়ে ওকে ছুঁতেই ও বলে, 'আজ সারারাত্তই তো ঘুমুলে গো'। মতি লজ্জা পায়, এগিয়ে এসে পারুলকে আদর করে বলে, 'কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তাই জানিনা।' বাইরে পাখীগুলি কলরব করে উঠেছে। মতি বলে, 'এই যাঃ ভোর হয়ে গেল। তুমি কেন রাতে ডাকলে না।'

পারুলবালা হাসে, 'বাঃ আমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়িনি।' আজ পারুলবালা ভাবে, সেই ব্যর্থ রাতটাও কত মধুর ছিল তাদের।

এই গেল প্রথম পুজো, তার পরের পূজোয় বনোয়ারী এল। যত দিন এগিয়ে আসছিল ততই মতিলালের উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছিল। রাতে ঘুম না, জেগে বসে কাটাত তার সামনে। পারুলবালা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করত, মতির মুখে বেদনার কুঞ্চনরেখা দেখা দিত। কত মায়া যে লোকটার শরীরে ছিল। বনোয়ারীলাল এল। মতির কত আনন্দ। 'দোলনা তৈরী কর, পুরানো ছেঁড়া কাপড়ে জামা সেলাই কর। তেল মালিশ কর'। ক্ষুদির পিসী বলেছে, 'মতি তুই সর, আমি দেখছি'। সে সরে না। মতি যেন শেষ কদিন সংসারকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরেছিল।

এরপরের বর্ষায়, সেদিন হাট হতে এসে মতিলাল বলল, দেখতো, গা একটু গরম যেন। বমি বমি করছে। পারুলবালা গায়ে হাত দিয়ে দেখে ঠিক তাই। গা পুড়ে যাচ্ছে। বিছানা করে দেয়। দুবার প্রবল বেগে বমি হল। কম্প দিয়ে জ্বর এল। ভোরে সব ঠিক হয়ে

যায়। গা ঠাণ্ডা। তার দুদিন পরে পারুলবালা বিকেলে ঘাটে বাসন ধুচ্ছে। এই যাঃ খোকার ঝিনুকটা হাত থেকে ফস্‌কে জলে পড়ে গেল। পা দিয়ে একটু খুঁজলো, কিন্তু পাওয়া গেল না। বৃষ্টি টিপ্‌টাপ করে পড়ছিল। এতক্ষণে উদ্দাম হয়ে উঠতেই, পারুলবালা বাসন কোসন নিয়ে ছুটে ঘরে আসে। মতিলাল ছেলে কোলে আদর করছিল। পারুলবালা বাসন রাখতে রাখতে বলল, এই দেখ, বনোর ঝিনুকটা পড়ে গেল, কি করে রাতে দুধ খাওয়াই।

মতি উঠে, ছেলেকে রেখে, গামছা পরে ঘাটের দিকে তখনই চলে যায়। প্রায় আধঘণ্টা ডুব দিয়ে খুঁজে ঝিনুক মিলল। সে রাতে আবার জ্বর এল মতির। আর সেই জ্বরই তো কাল হল। ঐ খাটে শুয়ে···উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ সে আর রোধ করতে পারে না, হাউ হাউ করে কেঁদে চৌকিটার ওপব লুটিয়ে পড়ে। ঐ ভর সন্ধ্যায়, অমন রোগীকে কেউ বৃষ্টির মধ্যে পুকুরে ঝিনুক খুঁজতে পাঠায়?

* * * *

এক ঝলক উত্তুরে বাতাস এসে নারকেল, খেজুর গাছগুলির মাথা দুলিয়ে যায়। শীত এল বলে। খেজুরের রসে, পাটালীব গন্ধে, দুধের প্রাচুর্যে নতুন চালের স্বাদে, বাংলা দেশ পায়েস পিঠে নিয়ে মেতে উঠবে নবান্ন উৎসবে। তারপর আসবে দুরন্ত চৈত্র মাস। মজুমদাব, সেনেদের বাড়ীর কলাপাতা মোড়া পাট ঠাকুর নামান হবে। দূব গ্রাম হতে নমঃশূদ্র 'বালারা' আসবে। পাঠ ঠাকুর বন্দনা চলবে:

"এগারো মাস ছিলেরে পাট, চণ্ডিমণ্ডপ ঘরে,
চৈত্র মাসে তোমার পূজা প্রতি ঘবে ঘরে।
শিব শিব বলিয়া বালা দিল গরজন।
চৈতন্য হয়ে প্রভুর সন্ন্যাসে গমন॥"

ঢাক ঢোল হবে উদ্দাম, বালারা ঠাকুরের সামনে নাচতে থাকবে। বন্দনার পরে নিদ্রাভঙ্গ হলে, ঠাকুরস্নান হবে। তারপর প্রত্যেক দিন ঐ পাট নিয়ে, মাথায় করে গ্রামে, গ্রামান্তরে চলবে ভিক্ষা। একজনের মাথায়, সিন্দুর চর্চ্চিত নতুন লাল চেলী পরা ঠাকুর আর একজন ধামা কাঁধে। সঙ্গে ঢাক কাঁধে ঢুলি, কাসি হাতে তার ছেলে। সে পূজায়

কত আনন্দ : পুজো শেষে, মেলা। পিয়ারী এসে বলে, "মা, নৌকা ঠিক করে এলাম, পরশু রওনা হব। সব গোছগাছ করে নাও।" পারুলবালা নীরবে চোখ মোছে। যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে। সতীশ মামার পত্র এসেছে, তিনি পিয়ারীর সঙ্গে যাওয়া অনুমোদন করেছেন। তবে বাড়ী ঘরের যেন একটা সুবন্দোবস্ত করা হয়।

যাবার দিন সজল নেত্রে সবাই এল বিদায় দিতে। বাড়ী ঘরে তালা পড়ল। পারুলবালার নতুন সংসার। একজনের ফেলে যাওয়া পুরানো সংসারের মধ্যে সে নতুন করে সংসার তৈরী করেছিল। কত আশা, কল্পনা। তারপর কোল জুড়ে এল একটি সোনারচাঁদ ছেলে। এ দেশকে দু বছরে তার মণিরামপুর থেকে অনেক ভাল লেগেছিল। ঐ তো, এ নৌকাতে বসেই দেখা যায়. ঐ ঘরের দেয়ালে একখানা গণেশের ছবিওলা বিলিতি ক্যালেণ্ডার। ঘরবাড়ী সব মাজা-ঘষা পরিষ্কার। মতিলাল চা খায় বলে, একটা বড় শিরতোলা নীল কাপ সযত্নে ওপরে তোলা রয়েছে। এসব ছেড়ে যেতে যে কি কষ্ট হয়! মতিলাল তো এ বাড়ী ছাড়েনি, সে তো ঐ রান্নাঘরে, ঐ খাটের ওপর, উঠোনে, পুকুর ধারে, খেজুর গাছ, নতুন লাগান শিউলি গাছের কাছে ঘুরে বেড়াত। সেই শুধু থাকবে না। চকিতে আর একটা কথা তার মনে এল। সে কি অনধিকার প্রবেশ করেছিল সুশীলার সংসারে, আর তাই কি আজ সে তার স্বামীকে টেনে নিয়ে গেল! এখন, তার অবর্তমানে সেখানে মতিলালকে নিয়ে সুশীলা আবার ···!

চোখের জলে কোন কিছু ভাবা যায় না। আঁচল মুখে গুঁজে সে কাঁদতে থাকে। নৌকা ততক্ষণে চলতে সুরু করেছে। ঘাটে অশ্রুমুখী মেয়েরা তখনও দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ উঠোন, ঘরগুলি দেখা গেল। কিন্তু লগির জোর ধাক্কায় নৌকা, তর তর করে এগিয়ে চলেছে। বাড়ীর সামনের রয়না গাছটা অনেকক্ষণ চোখে পড়ল, তারপর সেটাও চোখের জলে ঝাপসা হয়ে এক সময়ে হারিয়ে গেল। কচুরিপানা ঠেলে নৌকা কাঞ্চনপুরের পথে চলল। ঐ তো, ডানদিকে কাজীটোলা দেখা যাচ্ছে, বাঁয়ে রইল, গোবিন্দপুর। নৌকা গ্রামের বাইরে এসে পড়েছে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

বাংলা দেশের থাক্ সার্ভে শেষ হবার পর, স্মিথ সাহেবের অধীনে ১৮৪৫ সনে রেভিনিউ সার্ভে আরম্ভ হয়। সে দিনের ২৪-পরগনার মাঠের জমি জরীপের কথা আজ শুধু জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। গ্রামে গ্রামে জরীপের তাঁবু পড়ে। নির্জন গ্রামগুলিতে জমিদার, নায়েব, উকিল, মুহুরী, কানুনগো, আমিন, চেনপিওনে সোরগোল। গ্রাম্যজীবনে জরীপ বেশী আসে না, একজন লোক ও জীবনে বেশী জরীপ দেখার সুযোগ পায় না। এ জরীপের ক'বছর নিস্তব্ধ গ্রামজীবনে যে আলোড়ন ওঠে, তা গ্রামের শিশু, বধূ, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, এবং সর্বস্তরেব ও প্রায় সর্ব-বয়সের মানুষকে কিছু না কিছু নাড়া দেবেই। নৈহাটী গড়িফার নব্বই বছরের বৃদ্ধ হরিহর সেনের মুখে শোনা যায় সেই ১৯২৪ সনের গল্প। তিনি তখন বালকমাত্র। দন্তবিরল মুখে তিনি ধীরে ধীরে বলতেন কানুনগো রমেশ বন্দোপাধ্যায়ের কথা ও তার ঘোড়াব গল্প। সেবকম প্রতাপ আজকালকার কানুনগোদের নেই।

একবার কানুনগো সাহেবের ঘোড়া কোন চাষীর ক্ষেতের ফসলের কিছু অনিষ্ট করে। চাষী জানত না যে হাকিমের ঘোড়া তার ফসল খেয়েছে। সে তাই প্রথমত ঘোড়াকে ধরে খোঁয়ারে পুবে ক'আনা নগদ পয়সা ট্যাকে নিয়ে ফিরল।

ঘোড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। নৈহাটী, গড়িফা, মালঞ্চের বাগ, হালিসহর, কাঁঠালপাড়া অঞ্চলে সোরগোল পড়ে গেল। কি সর্বনাশ! হাকিমের ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে খবর আনল চৌকিদার যে ঘোড়া কোন খোয়াড়ে এবং কে দিয়েছে। দারোগা সাহেব মহা আনন্দে হাকিমের তাঁবুকে গেলেন, ঘোড়া পাওয়া গেছে। এদিকে কয়েকজন সেপাই চাষীকে বেঁধে নিয়ে এল। পাশাপাশি দুই চেয়ারে হাকিম ও দারোগা বসেছিল। দারোগা বলল, 'স্যার, আপনি হাকিম, বিচার করুন।' 'বিচার টিচার আমাদের তেমন আসে না, যেরূপ আসে

মার খোর কয়া।' চাষীটী রমেশবাবুর পা জড়িয়ে ধরে শুয়ে ছিল। রমেশবাবু অত্যন্ত বিবেচক। তিনি বললেন, 'দেখ, তোমাকে কি শাস্তি দেয়া উচিত ভেবে ঠিক করতে পারছিনা।'

মাথা তুলে চাষীটী বললে, "হুজুর, এবারের মতন— ।"

দারোগা সাহেব বল্লেন, "চোপ্ শুওরকা বাচ্চা। তুমি হাকিম চেন, তার ঘোড়া চেন না ?" চাষীটী মাথা নত করে প'ড়ে রইল ভয়ে।

রমেশবাবু বললেন, "না দারোগাবাবু, ভদ্রসন্তান চাষ করে খায়, আমি শুওরকা-বাচ্চা বলব না। ভদ্রভাষা ব্যবহার করব, বলব শূকর-ছানা। এবার আমি ওর শাস্তি দেব না, কারণ আমারও একটু ভুল হয়েছে। কি করে চিনবে এটা হাকিমের ঘোড়া। ওর গলায় তো কিছু লেখা নেই। যাও তোমাকে এবারের মতন ক্ষমা করা হল।"

এরপর থেকে কানুনগো সাহেবের ঘোড়ার গলায় একটা নোটিশ-বোর্ড ঝুলত, "কানুনগো সাহেবের ঘোড়া। সাবধান।" তদবধি এ অঞ্চলে কানুনগো সাহেবের ঘোড়ার আর কোন অসুবিধে হয় নি।

এবার সেট্‌লমেণ্টের তাঁবু ১৯২৪ সনে গড়িফার প্রান্তে নদীর ধারে পড়ল। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। জমিদার ছুটল, নায়েব ছুটল, আমিনরা মাঠে গেল। সাহেব অফিসাররা ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠে যেতে লাগলেন। হরিহর সেন সব শুনে বললেন, 'নাঃ সে সেট্‌লমেণ্টের কাছে এ কিছু না। অফিসারদের প্রতাপ যেন, কমে যাচ্ছে। কটা জমিদারকে বেঁধে এনেছে তোমার কানুনগো ?'

পুরো দমে কাজ সুরু হল। চাষীরা চালের মধ্যে গোঁজা দাখিলা টেনে বার করল। বর্গাদাররা প্রথম থেকে দরবার সুরু করল। মধ্য-স্বত্বভোগীদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুত্ররা ছুটি নিয়ে বাড়ী আসতে আরম্ভ করল।

গ্রামের রায়ত, কোর্ফা, দখলকার সব শ্রেণীর মধ্যেই সুরু হল হট্টগোল। মালিকেরা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "হুঁ এবার খাজনা না দিলে আর দাখিলাটি হচ্ছে না।" অদূরে চিড়ে মুড়ি, মিষ্টির দোকান বসল। একটা চায়ের দোকানও খোলা হল। কাঁচরাপাড়া, শালিদহ, মহাবতীপারা, দূর নিকট হতে অজস্র লোক আসতে লাগল। ছোট

তালুকদারেরা, যারা কোনদিন ঠিকমতন খাজনা পেতেন না, তারা সুদ সমেত খাজনা বুঝে পেলেন। তাদের গৃহিনীদের মুখ প্রসন্ন হল। যে যার স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আর কোন কথাই নেই যেন দেশে, শুধু তজদিগ, অবজেকশান, মাপ, এই সব।

কানুনগোর তাঁবুর সামনে জমিদারীর কাছারীর একটি ঘরে বিরাট তক্তপোষের ওপর বৃহৎ টাকযুক্ত পেস্কারবাবু বসে কি সব দিনরাত লিখছেন। ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে কয়েকজন মোহরার বসে খতিয়ান খসড়া নিয়ে কি সব যোগ বিয়োগ করছে। ঘরের এক কোণে তিন চারখানা লম্বা তেপায়া প্লেন-টেবল ষ্ট্যাণ্ড, মাটিতে পিঁড়ির মতন কাঠের টেব্‌ল। কতগুলি চেন্ জড়াজড়ি করে মাটিতে রয়েছে।

কিস্তোয়ার শেষ হতে ১৯২৭ সন কেটে গেল। পরের বছর ১৯২৮ সনে এখানকার খানাপুরী বুঝারত শেষ হবার পর বর্তমান অফিসার মনোহর বণিক বদলী হয়ে গেলেন।

সেখানে যিনি এলেন তাঁর নাম প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন, বলিষ্ঠ আর রাশভারি লোক। প্রথমে এসে গৌরীপুর অয়েল মিলের কেসটা নিয়ে সুরু করলেন। এ মিলটা জরীপে সুরেশ মাইতি নাকি কি গোলমাল করছে, তিনি তদন্ত করে ওপরে রিপোর্ট পাঠালেন। সে সময়টা ছিল কার্টার সাহেবের যাবার সময়। তিনি চার্জ দেবার আগের দিন, সুরেশ মাইতিকে বদলীর আদেশ দিয়ে সেখানে পোষ্ট করলেন পিয়ারীলাল সরকারকে। জানালেন: পিয়ারীলাল ছুটির পর এসে জয়েন করবে, এবং সে একজন 'গুড্' আমিন্।'

এ রিপোর্টের পরেও কার্টার সাহেব পিয়ারীকে রেকমেণ্ড করায় সবাই ভেবেছিল যে অতি-অভিজ্ঞ, বয়স্ক ও সৎ একজন আমিনকে দেখবে; কিন্তু পিয়ারীকে দেখে সে ধারণা পাল্টে গেল। 'এই কার্টার সাহেবের গুড আমিন! এ কি কাজ করবে ?'

কিন্তু অফিসার প্রশান্তবাবু জানতেন, চার্জ অফিসার কার্টার সাহেব কি বস্তু। তার ইন্‌স্‌পেকশান ফেস করতে অনেক জঁাদরেল অফিসারেরও হৃদকম্প হয়। সেই কার্টার সাহেবের রেকমেনডেশান কি হেলার বস্তু।

তাছাড়া তিনিও তো লোক চরিয়ে খান। পিয়ারীর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝলেন, ছেলেটী সৎ ও সরল, বরং কিছুটা নির্বোধই। কাজকর্ম দেখেই বোঝা যাবে কেমন আমিন তিনি পেয়েছেন। মনে হয় ভালই হবে।

পিয়ারী জয়েন করে বলে, তার মা ও ছোট ভাইকে আনতে একদিন যেতে হবে। প্রশান্তবাবু গম্ভীর হয়ে তাকালেন। পিয়ারী বোঝে না, সাহেব বিরক্ত হল কি না। সে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। অদূরে পেস্কারের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল লাহিড়ীবাবুদের নায়েব পঞ্চানন মুখুজ্জের। হাতের কলম, খাঁচফরম হতে রেখে, প্রশান্তবাবু গম্ভীর গলায় ডাকেন, "পঞ্চাননবাবু শুনুন।" সশব্যস্তে বৃদ্ধ পঞ্চাননবাবু ছুটে এসে বলেন "হুজুর।"

"আপনাদের বাড়ীটাড়ি খালি আছে ? আমাদের নতুন আমিনবাবুর জন্যে একখানা চাই। ভাড়া কিন্তু কম হবে।" পঞ্চাননবাবু বলেন, "গঙ্গারপারে ছোট বাড়ীটা আমরা ছেড়ে দিই না। ভাড়া নিয়েছি শুনলে জমিদারবাবু ক্ষমা করবেন না।" প্রশান্তবাবু বল্লেন, "বেশ তাই দেবেন। আর একটা কথা—এদের একটু দেখতে হবে, এতো বাইরেই প্রায় থাকবে।" পঞ্চাননবাবু বলেন, নিশ্চয়, এদের কোন কষ্টই হবে না। আমি একটা বৃদ্ধা ঝি মোতায়েন কবে দেব। প্রশান্তবাবু বলেন, "যাও বাড়ী দেখে এস। পেস্কারবাবু আপনিও যান না।" সকলে মিলে বাড়ী দেখতে গেল।

* * * *

নতুন বাড়ীতে এসে পারুলবালার আনন্দ আর ধরে না। গঙ্গার ধারে এমন পাকাবাড়ী, দুখানা ঘর, পাকা রান্নাঘর, পাকা পায়খানা। ঠিক যেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীদের বাড়ী। পারুলবালা জীবনে কোনদিন পাকাবাড়ীতে থাকেনি ;

একদিন তো পিয়ারীলালকে জিজ্ঞেসই করল, "বাবা, এখানে অনেক পাকাবাড়ী, এরা সবাই কি জমিদার ?" পিয়ারী ছোট ভাই বনোয়ারী-লালকে রোদে বসে তেল মাখাচ্ছিল, সে হেসেই ফেলে। বলে, "না মা, সবাই জমিদার হবে কেন ? জমিদারদেরই শুধু পাকাবাড়ী হয় না,

তারাই শুধু বড়লোক হয় না, কারখানার মালিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টাররাও বড়লোক হয়। তাদেরও পাকাবাড়ী।

পারুলবালার ছেলের কাছে হারতে লজ্জা নেই, বলে, "কি জানি বাপু। দেখেছিতো ঐ মনিরামপুর আর নারানপুর। তোমার মতন তো আর আমি আমিনবাবু নই।"

পিয়ারীর ভারি আনন্দ হয়, মাকে পাকাবাড়ীতে রেখে। এ সুখের মধ্যে বাবার জন্যে একটু ব্যথা কাঁটার মতন খচ্ খচ করে। আহা, তিনি যদি এই গঙ্গার ধারে থাকতে পারতেন। হাসতে গিয়েও হাসি আসেনা পিয়ারীর।

আর পারুলবালার ? তারও এ চিন্তা হয় বৈকি। এখানে ভাল চা পাওয়া যায়। নৈহাটী ষ্টেশন রোডের চমচম্ কতো বড়। গঙ্গার ইলিশ কি চমৎকার। মতিলাল সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ ভাতে খেতে ভালবাসত। ইলিশ মাছই একটা নারানপুরের হাটে জোটান গেল না কোনদিন। গঙ্গার হাওয়ায় মন উদাস হয়ে যায়। দূরাগত নৌকাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, লোকটার কি মন্দভাগ্য। প্রথম স্ত্রী গেল অকালে মরে। তারপর তার মতন পেত্নীকে বিয়ে করে, হঠাৎ প্রাণটা দিল। আবার ভাবে, আমিনদের চাকরীই কি এরকম ? স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে কয়েক বছর একজায়গায় থাকতে পারবে না। খালি এ মাঠ হতে ও মাঠ, ও মাঠ হতে সে মাঠ।

নৈহাটিতে সবারই দিন খুব আনন্দে-কেটে যাচ্ছিল। পঞ্চাননবাবু একজন ঝি রেখে দিয়েছিলেন, মাইনে লাগত না। সুতরাং পারুল-বালার অনেক কাজও কমে গিয়েছিল। একদিন পিয়ারী বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখে, বুড়ী ঝি, পারুলবালার মাথা বেছে উকুন আনছে, আর পারুলবালা নখের চাপে সেগুলো পট্‌পট করে মারছে, আর বুড়ীঝিকে গ্রাম্য ছড়া বলছে ঃ

"ঘুইড়্যা বেড়ায় ডালে ডালে,
লীকে খুইচ্যা খায়।
পুইজালির কামড়ে বুড়ি,
ঘুগী হইয়া যায়।

অর্থাৎ বুড়ো উকুন চুলের ওপরে ওপরে ঘোরে বাচ্চাগুলি চুলের গোড়া কামড়ে খায় আর ডিম উকুনের কামড়ে বুড়ি পাগল হয়ে যোগিনী সেজে গৃহত্যাগ করে।

বৃদ্ধা ঝি এ দেশের মানুষ, বাঙ্গালভাষা সে কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। পিয়ারী আসতে উকুন বাছা বন্ধ হয়ে যায়। পিয়ারী মার হাতে একখানা বই দেয়।

বইখানার নাম রাজসিংহ। পারুলবালা মামার বাসায় বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি, আরব্যোপন্যাস পড়েছে, কিন্তু, এ বইয়ের নামতো শোনেনি। লেখকের নাম্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরদিন ছুটি ছিল, মা-ছেলে মিলে জোরে জোরে বইখানা পড়া শুরু করল। এসব কি লেখা। আশ্চর্য্য তো। এমন বইতো একখানাও পড়েনি।

'নায়ক রাজসিংহ, চিতোরের মহারাজা। সেখানে পাহাড়ের পর পাহাড়, তারপর পাহাড়। সেই পাহাড়ের দেশের মধ্যে আছে সোলাঙ্কি দেশের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী। তসবীর আলীর সে দেশে ছবি বিক্রয়। আরংজীবের ক্রোধ। বিরাট রণসজ্জা। মবারক হোসেনের বিশ্বাসঘাতকতায় আরংজীব পর্ব্বত কন্দরে বন্দী। বন্দী, বন্দী সব বন্দী। উদিপুরী বেগমের তামাক সাজা। বন্দীপুরীতে জেবউন্নিসার সহিত মবারক হোসেনের মিলন। হতভাগীনি দরিয়ার প্রতিহিংসায় মবারক ভস্মীভূত।' কি অপূর্ব সুন্দর লেখা। কখনও দিল্লির লালকেল্লায় বিলাস ব্যসনের দৃশ্য, নির্মলকুমারীর চতুরতা। এদিকে কখনও রাজসিংহের কামান ডাকছে, বৃক্ষ প্রাকার লঙ্ঘন করে গোলা ছুটছে।

বইখানা পড়া শেষ হলে একটা নিবিড় সহানুভূতিতে মন ভরে যায়।

পারুলবালা বইখানা উল্টে পাল্টে বলে, এ লেখকের আর বই নেই রে? আরও দু-এক খানা বই আনে পিয়ারী—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, রজনী। দিনগুলি বেশ কেটে যায়।

এর মধ্যে ধারে কাছে দু এক জায়গায় বেড়ানও চলে। রামপ্রসাদের ভিটা হালিশহরে। এখানেই তো রামপ্রসাদের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মা স্বয়ং, শুধু গানের লোভে। রামপ্রসাদের গান, প্রাণ উদাস করা। শ্যামনগরে পশ্চিমমুখী কালিবাড়ীতে গিয়ে, সেদিন শুনল এর

ইতিহাস। এ মূর্তি আগে ছিল দক্ষিণমুখী। রামপ্রসাদ রোজ রাতে নৌকায় বসে গান গাইত।

"প্রসাদ বলে কৃপা ; যদি মা,
হবে তোমার নিজগুণে ..।"

মা বললেন—ওরে, এদিকে ফিরে গা আমি একটু শুনি, মুখ ফেরা। প্রসাদ উদার গঙ্গাবক্ষে গান ধরে।

"আমার কাজ কি মা, সামান্য ধনে।
সামান্য ধন দিবে তারা,
পড়ে রবে ঘরের কোণে।" ..

মার কণ্ঠ ভেসে আসে মন্দির হতে, 'রামপ্রসাদ এদিক ফিরে গা।' প্রসাদ বলে, "যদি শুনতে ইচ্ছে হয় এদিক ফিরে শোন মা।" আবার গান ধরে।

"আমি অন্তিমকালে মা দুর্গা বলে,
ঠাই পাই যেন শ্রীচরণে।'

মা আর থাকতে পারেন না। মুখ পশ্চিম দিকে ঘোরান। সেই হতে শ্যামনগরের কালী পশ্চিমমুখী। পারুলবালা শুনে ভক্তিভরে প্রণাম করে।

পারুলবালা মা-বাপ মরা মেয়ে, সাতক্ষীরার গ্রামের বাইরে কোনদিন পা ফেলেনি। মাঝে মাঝে গ্রামের প্রান্তের কালিবাড়ীতে পুজো উপলক্ষে এলে দিগন্ত চোখে পড়ত। দূরে যেখানে আকাশ মাটিতে মেশে। ওদেশের নাম কি? যা কিছু স্নেহ সেতো ঐ মামামামীই দিয়েছেন। মতিলালের সঙ্গে তার বিয়ে হল, এ কত বড় ভাগ্য। তাওতো টিকলনা। তবু মন্দর ভালো পিয়ারী উপার্জনশীল, তাকে ভক্তিও করে। বনোকে কি ভালই না বাসে। 'এটুকু যেন বজায় রেখো মা, আর কিছু চাই না।' মাকালীকে প্রণাম করে, চোখে জল দেখা দেয়। পিয়ারী বলে "কৈ মা, চল ট্রেনের সময় হয়েছে।" স্টেশনের দিকে যেতে হয় অগত্যা।

## ॥ দুই ॥

আমরা যে সময়ের কথা লিখছি সে সময় কানুনগো ও উপরের অফিসাররা ছাড়া, আমিন, পেস্কার বা যাঁব মুহুরীদের অবস্থা ভাল ছিল না। আমিনরা অধিকাংশই ছিল, নোয়াখালি বা চট্টগ্রামের মুসলমান। কাজ ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। চৈত্র-বৈশাখের প্রখর রোদে যখন সকলে বিশ্রাম করে, তখন আমিন কানুনগোরা মাঠে কাজ করে। একটা গল্প প্রচলিত আছে সেট্‌লমেণ্টে। একবার একটী চাষীর গরু বাছুর হারিয়ে যায়। সারা গ্রাম খুঁজে না পেয়ে চাষী ও তার ছেলে গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে এসে উপস্থিত। প্রচণ্ড আগুনের মত গরম হাওয়া, বাতাস কাঁপছে। কার সাধ্য মাঠে নামে। দুজনে একটু ছায়ায় দাঁড়ায়। হঠাৎ চাষীর পো আঙ্গুল দিয়ে, অনেক দূরে দেখিয়ে বলে, “হুই যে বাবা, দূরে দেখছ, সাদা সাদা কি, ও নিশ্চয় আমাদের গরু-বাছুর।’ চাষী একবার সেদিকে তাকিয়ে বলে, “দূর বোকা, আমার গরু কি অত ‘গরু’ যে এই চোতের রোদে মাঠে যাবে ? ও নিশ্চয় ছেট্‌লমেণ্টের আমিন আর কানুনগোরা।”

এই কঠিন পরিশ্রমের জন্য অনেক সময় আমিন বাবুরা দুঃখ করে বলতেন, ‘সাতটা দাঁড়কাক মরলে তবে একটা আমিন হয়।’ অনেক আমিন কানুনগোদের ব্যক্তিগত কাজ পর্যন্ত করত। চাকরীরও কোন স্থায়িত্ব ছিল না। পুজোর ছুটিতে বাড়ী যাবার সময় তাদের বলা হত : ‘দাঁড়ান একটু, চাকরীর নোটিশটা নিয়ে যান।’ আবার ফিরে এলে নতুন নিয়োগ হত। দুটো বছর কেটে গেছে পিয়ারীর নৈহাটীতে।

সেদিনটা কি করেছিল আজ আর পিয়ারীর মনে নেই। সকালের ডাকে খবর এল, সেট্‌লমেণ্ট অফিসার বার্জ সাহেব আসছেন। সঙ্গে চার্জ অফিসার। প্রশান্ত বাবু পিয়ারীকে বলেন, “আপনি সীট আর খসড়াগুলো চেক্ করুন, আমি আর পেস্কার বাবু রেকর্ড এবং অফিস দেখছি। সমস্ত দিন পিয়ারী সীটগুলি দেখল, দু একটা ম্যাপে থোকা লাইন আঁকল। তারপর তিনটের সময় বলল “স্যার, আপনি একবার

দেখবেন, মনে হচ্ছে ঠিক আছে।" হাকিম বললেন, "আচ্ছা আমি দেখব। আপনি যান। কাল সকাল সকাল আসবেন।" পিয়ারী বেরিয়ে আসে। সোজা বাসায় না ঢুকে, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটুকরো ঘাসের উপর বসে। ওপারে চুঁচড়া প্রাচীন বনেদী সহর। গঙ্গার ঢেউগুলি দেখতে ভারি ভাল লাগে। ছোট বেলায় গঙ্গার গল্প বাবার মুখে শোনা হলেও দেখা হয়নি। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এল। কত লোক বেড়িয়ে ফিরে গেল। পিয়ারী উঠে পড়ে।

বাসায় এসে দেখে সাহেবের আর্দালী কেষ্ট এসেছে। কি নাকি ভয়ানক বিপদ, সীটে নাকি সাহেবের মুখের সিগ্রেটের আগুনের একটা ফুল্‌কি পড়ে কিছুটা পুড়ে গেছে। তবে ম্যাপের কাগজ এফোঁড় ওফোঁড় হয়নি।

পিয়ারীর হৃদকম্প উপস্থিত হয়। কাল সেট্‌েলমেণ্ট অফিসার আসবেন আর আজ এই অঘটন। সর্ব্বনাশ, কারও রক্ষা নেই কাল। জামা কাপড় আর ছাড়া হয় না, দ্রুতপায়ে ক্যাম্পে যায় পিয়ারী। সত্যিই শালিদহ মৌজারই একটা সীটে আগুনের ফুলকি পড়ে কাগজের ছাল উঠে গেছে, কিন্তু পরিস্কার ধরা যায় আগুনে পোড়া। সেট্‌লমেণ্টের ম্যাপ খুব পরিস্কার করে রাখতে হয়, কারণ মোটা লাইন, নোংরা কাজে অনেক গোলমাল হতে পারে ভবিষ্যতে।

প্রশান্ত বাবু বলেন, "পিয়ারী, তুমি যাহোক করে মুখ রক্ষা করো। জানই তো বার্জ সাহেব কেমন লোক।" অনেক দিন আগের ঘটনা আজ পিয়ারীর মনে পড়ে; খুলনায় সতীশ বাবুর বাড়ীতে থাকতে বিড়ি খাবার সময় ম্যাপের চোঙ্গা খুলতে তার প্রতি মতিলালের সাবধান বাণী। পিয়ারীর চোখে জল আসে। বাবা তার গুরু, বাবা যদি বেঁচে থাকতো আজ! সে হাত তুলে নমস্কার করে। প্রশান্ত বাবু বলেন, "আজ বাদে কাল ইন্‌স্‌পেকশান, তুমি এখন কাকে নমস্কার করছ? মনে হচ্ছে তুমি যেন খুসীই হয়েছ।"

পিয়ারী বলে, "না স্যার বহুদিন আগে আমার বাবা বলেছিল, 'ছাখ পিয়ারী, সীটের কাজ যখন করবি তখন সিগ্রেট, পান বিড়ি কিছু খাবি না।' তখন আমি চাকরী করি না। বাবা ছিল মস্ত আমিন।

আজ বুঝছি বাবার কথার মূল্য। বাবাতো মারা গেছেন, তাকে নমস্কার করলাম। আপনার দুর্দশায় কেন খুসী হব।" প্রশান্ত বাবু লজ্জিত হন, সত্যিই তো তাই, পিয়ারী তো তেমন নয়। পিয়ারী খসড়া, সীট নিয়ে বসে পরীক্ষা করতে থাকে। দাগটি শালি জমি, দখলকার ইউনিস মণ্ডল, এরিয়া এক একর তেরো শতক, কিন্তু সীটের দাগ···! প্রশান্ত বাবু, পেস্কার বাবু, এমনকি পিওনরা পর্যন্ত সব দাঁড়িয়ে দেখছে পিয়ারী কি করে। চিন্তা করতে করতে সহসা যেন বিদ্যুতের মতন একটা সমাধান মাথায় আসে। পিয়ারীলাল ডিভাইডারের দুই মুখ একত্র করে বলে, "স্যার, এখানে যদি একটা বটগাছের আলামত ( ছবি ) আঁকি তবেই সমাধান হয়। কালিতে পোড়াদাগ মিলে যাবে। আরও সুবিধে বটগাছ তো ইনসিটু ( প্লটের প্রকৃতস্থানে ) আঁকতে হবে না। তবে স্যার এটা ঠিক হবেনা, বটগাছ তো সরজমিনে নেই।" প্রশান্ত বাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলেন, "বাঁচালে, কি চমৎকার তোমার ব্রেন্। আঁকো আঁকো, আর খসড়া ঠিক কর।" পিয়ারীলাল তবু ইতঃস্ততঃ করে দেখে, প্রশান্ত বাবু বলেন, "ইন্‌স্‌পেকশান হয়ে গেলে কেটে দিলেই তো হলো। অতো চিন্তে কি, যাও না হয় কেষ্ট মাঠে বটগাছ পুঁতেই আসবে।" তার শেষ কথায় সকলে হেসে ওঠে।

পিয়ারী সসার, তুলি, পেনসিল্‌, রবার প্রভৃতি নিয়ে সীটে বটগাছ আঁকতে বসে। সাহেবের আর্দালী কেষ্ট হাজার ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের ডেলাইট জ্বেলে দিয়ে যায়।

পিয়ারীলাল সরকার ম্যাপে মিথ্যে বটগাছ এঁকে তোলে, কালি দিয়ে তুলি দিয়ে। তার নীচে চাপা পড়ে যায় আগুনে পোড়া কলঙ্ক দাগ।

বার্জ সাহেবের ইনস্‌পেকশান শেষ। কোন দিকে গোলযোগ হয় নি। এ তল্লাটের এটেষ্টেশান প্রায় শেষ ; এখন শুধু বাকী নৈহাটী। আর গড়িফা মৌজা। এ মৌজা চৌষট্টি ইঞ্চি স্কেলে মাপা।

দিন বেশ কেটে যাচ্ছে এখানে। একদিন টেবিলে প্রশান্ত বাবু কাজ করছেন, পিয়ারী উপস্থিত ছিল। এমনি সময় লাহিড়ীবাবুদের একজন গোমস্তা এসে প্রণাম করে। লোকটি সবে কাজে বহাল হয়েছে। বাড়ী চেঙ্গাইল না কোথায়। প্রশান্ত বাবু কলম রেখে, জিজ্ঞেস করেন,

"এখন কেমন ?" লোকটি বলে, "একটু ভাল স্যার, সর্দিটা আর তরল নেই। মালিশে খুব উপকার হয়েছে।" প্রশান্তবাবু বলেন, "মালিশ করেছিলেন নাকি ?

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, গরম গরম তৎক্ষণাৎ।"

হাকিম বলেন, "মাথায় ঢাললে আরও উপকার হত।"

সবাই এ ওর দিকে তাকান, কি ব্যাপার। প্রশান্তবাবু বলেন, "ব্যাপারটা হল, নতুন গোমস্তাবাবু সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে গলা ভেঙ্গে ছিলেন, বেশ একটু তরল সর্দিও হয়ে ছিল। আমি যতবার নীচে যাই, শুনি উনি কাসছেন। শেষে চা খাবার সময় এক কাপ গরম চা পাঠিয়ে দিলাম সেবনের জন্যে। সেই স্পর্কে আলাপ চলছিল।" উপস্থিত্ত লোকেরা প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

সেবার বাজারে ইলিশ বেশ সস্তা হয়েছে। পূজোটা কেটে যেতে, আবার যখন কাজ সুরু হয়েছে, এমনি একদিন। অফিস হতে বাড়ী ফেরার পথে পিয়ারী বাজারে ঢুকে পড়ে। পকেটে ক'আনা পয়সা আছে। একটা ইলিশ দর করার সময় দেখে আজকে এটেস্টেশনে যে ডিসপিউট ছিল, তারই বাদী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ইসারায় মাছওয়ালাকে কি বলেন। মাছওয়ালা কোন কথা না বলে মাছটা পিয়ারীর থলেতে পুরে দেয়। পিয়ারী বলে, "না অত দামের মাছ নেব না। পয়সা কম আছে।" মাছওয়ালা বলে, "নিয়ে যান, না হয় খেয়েই দাম দেবেন।"
পিয়ারী বলে, "বেশ কাল দাম দেব।" সে তবকাবির বাজারেব দিকে এগোয়। কেনাকাটি হলে যখন বেরিয়ে আসছে তখন দেখে নৃপেনবাবু মহালক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছেন।

পিয়ারী হাসিমুখে নমস্কার করে বলে, "কি খবর, আপনাদের কেসটার তো সরজমিন তদন্ত হবে।'

নৃপেনবাবু বলেন, "সে ব্যাপারেই একটু কথা বলব, আসুন না, এই মিষ্টির দোকানে বসি। বাইরে বড্ড ভীড়।"

অগত্যা ঢুকতে হয়। নৃপেন্দ্রবাবু কিছু মিষ্টির অর্ডার দেন, বলেন, "খান, এ দোকানের মিষ্টি সবারচেয়ে সেরা।"

পিয়ারী অফিস ফেরত, খিদেও পেয়েছিল, কিন্তু কুণ্ঠা হয়। এরা দুভাই নৃপেন্দ্র ও মুকুন্দ, পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া। পিতা মৃত্যুর আগে সকলই ভাগ করে দিয়েছেন, এবং রাস্তাটা দুজনের দলিলে না লিখে, শুধুমাত্র নৃপেন্দ্রের দলিলে দিয়ে গেছেন। এটা ভুল বলেই মনে হয়, তাছাড়া দুজনের সাধারণ ব্যবহার্য্য এই রাস্তা ব্যবহারও দুজনেই করে। মুকুন্দবাবু বলেন, এটা বাবার ভুল হয়েছে, আর আমি যখন এটা ব্যবহার করেছি, তখন ওর নামে রেকর্ড হলেও, আমার নামে ইজমেণ্ট যাবে কোথায়। আত্মপক্ষ সমর্থনে নৃপেন্দ্রবাবু বলেন, "না স্যার বাজে কথা, ওর দখল থাকলে তো।' অগত্যা সরজমিন তদন্ত ছাড়া এ মীমাংসার আশা নেই। এই হল মোটামুটি ঘটনাটুকু।

দোকানী এসে দুটি প্লেটে কিছু চম্‌চম্ রেখে যায়। পিয়ারী বলে "আবার মিষ্টি কেন, আপনাদের গোলমালটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত… ।"

নৃপেন্দ্রবাবু অমায়িক ভাবে হাসেন, "তাতে মিষ্টি কি দোষ করেছে। ঝগড়া আমাদের ভাইতে ভাইতে আর সেজন্য আপনাদের কি দোষ। আপনারা আপনাদের যা করবার করবেন।"

এরপর আর কুণ্ঠা থাকেনা। খেতে খেতে নৃপেনবাবু প্রথমে পিয়ারীর দেশঘরের খবর নিলেন। তারপর ভূমিকা শেষ হলে বলেন, "কিছু মনে করবেন না, এ এনকোয়ারীটা যদি আপনি আমার অনুকূলে করে দিতে পারেন, তাহলে কিছু পারিশ্রমিক দিতে পারি।"

এতক্ষণে পিয়ারীর কাছে সব পরিস্কার হয়। চটাচটি করা তার স্বভাব নয়, সে দৃঢ়ভাবে বলে, "আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি কেসের সময় সব বলবেন। যদি হাকিম কিছু করেন।"

নৃপেন্দ্রবাবু যেন একটু বিরক্ত হন। এতটুকু ছেলে, এদিকে ঘরে হাভাত, এমন করিস কেন ? বাইরে সে ভাব প্রকাশ না করে বলেন, "দেখুন একরাশ টাকা ফেলে যাবেন। তারচেয়ে ‥।"

পিয়ারী বলে, "ও কথা আর আমাকে বলবেন না।" সে বেরিয়ে যায়, অগত্যা নৃপেন্দ্রবাবুও দাম মিটিয়ে দিয়ে বাইরে আসেন।

পরের দিন মাছের দাম দিতে গিয়ে সেই জেলেকে আর খুঁজে

পাওয়া গেল না। নৃপেনবাবু তো মহাধরিবাজ লোক। সেদিনই পিয়ারী গিয়ে অফিসারকে সব জানিয়ে রাখল। কি জানি কিসে কি হয়।

কেসটি যথাসময়ে হয়ে গেল। দখল তদন্তে দুই ভাইয়ের দখল স্বীকৃত হল। মুকুন্দবাবু যাবার সময় হাকিমকে বিস্তর আশীর্বাদ করে গেলেন। আমিনের সহায়তায় প্রশান্তবাবু কেসটার স্বরূপ চিনতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি পিয়ারীকে ধন্যবাদ দিলেন।

সেদিনের কথা আজ মনে পড়লে মনে হয় মানুষের জীবনে উত্থান পতন দুটোই আছে। তারপর দুমাস কেটে গেছে। শীতের মরশুম। এ্যটেস্টেশন কোর্টে লোকও বেশী নেই, হঠাৎ দেখা যায় ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে চার্জ অফিসার সাহেব। প্রশান্তবাবু এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলেন, "গুড মর্নিং, স্যার।"

"গুড্ মর্নিং" বলে সাহেব একখানা চেয়ার টেনে বসে জিজ্ঞাসা করেন, আমিন পিয়ারীলাল সরকার কোথায়?"

পিয়ারী উঠে এসে যুক্ত করে মাথা যতদূর সম্ভব নুইয়ে প্রণাম করে।

চার্জ অফিসার বলেন, "তোমার নামে একটা কমপ্লেন আছে। কমপ্লেন করেছেন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তুমি তার এক জেলের কাছ হতে একটা ইলিশ মাছ নিয়েছ এবং নৃপেন্দ্রবাবুর কাছেও টাকা চেয়েছিলে। সে টাকা দেয়নি বলে তুমি দখল তদন্তে ভিন্ন রিপোর্ট দিয়েছ। জেলের খতিয়ানও খোলনি।"

পিয়ারীতো অবাক, সে আবার টাকা চাইল কখন। প্রশান্তবাবু চার্জ অফিসারকে বলেন সব ঘটনা। চার্জ অফিসার উত্তপ্ত হয়ে বলেন, "কিন্তু আমিনের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ইলিশ মাছের দাম না দিয়ে ও এল কেন? পিয়ারী কথা বলবে কি, সে তো ভয়েই অস্থির। কোনমতে অবাধ্য হাঁটু দুটোকে শক্ত করে সে তার বক্তব্য বলে।

নৃপেন্দ্র, মুকুন্দ, জেলে সকলকেই ডাকানো হল। মুকুন্দবাবু পিয়ারীর যথার্থতা সম্পর্কে রায় দিলেন। কিন্তু জেলের মাছ নেয়া সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। মনে হয় এটা নৃপেন্দ্রর কারসাজী।'

নৃপেন্দ্র ফোঁস করে উঠে বলেন, "ইওর অনার, শুনুন কি ধরণের কথা। আমি যাব জেলে ঠিক করতে। এর বিচার আপনার করতে হবে।" ঘরে মৃদু গুঞ্জন ওঠে।

চার্জ অফিসার বলেন, অর্ডার। ঘর আবার নিস্তব্ধ হয়। এরপর জেলের সাক্ষ্য। সে বলে আমনিবাবুকে সে অনেক দিনই চেনে, সেদিন তার কাছে একটি মাছ চেয়ে বলে গঙ্গার পারে যে চর উঠেছে তাতে তোমাকে প্রজা করে দেব। আমি একটা মাছ দিই। পরে জানলাম তিনি কিছুই করেননি। প্রশান্তবাবু অস্ফুটস্বরে বলেন, সব সাজান কথা। সাহেব বিকট চিৎকার করে জেলের গালে এক থাপ্পড় মেরে বলেন, "ইউ শালা, তুমি কেন মাছ দিয়েছিলে, তুমি ঝুটাকথা সব বলিতেছো।" জেলে সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে সব দোষ স্বীকার করে।

চার্জ অফিসার বলেন, "মালুম হল, এটা বোগাস দরখাস্ত, কোথায়, নৃপেন্দ্রবাবু কোথায়? নৃপেন্দ্র, মুকুন্দ তখন পায়ে পায়ে কোন সময় যেন ঘর হতে বেরিয়ে সরে পড়েছেন।

সাহেব বলেন, "কিন্তু পিয়ারী, তুমি ভবিষ্যতে, মাছ কিনে দাম দেবে। তোমাকে আমি রায়দিঘা বদলি করলাম, ওখানকার আমিন যদুলাল সিং এখানে আসবে। তুমি আগে মুভ করবে।'

সাহেব ইনস্পেকশান নোট দিয়ে চলে গেলেন, ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

যে সময়ের কথা লিখছি, তখন মথুরাপুর থানার রায়দিঘী অঞ্চলে এখনকার মত বিষ্ণুপুর হতে পাকা পীচের রাস্তা ছিল না। এখন তো কলকাতা, হাজিপুর দুদিক হতেই বাসে রায়দিঘী যাওয়া চলে। তখন ছিল হাঁটা পথ বা গরুর গাড়ীর পথ, তাও নিরাপদ নয়। বিষ্ণুপুরের কাছে যে মহাশ্মশান আছে, সেখান দিয়ে পূর্বে আদি

গঙ্গা প্রবাহিত হত। এবং গঙ্গা নাকি মথুরাপুরের লালপুর, নালুয়া, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কাশীনগর খাড়ি, কোম্পানীর টেক্, রায়দিঘী হয়ে সমুদ্রের পথে পাড়ি দিয়েছিল।

নদীখাতে নীচের স্তরে বালির অবস্থান ও খাতের পাড় বরাবর বড় বড় দিঘী, মন্দির ও প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষই তার নজীর। চাঁদ সদাগরের সমুদ্রযাত্রা এবং গঙ্গার পারে যে সব মন্দির সে ঐ সময় করেছিল, মনসামঙ্গলে তার বর্ণনার সঙ্গে অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত অনেক মন্দির ও স্থানের হুবহু মিল রয়েছে। পুরীর পথে নদের নিমাই কৃষ্ণচন্দ্রপুরের নিকট ছত্রভোগে এক বৃদ্ধার বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন। সেখানে ঘরবাড়ী কিছুই নেই, আছে শুধু একখানা ভিটা। এই গ্রামের লোকদের মুখে শোনা যায়, যে ত্রিপুরেশ্বরী ও অন্ধমুনি ঠাকুরের যে দুটি মূর্তি এখানে আছে, তাও সেই নিমাই ঠাকুরের স্থাপিত। এখানকার গঙ্গা সম্পর্কে চৈতন্য চরিতামৃতে রয়েছে :

“ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা,<br>
গঙ্গা ঘরে ঘরে।”

লালপুর, নালুয়া অঞ্চলে এই শুকিয়ে যাওয়া নদীর চড়ে এখনও ঠিক গোয়ালন্দ, দামোদর, আমতা অঞ্চলের মত তরমুজ, ফুটি, বাঙ্গি ফল ফলে। এ সময়ে সেট্লমেণ্ট ক্যাম্প ছিল রায়দিঘীতে। কোম্পানীর টেকের যে রাস্তাটি বরাবর দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, সেটা নাকি নাদির শাহ্‌র আমলে তৈরী। এ রাস্তাটি এখন ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু শোনা যায় এককালে একে আশ্রয় করে চাপলার খোপ, গণ্ডার গদী প্রভৃতির লোক কাশীনগর হাটে আসত। তখন কাশীনগরের হাট এ অঞ্চলের লোকের কাছে কলকাতার বড়বাজারের মতই ছিল। এখন কিন্তু বাস চালু হওয়ার জন্য সকলে কলকাতায় বাজার করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাশীনগরের হাট এখনও ঐ অঞ্চলের বড় বাজার।

তখন রায়দিঘী অঞ্চলে বিখ্যাত জমিদার ছিলেন সুধাংশু মণ্ডল। সুদের ব্যবসা, বন্ধকী কারবার সবকিছু নিয়ে তার অবস্থা জমজমাট। বাড়ী ছিল তার পাকা চক্ মিলান দালান। তার কূটবুদ্ধির জন্য প্রজাদের দুঃখের সীমা ছিল না। মূর্খ প্রজাদের কাছ হতে খাজানা আদায় করে,

মিথ্যে দাখিলা দিয়ে, তারপর করত উচ্ছেদের মামলা। চাষের সময় কুড়ি টাকা ধার দিলে চল্লিশটাকার ধান দিতে হত। ভাগচাষীদের ওপরও অত্যাচারের কোন কমতি নেই। অর্দ্ধেক ফসল ছাড়া, তারা দিত জমিদারকে নজরানা, খামার ঘেরানী, গোলা-কমতি, কালীপূজা-পার্বনি, ভাগ সেলামী ইত্যাদি। এসব দিয়ে প্রজারা গরীবই থেকে যেত, তারপর ছিল উচ্ছেদের ভয়। এর অনেক পরে তেভাগা আন্দোলনের ফলে সেলামী উঠে যায়, শুধু থাকে ফসলের আধাআধি ভাগ। ভাগ সেলামী কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত থেকে যায়, বিঘাপ্রতি সেলামী না দিলে, প্রজাদের ভাগ্যে জমি জুটত না। এখনও গোপনে এ প্রথা চালু আছে, ডায়মণ্ডহারবারে, থানায় থানায়।

এদিকের জল নোনা, সাপের খুব উপদ্রব। স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। রায়দিঘী বা সুন্দরবন অঞ্চলে বদলির খবর পেলে সরকারী চাকুরের প্রাণ উড়ে যেতো। সেট্‌লমেণ্টের চাকরীর স্থান অস্থান নেই।

এ অঞ্চলে মাপ্-জোক্ হয়ে যাবার পরে বুঝারত কানুনগো বিদায় নিলেন। এটেষ্টেশান শুরু হবে এরপর। হাটে হাটে ঢোল সহরৎ হল, প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ ঝুলল, সেট্‌লমেণ্টের লাল চাপকান পরা পিওন নোটিশ সই করিয়ে এনে পেস্কারবাবুকে ফেরৎ দিল। পেস্কার বসন্তবাবু বললেন জাং তাং, ফেং তাং লেখোনি কেন? অর্থাৎ নোটিশ জারির তারিখ, ফেরৎ দেবার তারিখ লেখা হয়নি কেন? পিওন জিভ্ কেটে সংশোধন করে দেয়।

এটেষ্টেশান ক্যাম্পের বাড়ী খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হয়েছিল। এ নোনা দেশে পাকাবাড়ী বা ভাল বাড়ী কোথায়? অবশেষে বাড়ীটি খুঁজে পাওয়া গেল, একটু দূরে এক পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ী। কবে কত বৎসর আগে জমিদার এ বাড়ী ছেড়ে ছিলেন তা জানা নেই, তবে পিয়ারী শুনেছিল, জমিদারের একটী ছেলে নাকি ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় একঘরে দরজা বন্ধ করে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করে। মেয়েটি আর কেউ নয়, তারই বিমাতা, বৃদ্ধ পিতার তৃতীয়া স্ত্রী। পিয়ারী সত্য মিথ্যা জানেনা, স্থানীয় লোকের কাছে শোনা মাত্র। বাড়ীটায় আর কেউ আসেনি, ভেতর বাইরে জঙ্গল হয়ে সত্যিই একটা

ভুতুড়ে বাড়ীতে পরিণত হয়েছিল। অনেকে নাকি অনেক কিছু এ বাড়ীতে দেখেছে। সন্ধ্যের পরে ওদিকে ভয়ে কেউ যেত না।

হঠাৎ সন্ধ্যের পরে একদিন সবাই দেখে কতগুলি লোক এসে বাড়ী পরিস্কার করছে। কি ব্যাপার? জানা গেল সেট্‌লমেণ্টের ক্যাম্প বসবে। বৃদ্ধেরা হাসে, বস্থক না। ভুত তো আর সরকার মানবে না। রাত্রে যখন ঐ ভাঙ্গা ঘরটায় হঠাৎ আগুন জ্বলবে, আর শোনা যাবে বিকট চিৎকার, মরে গেলুম, আগুন, বাঁচাও, তখন কোথায় থাকবে কান্নুনগো, আর কোথায় থাকবে আমিন, পেস্কার।'

তারপর কাজ শুরু হল। যে ভাঙ্গা ঘরটি ভৌতিক তার পাশের ঘরটা ভাল বলে রেকর্ডরুম করা হল। দিনের পর দিন যায়, কিন্তু কৈ, ভুততো কাউকে কোন ভয় দেখায় না। অবশেষে ভয় ভেঙ্গে গেল সবার। সবাই যেতে শুরু করল ক্যাম্পে, কিন্তু সে দিনের বেলায়, রাত্রে কে যায় ওদিকে! কি জানি যদি হঠাৎ···। এটেষ্টেশান হাকিম ছিলেন আফসারউদ্দিন সাহেব। বাড়ী মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে। কাল গোলগাল মুখ, পরিস্কার করে দাড়ি কামান, খুব চতুর কিন্তু অমায়িক। বয়স চল্লিশের ঘরে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে দেশে বলে অত্যন্ত বিমর্ষ। যতক্ষণ কাজ থাকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকর্ম করেন।

এদিকের কাজ বেশ চলছে, প্রায় বছর খানেক এটেষ্টেশান শুরু হয়েছে। সুন্দরবনের কাজ বলে একটু পরে হাত দেয়া হয়েছিল।

বর্তমান সদর আমিন ছিল যাত্নলাল সিং, আফসারউদ্দিন সাহেব তার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বদ্ধ কালা, কিন্তু ভাবখানা যেন সব শুনছে। হয়ত অফিসার বললেন, "মনিরটাণ্টে গেছিলেন?"

যাত্নলাল স্মিতহাস্যে মাথা নাড়ত, বলত, "যেতে বলচেন? যাব। তবে কাল স্যার পারব না, পরশু যাব।"

হাকিম তু এক খানা কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্টও ঝেড়েছিলেন।

একদিন বেলা প্রায় তুটোয় ধুলিধুসরিত দেহে পিয়ারীলাল এসে সাহেবকে নমস্কার করে দাঁড়ায়। সাহেব বলেন "আপনি কে?"

পিয়ারী পরিচয় দেয়। নৈহাটীর আত্যোপান্ত ঘটনা শুনে চিন্তিত মুখে তিনি বলেন, "তাহলে তো মুস্কিল করলে। একবার য্খন চার্জ

অফিসার চটেছেন তখন এখান পর্যন্ত ধাওয়া করবেন। দেখো, এখানে মাছটাছ নিওনা। এ হল মেছো দেশ, মাছ লোকে এমনিই দিতে চাইবে।' পিয়ারী নিশ্চুপ।

বসন্তবাবু অদূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন, এগিয়ে এসে বলেন, 'স্যার পিয়ারীবাবুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, ওর তো খাওয়া দাওয়া হয়নি। পরে জয়েনিং রিপোর্ট দেবে।' অফিসার হাতের ইঙ্গিতে ইসারা করে, কাজে মন দেন।
বসন্তবাবু পিয়ারীকে নিয়ে ভেতরে যান, স্নান খাওয়া দাওয়ার পর সংসারের খবর নেন। শেষে বলেন, "যাও, কাল গিয়ে পরশু মাকে, ভাইকে নিয়ে এস। চল, বিকেলে একটা বাড়ী ঠিক করে ফেলি।" যাতুলালও সঙ্গে চলল, ঘর দেখতে। ক্যাম্প হতে প্রায় দুমাইল দূরে ঘর, ভাড়া মাসিক দুটাকা। বাড়ীখানা প্রত্যুম্ন মণ্ডলের। কাশীনগরে তার দোকান আছে। সব ঠিক করে তারা ফিরে আসে ক্যাম্পে।

পরদিন সকালে যাতুলালকে রিলিজ করার সময় অর্ডার সই করতে করতে সাহেব মৃতুস্বরে বলেন, 'কিরকম একখানা জিনিস নৈহাটী যাচ্ছে, ওখানকার অফিসার পরে বুঝবে।' বসন্ত বাবু মৃদু হাসেন। সামনে দাঁড়িয়ে—যাতুলালের কিন্তু কোন বিকৃতি নেই, সে হয়ত শুনতে পায়নি এ আলোচনা। বেলা উঠতে উঠতে, পিয়ারী আর যাতুলাল সিং রওনা হল মথুরাপুর ষ্টেশনের পথে, কাঁচা সড়কে, মাঠে, মাঠে।

মানুষের জীবন অতিবিচিত্রতার এক সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অজানাকে নিজের মধ্যে বরণ করে মানুষ নিত্যনুতন জিনিস জানছে। অথচ আগে কত ভয়, কত আশঙ্কা। পিয়ারীর আজ মনে পড়ে, সেদিন রায়দিঘী বদলীর আদেশে সে কিরকম ভয় পেয়েছিল। সে শুনেছে, আগে এখানে রাতে বাঘ ডাকত। রায়দিঘী, কঙ্কনদিঘী সুন্দরবনেরই একটী অংশ ছিল। তখন বৃক্ষসঙ্কুল এস্থানে মানুষ জঙ্গল কেটে আবাদ সৃষ্টি করত। মেদিনীপুরের দুঃসাহসী মাহিষ্যরা স্থানীয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সহায়তায় এখানে জঙ্গল কেটে আবাদ করে। কত লোক বাঘের পেটে গেল, কতক গেল সাপের কামড়ে। তবু মানুষের সংগ্রাম চলে বনের বিরুদ্ধে, ঘরবাড়ী তৈরী হয়। ক্ষেত চষে ধান্য রোপণ চলে।

মাঝিরা নৌকায় পাড়ি জমায়, মনসাদ্বীপে, সাগরদ্বীপে, হাসনাবাদে। জেলেরা ধরে ইলিশ, ভেটকি, ট্যাংরা, চিংড়ি, কত কি।

ভাদ্রের কোটালে প্রকৃতি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। বাড়ীঘর, গাছ পড়ে যায়, নৌকা ডোবে, ফসল নোনা নদীর জল লেগে পুড়ে যায়। হিজলগাছে ভরে যায় নদীর কূল উপকূল। চারদিকে হাহাকার ওঠে। মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়। ঘর বাঁধে, বাঁধ বেঁধে লায়েক জঙ্গল বাহির আর লায়েক জঙ্গল ভিতর পৃথক করে। স্লুইসগেট বসে। মানুষ আরো সাবধান হয় যেন খামখেয়ালী প্রকৃতি আবার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে না ফেলে। জেলেরা ভেসে চলে নৌকা করে, মণিনদীতে, সপ্তমুখীতে, কার্জনক্রীকে, মাছ ধরে আনে। আবার ঝলমল করে ওঠে ক্ষেত সোনালী ফসলে। এই তো জীবন। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে সর্বক্ষণ টিঁকে থাকা। তবু যেন এক ফোঁটা মাটি না পড়ে থাকে বৃথা, অরণ্যসঙ্কুল, শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে। হার্মাদদের ভয় তো আর নেই, মানুষ মন দিল ঘর-সংসারে। জমি মাপল, ফসল ফলাল, স্বত্ব স্থির হল। দখল নিয়ে মানুষের বিবাদের সূত্রপাত হল। যাক সেতো পুরানো গল্প।

॥ দুই ॥

প্রদ্যুম্ন মণ্ডলের বাড়ী পিয়ারীলাল মা আর ভাইকে নিয়ে ওঠে। প্রথম দিন রাঁধতে হয়নি, প্রদ্যুম্ন মণ্ডলই নিজের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রথম দিন এখানকার রান্না খেয়ে পারুলবালা তো অবাক, এ একদম ভিন্ন রান্না। তাদের দেশের সঙ্গে মিল তো নেইই এমনকি নৈহাটী গড়িফা অঞ্চলের সঙ্গেও মিল নেই। পারুলবালার মনে হল তেল কমই এর কারণ।

ঘরসংসার পেতে বসে সে। রান্নাঘর নিকিয়ে পরিষ্কার হল। পিয়ারীকে বলল, 'রান্নাঘরের জন্য একটা কুপী যেন হাট হতে কিনে এন।' পরী একটা হ্যারিকেন দিয়েছে, তাতে ঘরের কাজ চলবে। দুটো চৌকি জোগাড় হল, একটা পাতা হল ঘরের ভেতরে, শোবে পারুলবালা আর বনো, অন্যটা দাওয়ায় পাতা হল, শোবে পিয়ারীলাল।

মাটিতে শোয়া এদেশে নিরাপদ নয়, সাপের খুব উপদ্রব। প্রায়ই শোনা যায়, সাপের কামড়ে লোকের মৃত্যু।

এখানে রান্না হত ভাত, শাকের তরকারী আর মাছের ঝোল। মাছ বেশ সস্তা, ডিমও মিলত। শোবার ঘরে একটা মাটির তাক ছিল, তাতে দরকারি জিনিসপত্র রাখা হত। পারুলবালা দুটো দড়ির ছিকে বানিয়েছিল, তাতে রান্নাঘরে ভাতের হাড়ি, কড়া এসব টানান থাকত, কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যেত প্রদ্যুম্ন মণ্ডলের দ্বিতীয়া স্ত্রী পরিস্কারীর কাছ হতে।

প্রদ্যুম্ন মণ্ডলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু এখনও তার ঋজু দেহ, কালো তামাটে গায়ের রং, কোটরাগত চক্ষু স্থির এবং উজ্জ্বল। এখান হতে কাশীপুরের দোকান অনেক দূর, প্রায় ছমাইল তিনি রোজ হেঁটে যেতেন খালি পায়ে। দোকানে পৌঁছে ছাতা বন্ধ করে কর্মচারীর হাতে দিয়ে চৌকির নিচ হতে খড়ম বার করে, পা ধুয়ে দোকানে বসেন। স্নান খাওয়া দাওয়া দোকানেই হত। সূর্যাস্তের একটু পূর্বে আবার দোকান বন্ধ করে ফিরে আসতেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যায়, প্রায় পনেরো বছর আগে, কোন ছেলেপুলে সে পক্ষের ছিল না। ঠিক করেছিলেন বিয়ে করবেন না, তারপর মাত্র বছর পাঁচেক আগে বর্তমান স্ত্রী পরিস্কারীকে বিয়ে করে আনেন। পরিস্কারীর গায়ের রং পরিষ্কার নয়, তবে দেহে অটুট যৌবন, যাতে পুরুষকে চঞ্চল করতে একটুও দেরী করে না। সে জন্যই হয়ত প্রদ্যুম্ন মণ্ডল এ বয়সে পরিস্কারীকে পাঁচ কুড়ি টাকা দিয়ে বিয়ে করেন।

এখন পর্যন্ত পরিস্কারীর কোন ছেলেপুলে নেই। বনোর উপর তার খুব টান। সারাদিন প্রায় কোলে কোলেই তাকে রাখে। পারুলবালার সংসারেরও কম সাহায্য সে করে না। পিয়ারীকে দেখলে প্রদ্যুম্নের স্ত্রী ঘোমটা টেনে দূরে সরে দাঁড়ায়। পারুলবালা বলে, ওকে দেখে অত লজ্জা কি, ও তো ছেলেমানুষ। কিন্তু পরিস্কারীর লজ্জা অত সহজে কাটেনি। একটা বছর ঘুরে আসে ক্রমে। তখন শীত। একদিন মাইনে পাওয়ার পর পিয়ারী মাকে বলে, 'যাই হাটে, একটু মাংস আনিগে। তোমার জন্য কিছু আনতে হবে ?"

পারুলবালা বলে, "আমার কিছু প্রয়োজন নেই। তুমি পরীর জন্য

ছ'টা কাচের চুড়ি এনো, আর বনোর জন্য একটা বল।" ছেলে প্রশ্ন করে "কি রংএর চুড়ি মা?" আড়ালে দাঁড়ানো পরীকে উদ্দেশ করে বলে, "বলনা বৌ, অত লজ্জা কি তোর।" পারুলবালা আর দাঁড়ায় না, কলসি নিয়ে জল আনতে চলে যায় ঘাটে।

পিয়ারীর কি হল কে জানে, সে চেঁচাতে থাকে। বলে, "কি রংএর চুড়ি আনব বলুন, লাল, সবুজ, না কালো?" কোন উত্তর নেই। পিয়ারী রাগ করে বলে, "আমি যা ইচ্ছে তাই আনব।" বাড়ীর বাইরে এসে পশ্চিমের পথ ধরে। খানিকটা গিয়ে কি জানি কেন পেছন ফিরে তাকাতে চোখে পড়ে, প্রত্যুম্ন বাবুদের ঘরের পশ্চিমের জানালায় দাঁড়িয়ে পরী, গায়ের বসন দেহের আড়াল প্রায় খুলে দিয়ে পরিপূর্ণ যৌবনকে অস্তউন্মুখ সূর্য্যের লাল আভায় মেলে ধরেছে। একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরী একবার হাতের তর্জনী কপালের সিঁদুরে রাখে, তারপর জানালা বন্ধ করে দেয়।

একটা বিদ্যুতের ঝলকানি চকিতে যেন পিয়ারীলালের দেহে লেগে তার শরীর মনকে অবশ করে ফেলে। অবশ পায়ে সে কাশীনগরের দিকে হাঁটতে সুরু করে। ভাবে, একি, পরীমাসী কেন এমন করে, তারই বা এমন লাগে কেন? পাশের কোন ক্ষেতটায় যেন খৈয়ের ধান পেকে উঠেছে প্রায়, তার গন্ধে মনটা ভুরভুর করছিল। পিয়ারী একটা সুখস্বপ্নের ঘোরে পথ চলে, ভারি ভাল লাগছে, আজ বিকেলটা তার ভারি ভাল লাগছে।

হাটে এসে চুড়ি কিনতে গিয়ে নানা রকমের চুড়ি দাম করে। দোকানী জিজ্ঞেস করে, 'কি রং চাই বাবু?' তাইতো কি রং, কি রং। কি রং মানাবে পরীমাসীর হাতে? গোল মসৃন হাত, রং মাজা কালো। হঠাৎ চমক লাগে, ওহো পরীমাসী তো কপালের সিঁদুর দেখিয়েছিল। সিঁদুরের রং তো লাল। মনটা প্রসন্নতায় ভরে যায়। ছটি লাল কাঁচের চুড়ি কিনে, বনোর বল কিনে, মাংসের দোকানের দিকে পা বাড়ায়।

ফেরার পথে প্রত্যুম্ন মণ্ডলের দোকানের সামনে আসতেই তিনি বলেন, 'চল একসঙ্গেই যাই।' দুজনে একসঙ্গে ফেরে। রাত্রি হয়ে এসেছে। প্রত্যুম্নবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কি জিনিস কিনলে, পিয়ারী?" সে মাংস আর বলের কথা বলে কিন্তু চুড়ির কথা তার মুখে আসে না।

না, পরীমাসীর জন্য সে চুড়ি কিনেছে একথা কিছুতেই বলতে পারবে না, প্রাণ গেলেও নয়।

বাড়ীর সামনে পুকুরধারে আসতেই দেখে কে একজন পুকুরপারে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে। দুজনেই চেঁচিয়ে ওঠে "কে ?" প্রদ্যুম্নবাবু হ্যারিকেন উঁচু করতেই দেখে কানুনগো সাহেবের আর্দ্দালী মন্নু মিঞা।

পিয়ারী বলে, "তুমি এখানে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে ?"

মন্নু মিঞা ঢোঁক গিলে বলে, "না ভাই তোমার খোঁজে এসেছিলাম।"

পিয়ারীলাল বলে, "তা চল ভেতরে বসবে।"

"না, না, রাত হয়ে গেছে, আর একদিন আসব।" মন্নু মিঞা অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

পিয়ারীলাল, ভেতরে ঢুকেই দেখে, মা লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছেন,

> একদিন গুরুবারে অবস্তিনগরে,
> নারীগণ মিলি যত লক্ষ্মীব্রত করে ॥
> শ্রীনগরবাসী এক বনিক তনয়।
> দৈবযোগে সেই স্থানে উপনীত হয় ॥
> অনেক সম্পত্তি তার ভাই পঞ্চজন।
> পরস্পর অনুগত রয় সর্ব্বক্ষণ ॥

সামনে বসে পরী, কোলে বনোয়ারীলাল। বনোকে বল দিতে সে বল নিয়ে ঘরের মধ্যেই ছোঁড়াছুড়ি সুরু করল। স্বামীর গলাখাঁকারী পেয়ে পরী অদৃশ্য হয়ে গেছে। মা বলেন, 'দাঁড়া এটুকু শেষ করে নি।' বাকীটুকু গড় গড় করে মুখস্থ বলে, লক্ষ্মীকে ঢিপ করে এক প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়।

রেকাবী হতে একখানা বাতাসা ছেলেকে দেয়, তারপর নিজে একটু মুখে ফেলে পরীর জন্য দুখানা সরিয়ে রেখে বাকীটুকু বনোকে দিয়ে দেয়।

চুড়ি দেখে মা খুব খুশি, বলেন "দাঁড়া ওকে দিয়ে আসি, তারপর মাংস দেখব। রান্নাঘরে রেখেছিস তো ?"

পিয়ারী হাতমুখ ধুয়ে ছোটভাইকে নিয়ে বল খেলতে সুরু করে। কিন্তু তার কান, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে, চুড়ি পড়া একখানা হাতের শব্দের অপেক্ষায়। কেমন দেখাচ্ছে পরীমাসীকে লাল চুড়িতে ?

চুড়ি পড়ে সে কি বলল ? কিন্তু সে রাত্রে আর কারও সাড়া মেলে না।

রোজ সন্ধ্যায় পারুলবালা যখন জল আনতে যায়, তখন দেখে মন্নু মিঞা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। মন্নুর বয়স প্রায় চল্লিশ, পান-দোক্তা খাবার ফলে দাতের রং কালো হয়ে গেছে। পারুলবালা, সাহেবের আর্দালী মন্নু মিঞাকে চেনে । কোন কথা না বলে গায়ের কাপড় ঠিক করে সে জল নিয়ে ফিরে আসে। এ কথাটা লজ্জায় সে ছেলেকে বলে না। থাকগে যার খুশি দাঁড়িয়ে, সে ঠিক থাকলেই হয়। ইদানীং পারুলবালা বেলাবেলি জল এনে রাখত।

এর পর একদিন পরী আর পারুলবালা গল্প করছে। মা বলছে, ছেলের বিয়ের কথা। 'ছেলে বড় হয়েছে, আমাদের কর্তব্য আমরা করি। এবার দেশে গিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

পরী মাথা নাড়ে, সে তো ঠিকই। কিন্তু মুখ দেখে মনে হয় পিয়ারীর বিয়ের আলোচনায় সে যেন পুরোপুরি খুশি নয়। এমনি সময় কোথাকার একটা বদর সেরে পিয়ারী বাড়ীতে ঢোকে। পরী একটু কটাক্ষ করে, চুড়ির শব্দ করে উঠে যায়। পারুলবালা ঘরে যায় আলো জ্বালতে। পিয়ারীলাল জামা-জুতো খুলে, গামছা নিয়ে ঘাটে যায়। প্রায়ান্ধকার জলে হাত দিতেই জলে ঢেউ ওঠে। হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে উঠতেই মনে হল একটা যেন ছায়ামূর্তি চট করে পুকুর পাড় হতে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

পিয়ারীর মনটা খারাপ হয়ে যায়। মন্নু নয়তো ? ওর উদ্দেশ্য কি ? অফিসে গিয়ে সাহেবকে জানাতে হবে। ফিরে এসে দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। রান্নাঘরে মা রাঁধছে, বনো তার কোলে।

প্রদ্যুম্ন মণ্ডল তখনও ফেরেনি, পিয়ারী মাকে বলে, "মন্নুটা অন্ধকারে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কি ব্যাপার মা ? আর একদিনও দেখেছি।"

"আমি তো রোজই দেখি। ওর চাউনি টাউনি ভাল নয়, বাবা।"

পিয়ারী রেগে বলে, 'আমি কালই সাহেবকে বলব।'

প্রদ্যুম্ন মণ্ডল আলো হাতে ফেরেন। আর কোন কথা হয় না।

খাওয়া দাওয়া চুকে গেল, সবাই শুয়ে পড়েছে। পিয়ারী সেদিনের বদরের রিপোর্টটা লিখছে। মণ্ডল বাড়ীর খাওয়া দাওয়াও শেষ। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে উঠোনে কাটাধানগুলিকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। কত যেন রাত

হয়েছে খেয়াল নেই। পিয়ারী দেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে পরী মাসী তাকে ডাকছে, হাতের ইসারায়। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ান। পিয়ারী জানেনা কোন সময় সে নেমে এসেছে। সামনে দাঁড়াতেই পরী তার চুড়িপরা হাত পিয়ারীর চোখের সামনে এনে বলে, "কালো মেয়ের জন্য লালচুড়ি আনলে যে বড় ?" পিয়ারী বোকা হয়ে যায়, কোন কথা সে বলতে পারে না। ঘামতে থাকে।

ফাল্গুন মাসের সবে সুরু, ধানকাটা শেষ। মাঝে মাঝে একটু দখিনা বাতাস ছাড়ে, লেবু ফুলের গন্ধে উঠোন মুখর হয়ে ওঠে। আবার শীত জেঁকে আসে।

পিয়ারী ভাবে, পরী মাসী অত কাছে দাঁড়িয়ে কেন ? পরী তার দুহাত দিয়ে পিয়ারীর গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রেখে বলে, "পোড়া কপাল দেখিয়েছিলাম, সিঁদুরের রং দেখাইনিগো। বুড়োর বদলে যদি তোমাকে পেতাম।"

পিয়ারী আর কিছু জানেনা, একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে সে পরীর বুকে ভেঙ্গে পড়ে, যেমনি করে জোয়ারের সময় মণি নদীর মধ্যে দুপাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। ভাঁটার সময় কে তার চিহ্ন আর খুঁজে পায় ?

* * * *

এসময়কার বৈশাখের একটা দিন পিয়াবীর খুব মনে পড়ে। খুব গরম। কাজকর্মের শেষে, অফিসার, পেশকার বাবু, আর পিয়ারী বেড়াতে বেড়াতে নদীর পারে এসে উপস্থিত। অস্পষ্ট সন্ধ্যা হতেই আকাশে দু'একটা তারা দেখা দিতে সুরু করে। সকলে মিলে ফেরার পথে রায়দিঘীর দিঘীটার পাড়ে এসে বসে। অফিসার বসলেন ব্রিটিশদের পরিত্যক্ত কামানটার ওপরে।

বেশ মনোরম ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সবাই চুপচাপ। হঠাৎ একটা যেন কলরব, কতগুলো লোকের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল। পিয়ারী এগিয়ে এসে দেখে কজন জোয়ান লোক মন্নু মিঞাকে ধরে আনছে। অফিসারকে বলতেই তিনি ওদের ডাকলেন। আফসারউদ্দিন

সাহেবের ডাকে ওরা এল। মন্নু মিঞার হাত বাঁধা, লোকগুলির হাতে লাঠি।

ওরা এসে বলে, "স্যার, আপনার এই চাপরাশীর জন্য কি আমরা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করতে পারব না? রোজ রোজ গিয়ে মেয়েদের দিকে অশ্লীল ভাবে তাকাবে, নানা রকম মন্তব্য করবে। আজ—।"

জানা গেল, ইদানীং মন্নু রোজ সন্ধ্যায় মহাভারত মণ্ডলের বাড়ীর কাছে হানা দিত। লক্ষ্য তার ছেলের বৌ। খবরটা রটনা হয়ে যায়। সবাই লক্ষ্য রাখে, মন্নুর দিকে। আজ সন্ধ্যায়, যখন বিনয়ী মাঠে গরু আনতে যায়, তখন মন্নু হঠাৎ বেরিয়ে এসে, ওর হাত ধরে টান দেয়। বিনয়ী চিৎকার দিয়ে উঠতেই, মাঠে কর্মরত আর একটা লোক ছুটে এসে মন্নু মিঞাকে ধরে ফেলে।

আফসারউদ্দিন সাহেব, পিয়ারীর মুখে আগেও শুনেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেননি। নালিশ শুনে, হঠাৎ ওদের হাতের একটা লাঠি টেনে মন্নুকে এলোপাথারি মারতে সুরু করেন। মন্নুর হাত বাঁধা। 'ইয়াআল্লা আর করবনা, স্যার। এবার মাপ করুন, স্যার,' বলে মন্নু মাটিতে গড়াতে থাকে। অবশেষে বসন্তবাবু, আর পিয়ারী আটকায়। লোকগুলো চলে গেল। পিয়ারী মন্নুর হাতের বাঁধন খুলে ওকে দাঁড় করাল। ওর একটা পা হয়ত ভেঙ্গে গেছে, ভাল করে দাঁড়াতেই পারছে না। সেই অবস্থাযই কোনমতে মন্নু মিঞা লুঙ্গি ঠিক করে সাহেবের কাছ হতে সরে যায়। কি জানি আবার যদি অফিসার,.........?

এরপর যে কদিন ওখানে মন্নু মিঞা ছিল, কোনদিন আর কারুর বাড়ীর সামনে রাতের অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে শোনা যায়নি। অফিসার তার রোগের ফলপ্রদ ওষুধই প্রয়োগ করেছিলেন।

## ॥ তিন ॥

গ্রীষ্মকাল অতীত হয়ে বর্ষা এসে পড়ে। মাঠে কাজ করবার আর উপায় থাকে না। নোনা দেশ, বৃষ্টি হলে রাস্তায় বেরোবার সাধ্য নেই। কাদা পায়ে পায়ে জড়িয়ে পা এমনি ভারি হবে যে হাঁটা এক অসম্ভব

ব্যাপার। পিয়ারীর অফিস কামাই হচ্ছিল। অবশ্য কাজ তেমন ছিল না। সকালে পিয়ারী চা খেতে খেতে জানালা দিয়ে বৃষ্টির খেলা দেখত। দূরের মেঘগুলি কেমন বাতাসের বেগে ভেসে এসে জলভারমুক্ত হয়ে চলে যায়। সারাদিন গুম্‌গুম্ আওয়াজ। ঘর অন্ধকার, উঠোনে একহাঁটু জল। প্রত্যুম্নবাবু বৃষ্টির রকম দেখে দোকানেই থাকছেন। পিয়ারী নিজের ঘরে ভাইকে নিয়ে খেলা করে। দুপুরে মা বনোকে নিয়ে যখন ঘুমোয়, পরী এসে পিয়ারীকে ইসারা করে ডেকে নিয়ে যায়। দুপুরে দুজনে লুডো খেলে। পরী যে পিয়ারীর সঙ্গে কথা বলে, এজন্য পারুলবালা খুশি। পিয়ারীর আজও মনে আছে তার আনন্দোচ্ছল একটা দিক যেন সেদিন নতুন সঙ্গী পেয়ে জেগে উঠেছিল। অনভ্যস্ত এই জীবন, তবুও কি মধুর, সুন্দর।

সেই বর্ষণমুখর দিনটি পিয়ারীলালের সারা জীবনের সঞ্চয়। রবিবার ঘরে খাওয়া দাওয়ার পরে মা বনোকে নিয়ে নিদ্রায় অচেতন। পিয়ারী একটা গামছা মাথায় দিয়ে পরীর ঘরে এসে দেখে, সে ঘুমুচ্ছে। চুল ধরে একটা টান দিতেই পরী চিৎকার করে ওঠে, "উঃ উঃ গেলাম।"

পিয়ারী হেসে বলে, "তবে যে ঘুমুচ্ছিলে ?"

পরী বলে "তোমাকে দেখে।"

দুজনে খুব হাসতে থাকে। পরী বলে, "লুডো খেলবে ?"

"সেজন্যই তো আসা।

চৌকির ওপর দুজনে কাঁথা গায়ে খেলতে বসে!

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি, ঘন ঘন মেঘের ডাক আকাশে। রায়-দিঘীর নদীর তীর, কাছারিবাড়ী, তালগাছ কিছুই চোখে পড়ে না। ঘরে জল আসছে দেখে পরী দরজা, জানালা বন্ধ করে দেয়। ঘর অন্ধকার, কিছুই নজরে আসে না অগত্যা খেলা আর চলে না, দুজনে গল্প সুরু করে। পরী বলে তার দেশের ছোট বেলার গল্প। তাদের দেশ ধোসা তে এক-বার এক বাঘ এসে পড়ে। রোজ রোজ সে গরু ছাগল ধরে নিয়ে গিয়ে খায়। বাঘটা যেন লুকোচুরি খেলা জানে। কেউ শিকার করতে পারে না। সমস্ত রাত পাহারার পর লোকেরা যেই একটু ঘুমিয়েছে, অমনি ব্যস্, একটা গরু নিয়ে চলে গেল। সকলে গিয়ে পঞ্চানন ঠাকুরের কাছে

ছড্যা দেয়। পঞ্চানন ঠাকুর স্বপ্নে বলেন, 'রামনগরের দক্ষিণেশ্বর বাবার কাছে মানত কর, তা হলে উপদ্রব কমে যাবে।' সবাই মিলে রামনগরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে মানত করল, এরপর বাঘের উপদ্রব বন্ধ হল। "সেই বাঘটার গোঁফ ছিল, এই এরকম," বলে পরী পিয়ারীর গোঁফে এক টান দিল। পিয়ারী যন্ত্রনায় 'উঃ' করে উঠতেই পরী হেসে পিয়ারীর কোলে গড়িয়ে পড়ে।

উনিশশো তেত্রিশ সনের এ দিনটা যেন তার জীবনের হঠাৎ একটা কুড়িয়ে পাওয়া রত্ন। সে কি নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি, কি অন্ধকার আর মেঘের ডাক। পরীর মুখে অদ্ভুত হাসি। ভিজে চুলে কি তেলের যেন সুগন্ধ। দুজনের কত গল্প, কত মন জানাজানি, কত টুকরো কথা। পিয়ারী ভাবে সে যা পেল তা অনির্বচনীয়, পরী ভাবে লাভ তো তারই। তাদের পরম আনন্দময় দিনটি গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে আসে। রায়দিঘীর নদীর ওপারে ফাঁকা আকাশের উপর দিয়ে তখনও মেঘের অভিনব অভিযান অব্যাহত। অবিশ্রাম বৃষ্টি শুষ্ক পৃথিবীকে ক্রমাগত ভিজিয়ে সরস করে ফসলের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলছে। আকাশ-মাটি-মন অন্ধকারে একাকার। তবুও বৃষ্টির বিরাম নেই।

* * * *

পুজোর ছুটির কটা দিন মাত্র আগে অফিসার বদলী হয়ে সদরে যান নতুন হাকিম এলেন অবনীকান্ত ভট্টাচার্য্য। পিয়ারী ভাবে এবার তারও হয়তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। পুরানো অফিসারের বিরুদ্ধে গ্রাম হতে নালিশ হয়েছিল। নালিশ করেছিলেন, সুধাংশু মণ্ডল, সুধীর আদক, প্রভৃতি। তিনি নাকি তঙ্গদিগের সময় হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে অশিষ্ট মন্তব্য করেছিলেন। মন্নু মিঞা সম্পর্কেও তাদের নালিশ ছিল। সকলে গিয়ে সদরে নালিশ করে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই অফিসার সাহেবের বদলীর আদেশ আসে।

কোনক্রমে পূজো কেটে গেল। ছুটী ছাড়া এ পূজোতে সে আর কোন বৈচিত্র্য পায় না। মা, পরী, বনো সকলে গিয়ে একদিন সুধাংশু মণ্ডলের বাড়ীর পূজো দেখে আসে। দেশের পূজোর সঙ্গে এখানকার পূজোর কোন মিলই নেই। সেখানে যেন পূজোর বহু আগে হতে আকাশের,

বাতাসের রং বদলে যায়, মানুষের মনে সাড়া জাগে···। প্রত্যেক বাড়ীর দুর্বা পরিস্কার হয়। তারপর একদিন বারাসপুর ষ্টেশন হতে নৌকাভরে কলকাতা প্রবাসী চাকুরে ছেলেরা বাড়ীতে এসে ওঠে। কি সুন্দর চেহারা, কেমন চমৎকার তাদের পোষাক-আশাক। ধুমধাম করে পূজো আরম্ভ হয়। কলাবৌ স্নান, ধুপ-ধুনোর গন্ধ, নূতন কাপড়ের গন্ধ, পাঁঠার ম্যা ম্যা ডাক, ঢাক্-ঢোল, কাঁসি-ঘন্টার আওয়াজ, সমস্ত কিছু এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে।

রাস্তায় রাস্তায় একলা ঘোরে আর মনে মনে অব্যক্ত একটী প্রার্থনা আসে, 'হে মা দুর্গা, আর একটিবার দেশে নিয়ে চল না।' পারুলবালার মনও দেশের জন্য ছটফট্ করে। উঠোনটায় না জানি কত জঙ্গল গজিয়েছে, ঘরখানির কি অবস্থা? আচ্ছা জল এবার কতদূর উঠল, কে জানে। লক্ষ্মীর কতদিন বিয়ে হয়েছে, ছেলেপুলে হল কিনা। একবার দেশে গিয়ে ঘুরে এলে হত না। মতিলালের মৃত্যুর পর সেই যে আসা আর তো যাওয়া হয়নি। আরও কয়েক মাস কেটে যায়, ইংরেজী নতুন বছর আসে।

সেদিনটা ছিল ফাল্গুনের শেষ। বসন্তের এক অপরাহ্ন। রাধাকান্তপুর-আবাদ রায়দিঘী হতে অনেক দূর। একটা তদন্ত সেরে মণি নদীর বাঁধ ধরে সে আসছিল। রায়দিঘীর কাছে আসতে দেখা যায় দূরে জটারদেউল। কবে কোন সময় তৈরী হয়েছে কে জানে। তবে সে শুনেছে এই সুন্দরবন এককালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। তখনকার দিনে প্রতাপাদিত্যের অধীনে নাকি এ সব ছিল। রায়দিঘীতে যে একশো বিঘের দিঘীটা আছে সেটা হয়তো তাঁরই তৈরী। আজ অনেকটা শ্যাওলায় ভরে গেছে কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকুর জল পরিষ্কার টলটলে। প্রতাপের পতনের পর যখন রাজশক্তি শিথিল হয়ে এসেছে, তখন আসে দুর্দ্দান্ত হার্মাদরা। রাজশক্তি তাদের রুখ্‌তে পারেনি। প্রজাদের কেউ প্রাণ দিল তাদের অস্ত্রাঘাতে, কেউ পালিয়ে বাঁচল। মেয়েদের লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল। কালক্রমে পরিত্যক্ত গ্রামগুলি,বনজঙ্গলে পরিণত হয়ে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত সুন্দর-বন নামে বিভীষিকার সৃষ্টি হল। এখনও তো সেখানে বাঘ, সাপ, হরিণ প্রভৃতির আড্ডা। এককালে নাকি এখানে গণ্ডারও মিলত।

'গণ্ডার-গদী' গ্রামের নাম হতে একথা মনে আসে। পিয়ারী রায় দিঘী ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হয়।

অফিসে রিপোর্ট অবনীবাবুকে দিয়ে সে বসন্তবাবুকে বলে যে তার এক মাস ছুটি চাই, একবার দেশে ঘুরে আসতে হবে। বসন্তবাবু সাহেবকে বলেন। সাহেব বল্লেন, "এখন ছুটি নিতে গেলেই মাইনের গোল হবে, তার চেয়ে দরখাস্ত রেখে এস না। কাজও তো প্রায় ঘুরে শেষ। এরপর কোথায় যাব কে জানে।"

পিয়ারীর ভারি আনন্দ হয়। একে তো দেশে যাবার আনন্দ, তারপব এমনি মুফতে ছুটি। পারলে সে এখনই ছুটে মাকে খবর দেয়। আবাব যেন মনটায় একটু বিষন্নতার ছোঁয়া লাগে। পরমুহূর্তে মনে হয়, সেতো ফিরেই আসছে।

বসন্তবাবু বলেন, 'পিয়ারী, তোমার ভাগের কতগুলি তেলে ভাজা ওখানে আছে, খেয়ে নাও। কৈ, মণীন্দ্র চা তৈরী কর।'

* * * *

বিদায়ের দিন আসে। সম্পত্তি তো কিছুই নেই, যা ছিল তাই বেঁধেছেঁদে নেয়। প্রদ্যুম্নবাবু গরুর গাড়ী ঠিক করে দেন। গাড়ী গিয়ে মথুরাপুর স্টেশনে তাদের তুলে দেবে। রাত্রেই ঢাকা মেল, পরী সমস্ত রাত কাল কেঁদেছে, মুখ চোখ তার ফোলা। পারুলবালারও মন ভার, সেও চোখের জল মোছে বার বার। গাড়ীতে উঠবার আগে পরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, "এ সময় সাবধানে থেক, বেশী দৌড়ঝাঁপ করনা। আমি তো এই একমাস পরেই আসব।"

পরী মুখে কাপড় গুঁজে উদ্গত অশ্রু দমন করে। পিয়ারীরও মনটা খারাপ, তবে দেশে যাবার আনন্দে সে বিভোর, তাছাড়া সে তো ফিরে আসবেই।

প্রদ্যুম্নবাবু সকালেই দোকানে চলে গেছেন। গাড়োয়ান এসে গরু জুতে গাড়ী ছেড়ে দিল। পিয়ারী পরীকে বলে, "আবার একমাস পরে আসব, চললাম, কেমন।" মূর্খ আমিন জানেনা, ফিরে আসব বললেই ফেরা যায় না। তেমনি যাব বললেই কোন স্থানে যাওয়া চলে না। এক অদৃশ্য আকর্ষণ বলে কোন স্থানের ধুলোমাটি জল, বাতাস, আমাদের

টানে বলেই তো আমরা সেখানে যেতে পারি। না হলে কি সাধ্য আছে আমাদের সেখানে যাবার। যে অজানা গ্রাম্য রেল স্টেশনে হঠাৎ গাড়ী আমাদের নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়, সেখানে কোনদিন কল্পনা ছিল কি আসবার ?

সেখানকার লোকের সঙ্গে প্রেম, নদীর সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, বৃক্ষের সঙ্গে নিবিড়তা, কে জানে কোন গ্রহান্তরের বা জন্মান্তরের কর্মফল কি না ? দুদিন আগে যারা ছিল নেহাৎ অপরিচিত, দুদিন পরে তারাই হয় আত্মার আত্মীয়। কিন্তু যেদিন তুমি বিদায় নিলে, তাদের দৃষ্টির আড়াল হলে, সেদিন থেকেই সুরু হল বিস্মরণের বেলা। তখন তুমি সেখানে ক্ষীয়মান স্মৃতি মাত্র। আজ এদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, আত্মীয়তা, মাটির সঙ্গে সখ্যতা তার কপালে ছিল বলেই তো সে এখানে এসেছে। নৃপেনবাবু, মুকুন্দবাবু, চার্জ অফিসার তো উপলক্ষ মাত্র।

গরুর গাড়ীটা কোম্পানীর টেকের বাঁকে এসে উপস্থিত হল, তখনও পরীর অস্পষ্ট মূর্তিটা চোখে পড়ে, তার পর গাড়ী বাঁক ঘুরতেই গাছপালার আড়ালে সে ঢাকা পড়ে, হারিয়ে যায়।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

ঘুম হতে উঠে পিয়ারীলাল অবাক হয়ে যায়। তাইতো, সে আর রায়দিঘীতে নেই, সে এখন নারানপুরে। ঘুমের মাঝে মনে হয়েছে সে বুঝি রায়দিঘীতে, প্রদ্যুম্ন মণ্ডলের বাড়ীতে ঘুমুচ্ছে। বাইরে এসে একটা আঁশশ্যাওড়ার দাঁতন ভেঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। রাস্তার পাশের হিজল গাছ, আম গাছের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে রাস্তায় পড়েছে। পিয়ারী অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুরু করে কালিবাড়ীর দিকে। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার হাট বসে। বর্ষায় হাটের শেষপ্রান্ত নৌকোয় নৌকোয় একাকার। কত মাছ, তরকারি, আঁখ, কাপড়, গেঞ্জি, তেল, নুন, চাল প্রভৃতি হাটে আসে, তার শেষ নেই। এখানকার কালী জাগ্রত, শোনা যায় পাঁচ জাতের পাঁচটি নরমুণ্ডের উপর এই বিগ্রহ স্থাপিত।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাটের দিনে এখানে পয়সা বাতাসা দিয়ে যায়। সামনের একটী জিকে গাছের নীচে রাশিকৃত চুল জড়ো হয়ে আছে। শিশুর প্রথম জন্মের চুল এখানে ফেলে লোকে পূজো দিয়ে যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় একটি টিউবওয়েল করে দিয়েছেন, পিয়ারী সেই টিউবওয়েলে মুখ ধুয়ে মা কালীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। হাটের পুব প্রান্তে শ্মশান, সেখানে গিয়ে বটগাছের নীচে কিছুক্ষণ বসে। এখানেই তার মা-বাবার দেহকে দাহ করা হয়েছে। একবার মনে হয়, সামনের ঐ যে ঝোপ, যেখানে শিশু দেহের কবর দেওয়া হয়, সেখান হতে একবার যদি মা, বাবা, এসে উঁকি দেন তাহলে, সে একবার তাদের প্রণাম করে নেয়। উঃ, কতদিন সে মা বাবাকে দেখে না। দুচোখে জল নামে। মাঠের মধ্যে দিয়ে কে যেন আসছে এদিকে, পিয়ারী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে পড়ে।

বাড়ী আসতে মা অনুযোগ করে, "সাতসকালে উঠে কোথায় গেছিলি, যা সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আয়। আর শোন, সতীশমামার কাছে আমার বাচনিক একখানা পত্র লিখে দে, একবার যেন এসে দেখা করে যান।' পিয়ারী বেরিয়ে প্রথমে জ্ঞানদা চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে। নমস্কার করতে তিনি "জয়োঽস্তু" বলে আশীর্বাদ করলেন। চক্রবর্তী গিন্নি মুড়ি ঝোলাগুড় দিয়ে গেলেন। পিয়ারী বারান্দায় উঠে একটা বেঞ্চে বসে মুড়ি গুড় খায়। লক্ষ্মীর কথা ওঠে। তার বর এখন বারাসতে সার্কেল অফিসার, গত বছর লক্ষ্মীর একটী ছেলে হয়েছে। সেখান হতে পোষ্ট অফিসে আসতেই পোষ্টমাষ্টার অমূল্য মুখার্জি, কেনারাম, বসন্ত কর সকলে কলরব করে ওঠে। পোষ্ট অফিসে তখন ডাক বাঁধা চলছে। একজন নমঃসূদ্র চাষী কুইনিন্ কিনছে।

সকলে তাকে বার্তা জিজ্ঞেস করে। নিমাই গ্রামের বৃদ্ধদের সম্পর্কে একটা ছড়া বাঁধছিল, লেখা হলে পড়ল,

"শুন শুন বন্ধুগণ, আজ করি নিবেদন,
নারাণপুরের বুড়োদের কথা করি যে বর্ণন।
শরীর নাই, দেহ নাই, জ্ঞানদা ফুলায় ছাতি,
খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, মোহিনী হল হাতি

বোঝা বয় না, বিড়া বয় না, মনিরায় মাথায় টাক্,
যত কুযুক্তির জন্ম দেয়, বসন্ত করের বাপ্।
খাম্ নাই পোষ্টকার্ড নাই, পোষ্ট অফিস খোলা,
প্রজাদের ধান ঠকাইয়া, মজুমদার ভরে গোলা।
সুদেব টাকা খেয়ে মানুষ হরিহরের বাপ্
ইউনিয়ন বোর্ডের টাকায় দেখায় চক্রবর্তী দাপ্।
তাল নাই, মান নাই, সতীশ বাজায় ঢাক,
পাঁচুগোপাল মণ্ডপী প্রসাদ করে ফাঁক্।
মজুমদারের দুর্গা যায়না সিঙ্গিমারার বিলে,
মুণ্ড খুইলা পড়ে তার কাইজা হবার কালে।
মতিলালের বেটা আমিন, দেশবিদেশ মাপে,
তার বাড়ীর সীমা ভাঙ্গে, ক্ষুদীরামের বাপে।
নারায়ণপুরের বুড়াগুলির দুই দুইটা বিয়া,
জয়ধ্বনি দাও তোমরা, হুলু লুলু দিয়া।"

সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। তখনই কয়েকখানা নকল হয়ে গেল। পিয়ারীতো অবাক, বেশতো ছড়া বাঁধে নিমাইটা। অমূল্য মাষ্টার তাকে ধরে বসে, গ্রামের থিয়েটার হবে, চন্দ্রগুপ্ত, তাকে একটা পার্ট নিতে হবে। পিয়ারী কোনদিন পার্টই করেনি।

"আমার ছুটিমাত্র একমাস, কি করে হবে।"

কেনারাম বলে, "তাতেই হবে, তুমি আজ দুপুরে সেনেদের দালানে রিহের্সাল দিয়ে যেও।" পিয়ারীর কান লাল হয়ে ওঠে, অনেক কষ্টে সে মুক্তি পায়। তবে রিহের্সাল দেখতে আসতে হবে। পিয়ারী সতীশ-দাদুকে একখানা চিঠি লিখে বিদায় নেয়।

ফেরবার পথে গ্রামের দিকে তাকিয়ে মনটা বিষন্ন হয়। সে অনেক গ্রাম ঘুরেছে, নিজের গ্রামের সঙ্গে সে সব গ্রামের তুলনা করে। নারানপুর কত শ্রীহীন। একটি ভাল পুকুর নেই, সবগুলি কচুরিপানায় ভর্ত্তি। ভাল রাস্তা নেই। বটতলার মাঠ ছাড়া একটি খেলার মাঠ পর্যন্ত নেই। এতগুলি বড় বড় লোক আছে, রায় বাড়ী, মজুমদার বাড়ী, সেন বাড়ী, চক্রবর্তী বাড়ী অথচ একটি হাই স্কুল হল না। গ্রামের কথা কেউ ভাবে না। ভাবতে ভাবতে পৌঁছে যায়।

দুপুরে খাবার পর পাশে শুয়ে এক ঘুম। রিহের্সালে যাবার কথা একদম ভুলে গেছে। উঠে ঘাটে মুখ ধুয়ে আসে। মা'র কাছে শোনে তার আর বনোর বিকেলে রাধুদের বাড়ীতে পায়েস খাবার নেমন্তন্ন। দুপুরে এসে রাধু বলে গেছে। পিয়ারীর মনে পড়ে অনেক দিন আগের দেখা রাধুকে। বিকেলে তাদের বাড়ীতে যেতে, পাঁচুগোপাল দাস অভ্যর্থনা করে, "এস বাবা এস। কেমন আছ?" পিয়ারী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। রাধু ঘাটে গিয়েছিল, এসে ধীরেসুস্থে পিয়ারীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পিয়ারী কোনমতে লজ্জাবনত মুখে একবার তাকায়। রাধু কি সুন্দর যে হয়েছে দেখতে। সেই ক্ষ্যাপা মেয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। বনো দাদার কাছে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে। রাধু জোর করে তাকে কোলে নিয়ে নাম জিজ্ঞেস করে। রাধু দুখানা যায়গা করে, দুগ্লাস জল দিয়ে কাঁসার বাটিতে দুবাটি পায়েস, দুথালাতে কিছু মুড়িরাখে। বনো খেতে পারছিল না। রাধু তাকে খাওয়াতে বসে। পিয়ারী ছোটবেলা হতে রাধুকে দেখেছে, কিন্তু আজ এই মনোময়ী নবযৌবনার সামনে যেন সে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। অনেক মেয়ে সে দেখেছে, পরী, লক্ষীদি, শহরে কত মেয়ে সে দেখল, কিন্তু এমন চোখের দৃষ্টি, নিটোল স্বাস্থ্য, সুডৌল হাত স্নিগ্ধ-শ্যামল চেহারা আর কখনও যেন চোখে পড়ে-নি। এই কি সেই রাধু? আশ্চর্য পরিবর্তন তো। খাওয়া হলে, হাত মুখ ধুয়ে সে আবার পাঁচুগোপালের কাছে এসে বসে। পাঁচুগোপাল হুঁকো খেতে খেতে বলে সুখ দুঃখের কথা। আর কত দিনই বা জীবন। মেয়েটির একটা পাত্র ঠিক হয়েছে, এই চৈত্রের শেষেই বিয়ে। ছেলেটী মন্দ নয়, মুদির দোকান আছে। আর বেশী দেরী নেই, পিয়ারী যেন একটু খেটে দিয়ে যায়। মতিলাল জীবিত থাকলে তো কোন চিন্তাই ছিল না। পিয়ারীর ঈর্ষা হয় সেই না দেখা ছেলের ভাগ্যকে। অনেক প্রশ্ন তার মনে আসে যেগুলি এতদিন আমল দেয়নি সে। রাধুর মা আর তার মা নাকি সই ছিলেন। তাঁরা নাকি আলাপ করতেন, যে যখন ছেলে-মেয়ে বড় হবে—।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বনোর খাওয়া হলে, রাধু তার মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দেয়। তারপর তাদের আমবাগান পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়। রাধু বেশ সপ্রতিভ, সে কিন্তু

রাধুর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারে না। কিছুদূর এসে পেছন ফিরে তাকায়, দেখে রাধু দাঁড়িয়ে আছে, সে লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে।

মাঝে একটা সপ্তাহ চলে গেছে। মঙ্গলবারের হাটে সে গেছে, কিছু চাল, তরকারি, মাছ কিনতে। কেনাকাটা প্রায় শেষ, এমনি সময় গহর মিঞা খবর দিল, "তোমাকে এক ভদ্রলোক খুঁজছেন গো।" পিয়ারী অবাক হয়, তাকে কে খুঁজবে। কালিবাড়ীর দালানে এসে দেখে সতীশদাছ। স্ফূর্তিতে সে প্রণাম করতেই ভুলে গেছিল, মনে পড়তে প্রণাম করে। পিয়ারী বলে, "দাছ, তোমার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেছে।" দাছ হাসেন, "বয়েস কি কম হল রে।" ছুজনে একসঙ্গে বাড়ী ফেরে। পারুলবালা ঘাটে যাচ্ছিল, মামাকে দেখে সে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে, হাতের ঘটিটা আছড়ে মাটিতে ফেলল। "মামাগো, সে যদি বেঁচে থাকত, আজ কত খুশি হত সে···।' সতীশবাবু কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মোছেন। পিয়ারীরও চোখের কোল ভিজে ওঠে।

বিশ্রামের পর চা খেতে খেতে সতীশবাবু সকল তত্ত্ব নেন। মামা-ভাগ্নীতে কতদিন পরে দেখা। সতীশবাবু অনুযোগ করেন, পিয়ারী তো একখানা চিঠিও দিতে পারে।

পিয়ারী দেখে মামা-ভাগ্নী ছুজনে অতীতের স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত। বনো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে চুপ করে বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়ল। রাতে ক্ষুদিরামের বাড়ী এসে দেখে সে রিহের্সালে চলে গেছে। তাকে দেখে মায়া, একগলা ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে চলে গেল। বৃহস্পতিবার থিয়েটার। সেনেদের দালানে ডেলাইট জ্বেলে মহাউৎসাহে মহড়া চলছে, ছুচারজন হাট ফেরৎ যাত্রী ধামা মাটিতে নামিয়ে ভীড় করে শুনছে। সে যখন গেছে, তখন চাণক্য ধেই ধেই করে নাচছে, বলছে, 'কাত্যায়ন, ক্যাতায়ন, এ তো সেই মুখ, সেই চোখ, না—না—না·· ······।" প্রম্পটার হারাণবাবু রেগে বলে, "অতো লাফিওনা কেনা, সব মাটি হবে।" কেনা চটে উঠে বলে, "লাফাবনা, আলবৎ লাফাব। লাফ দেবার পার্ট। আমি লাফ দেবনা কি মুরা লাফ দেবে ? এ্যা" । হারাণবাবু মনমরা হয়ে বললেন, "তাহলে তোমরা মুরাকে নিয়ে লাফই দাও, আমি চলি।" সে সত্যিই

বই রেখে ওঠে। ব্যাপার দেখে হাটের লোকগুলো কেটে পড়ে। অমূল্যবাবু, বসন্ত, ক্ষুদি সকলে মিলে, তখন তাকে সাধ্য-সাধনা। কেনাটা একটা পাগল, ওর কথায় কিছু মনে করতে আছে ? হারাণবাবুর রাগ পড়ে যায়, তিনি আবার বই নিয়ে বলেন, "এবার পার্ট থাক্, ঐ গানটা হোক।"

"ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী
গর্জে সিন্ধু, বহিছে তরণী।
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠমা ওঠমা দেখমা চাহি,
এইতো এসেছি আর চিন্তা নাহি।"

হার্মোনিয়াম, তবলা নিয়ে গানটার কোরাস মহড়া হল। বাড়ী ফিরতে রাত প্রায় দশটা। সতীশমামা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মা বলে, 'এত রাত হল যে ? কেবল গল্প।' পিয়ারী কোনমতে খেয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন ভোরে উঠে শোনে, মা সতীশদাদুর সঙ্গে তার বিয়ের কথা আলোচনা করছেন। পারুলবালা বলে, "বিয়ে দিয়ে বৌকে কাছে রাখব, পিয়ারী যেখানে সেখানে বদলী হয়। আমি আর ঘুরতে পারব না, বাকী দিন কটা স্বামীর ভিটেতে কাটিয়ে দেব।" সতীশমামা বলে, 'সেটা মন্দ কথা নয়। তোকে এমন বিয়ে দিলাম, কিন্তু মতি মোটে আয়ুই পেল না। নইলে দেখতিস তোকে কেমন সুখে রাখত।" পারুলবালা ঘন ঘন চোখ মোছে। সতীশবাবু বলেন, "আমাদের এক আত্মীয় আছে, ভদ্রলোকের নাম বিপিন ঘোষ। তার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, শুনেছি, মেয়েটি নাকি দেখতে ভাল, ঘরের কাজেও নিপুণ। ভাগ্নী বলে, "তাহলে তুমি একবার যাও, দেখে এস। আমার ইচ্ছে, পিয়ারীকে এই ছুটির মধ্যেই বিয়ে দিই। সতীশবাবু ভাগ্নীর আগ্রহে হাসতে থাকেন। 'অত শীঘ্র কি হয়, কথায় বলে লাখ কথায় বিয়ে হয়।'

বেলা বেড়ে যায় দেখে পারুলবালা রাঁধতে গেল। পিয়ারী আবার পাড়া ঘুরতে যায়। পারুলবালার ভারি আনন্দ, অনেক দিন পরে, মামাকে সে রেঁধে খাওয়াতে পারবে। গতকাল হাটের জিয়ল মাছ প্রায়

সবগুলোই কুটে নেয়। দেশগাঁ, পয়সা হলেই সব পাওয়া যায় না। রান্না শেষ হল প্রায় তখন বারোটা। পিয়ারী ফিরে এসে সতীশবাবুকে তালপুকুর হতে স্নান করিয়ে নিয়ে এল। সঙ্গে বনোও গেল।

দুপুরে খাওয়া মন্দ হল না। সরুচালের ভাত, সুক্তো, কই মাছ ভাজা, ডাল, সিঙ্গিমাছের ঝোল, দুধের সঙ্গে পাটালি গুড়। সতীশবাবু পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। মামার কল্যাণে দুভাই এর খাওয়া বেশ হল। পিয়ারীও মাকে এত যত্নের সঙ্গে এমন সুন্দর রান্না অনেক দিন করতে দেখেনি। সতীশবাবু খাওয়ার পর বিশ্রাম করতে গেলে পারুল-বালা ঘটি নিয়ে পুকুরে স্নান করতে গেল।

পূর্ববাংলার এক অপবাহ্ন। চৈত্রের রৌদ্র এসে পড়ছে। গাছের ডালে ডালে ফিঙে, চড়াই, কাক, শালিক ডাকছে। দূরে কালিবাড়ীর দিকে এক চিলতে সবুজ দিগন্ত চোখে পড়ে। গ্রামের ধুলিময় রাস্তা নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে ঘুঘুর ডাক শোনা যায়। শান্ত পূর্ববাংলার এক অপরূপ ছবি। পারুলবালা স্নানেব আগে চুপ কবে পৈঠার উপর কিছুক্ষণ বসে থাকে। কি ভাবনা তাকে উদাস করে তোলে তা সেই জানে।

বৃহস্পতিবার থিয়েটার। সারাদিন গেল ষ্টেজ বাঁধতে। পিয়ারীও ছাড়া পায়নি। ষ্টেজ্ ট্যাংরাখোলা হতে ভাড়া করে আনা হয়েছে। সেনেদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে ষ্টেজ বাঁধা হল। গর্ত খুঁড়ে বাঁশ পোতা, মাচা-বাঁধা, স্ক্রীন্ টানানো ; একটা থিয়েটার করা সহজ পরিশ্রম নয়। সমস্ত শেষ হতে বেলা দুটো। পিয়ারী বাড়ী ফিরে স্নান করে কোন মতে দুটি মুখে দিয়ে আবার ছুটল। মাকে বলে যায় যেন সে মামাকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। সতীশ মামা বললেন, 'আমি আর যাব না, পারুলই দেখে আয়।'

সন্ধ্যায় লোকে লোকারণ্য। মেয়েদেব স্থান হয়েছে সেনেদের ঠাকুর দালানে। দুটো কার্বাইড লাইট দিয়ে ফুট্ লাইট করা হয়েছে, ভেতরে দুটো ডেলাইট সমানে জ্বলছে। ষ্টেজের ভিতরে সাজ সাজ রব। ড্রেসার মুরাকে পরচুলো লাগাচ্ছে, আর একজন সেকেন্দারের মুখে পাউডার ঘসছে। পিয়ারী একটা চেয়ারে বসে সব দেখছে। ভারি ভাল লাগছিল তার। কতক্ষণ বসেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ পেছন থেকে রূঢ় গলার

আওয়াজ আসে, 'এই ওঠো, এ চেয়ারে বসেছ কেন?" ফিরে দেখে ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বিশ্বনাথবাবু। তিনি এই থিয়েটারে দশটাকা চাঁদা দিয়েছেন, সে জন্য তিনি ভেতরে বসে থিয়েটার দেখবেন। পিয়ারী তার চেয়ারেই বসেছিল। খেয়াল ছিল না। অপমানে লজ্জায় কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকে, কেউ দেখেনি তো? তাড়াতাড়ি বাইরে এসে সে দর্শকদের পেছনে এসে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পরে হুইস্‌ল পড়ে, সামনের কালো স্ক্রীন্ উঠতেই দেখা যায় সেলুকস্ আর সেকেন্দার কে। অমূল্য মুখার্জী আর বসন্তকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে জড়ির পোষাকে। সে একবার মেয়েদের বসবার জায়গার দিকে তাকায়, কে কে এসেছে? রাধু আসেনি?

দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন, বিতাড়িত অসহায় রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্তের কি তেজ! ও কে, এ্যাঁ কেনা, চানক্য সেজেছে। বাব্বাঃ চেনাই যাচ্ছে না। বাঃ হেলেন, মরি মরি, কেমন সেজেছে, ঠিক যেন গদাধর বৈরাগীর বৌ। কিন্তু অমন গোঁফটা কেটে ফেলল, ক্ষুদিরাম। বেশ লাগছিল। এ্যান্টিগণশা ছোকরা বড্ড রগচটা। বোনটাকে বিয়ে করতে চাইলি? ····ক্ল্যাপ, ক্ল্যাপ, হাততালি পড়ল চটপট চট্‌পট্।

থিয়েটার শেষ হবার একটু আগে, পেছনে জামায় টান অনুভব করে, পেছন ফিরে দেখে বনো। বলে, 'মা ডাকছে।' আর থিয়েটার দেখা হয় না, ফাঁকায় এসে দেখে বেলগাছের নীচে মা দাঁড়িয়ে, পেছনে রাধু। মা বলেন, 'অনেক রাত হল, এবার চল।'

নিজের বাড়ীর কাছাকাছি এসে মা বলে "তুই ওকে এগিয়ে দে, আমি এটুকু যেতে পারব।' মা বনোকে নিয়ে বাড়ী চলে যায়।

যেতে হবে চক্রবর্তীদের বাড়ীর পুকুর পাড় দিয়ে একটা বাঁশঝাড়, আশশ্যাওড়ার গাছ পেরিয়ে। রাতের বেলা জায়গাটার একটু তুর্নাম আছে। বর্ষায় পাশের কচুরিভর্তি পুকুর হতে কৈ মাছ ওঠে। অনেকে নাকি ঐখানে গভীর রাত্রে মুণ্ডহীন, বুকের ওপর তুই চোখ নিষকণ্ঠে দেখেছে। সে বড় ভয়ানক। বর্ষার রাতে মাছ কুড়োতে এসে খালুই রেখে বৈকুণ্ঠ মুচি মাছ কুড়োচ্ছিল। দেখে কে একজন উবু হয়ে খালুই থেকে মাছ নিচ্ছে। কেউ মাছ চুরি করছে ভেবে সে বলে, 'কে রে, দাঁড়াতো।"

লোকটা ফিরে দাঁড়াতে দেখে, এক ভয়ানক চেহারার মুণ্ডহীন নিষকণ্ঠে। বুকের ওপর মুখ দিয়ে কাঁচা কৈ মাছ চিবিয়ে খাচ্ছে, আর বুকের ওপর কাঁচা টাটকা লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বুকের দুপাশে দুটো বড় বড় লাল চোখ। বৈকুণ্ঠ মুচি ভয়ে চিৎকার করে বাড়ীর দিকে ছুটতে থাকে। বাড়ী এসে দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর সাতদিন পরে মারা যায়। এ অবশ্য অনেক দিনের কথা, কিন্তু গ্রামের সবাই জানে সে কাহিনী। সেইজন্য বেশী রাতে একা কেউ এদিকটা দিয়ে যায় না।

পিয়ারী বাইরে ঘুরে একটু চটপটে হয়ে উঠেছে।বলে, "চলুন, কোন ভয় নেই।" রাধু বলে, "আমি কত ছোট, আমাকে কেন আপনি বলছেন পিয়ারীদা?" পিয়ারী লজ্জা পায়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত, প্রায় দুটো বাজে, আকাশে ক্ষীণ চাঁদ। ঐটুকু আলোতে যা পথ দেখা চলে। ঝোঁপটার কাছে আসতেই একটা কি সরসর করে শব্দ হয়। রাধু পিয়ারীর কাছ ঘেঁসে আসে। পিয়ারীরও গা ছম্‌ছম্ করছিল, সে রাধুর এতখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে ঐ জায়গাটা পার করে দিল। বাইরে এসে রাধু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, কাপড় চোপড় ঠিক করে পথ চলতে সুরু করল। বাড়ী এসে গেল। পিয়ারী বলে, "রাধু, সামনের পঁচিশে তোমার বিয়ে। আমার নেমন্তন্ন হবে তো?"

রাধু কোন কথা বলে না, মাথা নীচু করে হেঁটে চলেছে। একটা গাছের আড়াল কেটে যেতেই আঁধার একটু হালকা হয়। পিয়ারী দেখে রাধুর চোখে জল চিক্ চিক্ করছে। পিয়ারী হাত বাড়িয়ে জল স্পর্শ করতে যাবামাত্রই, রাধু এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়।

* * * *

ছুটির দিনগুলি যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসে। আর মাত্র কটা দিন বা বাকী ছুটি শেষ হবার। রায়দিঘীর চিঠি এল, পিয়ারীলাল মেদিনীপুর খাস মহল সেট্‌লমেন্টে বদলী হয়েছে। তাকে গিয়ে কাঁথিতে যোগদান করতে হবে। বসন্তবাবু অর্ডারটা পাঠিয়ে দিয়েছেন, এবং একটা রিলিজ-অর্ডারও পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা তার অসীম দয়া। রায়দিঘী আর যেতে

হচ্ছে না। পারুলবালা বলে, "আমি আর যাবনা, এবার তুই একা যা। আমি ক'দিন দেশে থাকি।''

পিয়ারীর প্রথম চাকুরী ২৪ পরগনায়, খুলনায় বাবার সঙ্গে যেটুকু অভিজ্ঞতা। কাঁথি কেমন স্থান জানা নেই। খুব অসহায় বোধ করে। মা ছেলের মুখ দেখে বোঝে ছেলের মনের কথা। মারও কষ্ট হয়, আহা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশু তো। সে আর কতটুকু স্নেহ দিতে পারে। তবু পারুলবালা বোঝায়, এখন ভাল করে কাজ করলে পরে উন্নতি হবে। আমিন জীবন, এইতো কাজের সময়। সতীশবাবুও উপদেশ দেন। পরদিন সতীশবাবু ঘুলালী যান মেয়ে দেখতে। পাঁচুগোপাল, ক্ষুদিকে দিয়ে পিয়ারীকে ডেকে পাঠায়। কালই তো রাধুর বিয়ে। পাতাকাটা, তরকারি কোটা, পায়েসের চাল বাছা, গুড় কিনে আনা, খাসি ঠিক করা, সামিয়ানা টাঙানো, উনুন তৈরী করা, কত কাজ আজ। কাল আর সময়ই পাওয়া যাবে না।

সমস্ত দিন রাধুর দেখা পাওয়া যায় না। বাড়ীতে বহুলোক, মেয়েছেলে গিজ্ গিজ্ করে। পাঁচুগোপাল একটা চেয়ারে বসে হুঁকো হাতে হুকুম করছে, কাঠ ফাঁড়, তুমি টেংরাখোলার হাটে যাও, পান সুপারী তামাক আন। আরে মজুমদার বাড়ীতে গিয়ে রামদা'টা আন তো, ইত্যাদি।

তখনকার দিনে বিয়েবাড়ীতে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে লুচির রেওয়াজ ছিল না। ভাত, ডাল, শুক্তো, মাছ, মাংস, টক, পায়েস রান্না হত। আজ সমস্ত দিন আগামী কালের মহড়া চলল।

পরদিন আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হয়। সমস্তদিন রান্না চলে। চারটে পাঁঠা কাটা হল। সকালে পুকুরে জাল ফেলে কুড়িটা রুই কাতলা তোলা হল। পদ হল ভাত, সুক্তো, কাঁচাকলা ভাজা, মাছের মুড়ো দিয়ে মুগ ডাল, আলুমাছের কালিয়া, মাংস, চাটনি, গুড়ের লাল পায়েস, সবশেষে খিলি পান।

বর আসবে গোপালগঞ্জ হতে। মেয়ের গায়েহলুদ শেষ। এমন কি দুটোর মধ্যে রান্নাবান্না পর্যন্ত শেষ। বিয়ের লগ্ন রাত একটায়। পাঁচু-গোপাল বলে, সব তৈরী, এবার আসুক দেখি কত বরযাত্রী আনবে। গ্রামের সব যুবক, পরিবেশনের জন্য কোমরে গামছা বেঁধে তৈরী। বরযাত্রী

অভ্যর্থনার জন্য জ্ঞানদাবাবু তৈরী হলেন। ক্ষুদিরামের বাবা রইল বিয়ের কাজকর্ম দেখবার জন্য। পাঁচুগোপাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েরা তিনটে নাগাদ সাজাতে বসল রাধুকে।

কিন্তু অদৃষ্ট দেবতা হয়তো পেছন হতে হাসছিলেন। সন্ধ্যার একটু আগেই জমাট একখানা কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড়। একটা দমকা বাতাস এসে সামিয়ানার কোণগুলি পটপট করে ছিঁড়ে কোথায় নিয়ে গেল কে জানে। যেখানে রান্না হচ্ছিল তাকে আড়াল করা বেড়াখানি ধরে বাতাস টানাটানি স্বুরু করল। চারদিকে সামাল সামাল রব। বাইরে হতে ধূলোবালি এসে ঝড়ের বেগে রান্নাগুলির মধ্যে মিশে বালির ঘণ্ট হয়ে গেল। এরপর নামল, আঙ্গুলের মত বড়বড় বৃষ্টির ফোঁটা। উঠোনের আমগাছটার একটা ডাল হঠাৎ মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল একরাশ আমের গুটি নিয়ে।

মনে হল একটা ক্রুদ্ধ দৈত্য এসে সমস্ত বিবাহ সভা লণ্ডভণ্ড করতে চাইছে, আর হুঙ্কার করছে। পালা, পালা, কে কোথায় পালালো ঠিক নেই। কেউ কেউ ঘরে ঢুকে আত্মরক্ষা করল। খাবার দাবার আর রক্ষা করা গেল না। জলবালি মিশে সমস্ত নষ্ট হল। পাঁচুগোপাল হায়-হায় করল। পিয়ারী আর কোন কথা না বলে নিজের বাড়ীর দিকে ছোটে। তাদের ঘর এতক্ষণ আছে কিনা, কে জানে। আচ্ছা বাদলা মেয়ে তো রাধুটা। দাত্থ ফিরলেন কিনা ত্থলালী হতে।

অতি কষ্টে বাড়ী এসে দেখে সতীশদাত্থ ঝড়েব আগেই এসেছেন। যে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন তার সম্পর্কেই আলোচনা চলছিল। মামা বলে, " না রে, মেয়ে তেমন স্থবিধের নয়, যেমনি কালো, তেমনি মোটা। আমি তো প্রথমে মেয়ের মা বলেই ভেবেছি।" ত্থজনেই হাসতে থাকে।

হঠাৎ সতীশবাবু সোজা হয়ে বসেন, বলেন, "তবে হ্যাঁ, খাইয়েছে বটে বিপিনবাবু। এই গাওয়া ঘির লুচী, বেগুনভাজা, মাংস, দই, মিষ্টি। আজ ত্থপুরে ভাত, ডাল, ভাজা, ডুমুরের তরকারী, মাছেব ঝোল, মাংস, টক, পায়েস। এমনি খাওয়া অনেক দিন খাইনি রে। হেঁটে আসতে আসতে ত্থবার আড়ালে বসতে হয়েছে। ত্থাখ্ আনবি নাকি মেয়েটিকে; খাইয়ে বাপের মেয়ে।" মামা হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকেন। পারুলবালা ফোঁস

করে ওঠে, "তোমরা তো খেয়েই খালাস, এরপর মেয়ে সেপাইয়ের মতন এসে আমাকে খাবে যে।" মামা, একটু দমে গিয়ে, "বলেন তা বটে।"

পিয়ারী কাপড়চোপড় ছেড়ে এসে বসে। ইঃ এমন নেমন্তন্নটা একেবারে মাঠে মারা গেল। মাংসটার কেমন চমৎকার রং হয়েছিল। হাঃ হাঃ বরযাত্রীদের ওগুলো খাওয়ালে কেমন হত? বাইরে বৃষ্টি ও ঝড় তখন উদ্দাম গতিতে চলছে। ঝড়ের বেগে দরজা ভীষণভাবে কাঁপতে স্বুরু করল। পিয়ারী দরজা ঠেলে ধরে থাকে; হঠাৎ একটা শব্দে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখে, তাদের রান্না ঘরটি পড়ে গেল। পিয়ারী বলে, "মা, রান্না ঘর গেল সঙ্গে পেপে গাছটাও।" পারুলবালা মা কালীকে স্মরণ করে। বনো সতীশবাবুর কোলের মধ্যে। ঘরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে এসে জলে জলাকার।

ঝড়ের হুঙ্কার আরও বেড়ে চলল, সঙ্গে বাতাসের গর্জন। চারদিক অন্ধকার, মনে হয় উনপঞ্চাশ পবন একসাথে এই ঘর খানির পেছনে লেগেছে। এক একটা দমকা আসে আর ঘরখানির পুরানো খুঁটি মচ্ মচ্ করে আর্তনাদ করে ওঠে। সকলেই ভীত পাংশু মুখে বসে রইল, কারও খাওয়া দাওয়ার কথা মনে রইল না। ঘরখানি আজ রাত টেঁকে কি না তাই সন্দেহ।

সতীশবাবু বলেন, "১৩২৬ সনের পরে এমনি ঝড় আর হয়নি। তবু ভাল বর্ষাকাল নয়।"

এর মাঝে বনোকে, পারুলবালা একবাটি দুধ খাইয়ে দিলেন, সতীশবাবু বললেন ক্ষিদে নেই। পিয়ারী খেতেই চাইল না। বাড়ীতে আজ রান্না হয়নি, ও বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল।

রাত্রি বারোটার পরে ঝড় বৃষ্টি আবার বেড়ে ওঠে। তিনবার জ্ঞানদাবাবু চিৎকার করে জানালেন, তাদের বাড়ী চলে আসতে, সে ডাক ঝড়ের বেগে ভাল করে শোনা যায় না। পারুলবালা বলে, "না যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। স্বামীর ভিটে যতক্ষণ আছে, কোথাও যাব না। তিনি রক্ষা করবেন।" সারারাত অশ্রান্ত বৃষ্টি হল, কতগাছ পড়ল কে জানে। বৃষ্টির বেগ একটু কমলে, দরজা ছেড়ে পিয়ারী খাটের ওপর বসল। এতক্ষণ সে দরজা চেপে বসেছিল। ঘরের হ্যারিকেনের আলো তেলের অভাবে

কমে আসছিল, পারুলবালা, একটা শিশি হতে তেল ভরে দিল। হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড করাঘাত, বহু গলার চিৎকার, "দরজা খোল।" দরজা খুলতে দেখা যায় পাঁচুগোপাল আগে পিছনে ক্ষুদিরাম, বসন্ত, কেনা, অমূল্য হারাণবাবু অনেকে। ওরাপিয়ারীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

পাঁচু একেবারে পারুলবালার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। "বাঁচাতেই হবে আমাকে, আমার তো সর্বনাশ হল। রাধুর যে আর বিয়ে হবে না।"

জিভ কেটে, ঘোমটা টেনে পারুলবালা সরে দাঁড়িয়ে বলে, "তা আমি কি করব?" পাঁচু বলে, "পিয়ারীকেই বিয়ে করতে হবে।"

পারুলবালা তখনও ভাল করে বোঝেনি। সতীশবাবু এগিয়ে এসে বলেন, "তা বরের কি হল?" পাঁচুগোপাল উঠে দাঁড়িয়েছে। পেছন হতে একজন বলে, "বর খানায় গড়াচ্ছে।" সতীশবাবু এ রহস্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, "তার মানে?" "মানে? মানে এই," বলে সবাই পিয়ারীকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল। বাইরে তখনও ঝড় বৃষ্টি, তবে সে বেগ আর নেই।

সতীশবাবু বলেন, "জোর করে বিয়ে দেবে নাকি? আমি গোপালগঞ্জে গিয়ে কালই কেস্ করব। ওর বাবার বিয়ে আমি দিয়েছি, ওর বিয়েও আমি দেব।"

পাঁচুগোপাল হাত জোড় করেই আছে। পারুলবালা মামাকে বলে, "আহা মেয়েটি ভাল, তুমি চটছো কেন? তাছাড়া তুমি বিয়ে দিলেই তো হল।"

সতীশমামা বলেন, "ঠিকই তো বলেছিস, তবে চল। মেয়ের নাম কি আপনার?"

পাঁচু গোপাল পরম কৃতার্থ হয়ে বলে, "রাধেশ্বরী।" সতীশবাবু বলেন "বাঃ বেশ নাম। চলুন, চলুন।"

ঘরের মধ্যে বিয়ে হল। এই বিচিত্র বিবাহ দেখবার জন্য বহুলোকের বৃষ্টির মধ্যেই আগমন হল। পুরুতঠাকুর দুহাত একত্র করে কোনমতে কাজ সেরে বিদায় নিলেন। কি আশ্চর্য, আকাশ ফর্সা হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় বৃষ্টি কোথায় গেল। বরকনে বাসরে তোলা হল।

পিয়ারী সমস্ত রাত ঘুমোয়নি, রাধুও তাই। ঘুমে দুজনের চোখ ভেঙ্গে আসছিল, তবুও পিয়ারী রাধুকে অবাক হয়ে দেখছিল ; কি হল ? ভগবান কি তবে অন্তরের প্রার্থনা শোনেন ? রাধু একবার পিয়ারীর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় চোখ বোঁজে। রাধুর একখানা হাত নিজের মধ্যে নিয়ে বলে, "কি গো রাধিকে, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তোমার কি দুঃখ হল ?" রাধু লজ্জায় মুখ লুকোয়।

পিয়ারী আবার রহস্য করে বলে, "কাল যদি বর এসে তোমায় বিয়ে করতে চায়, তখন ?"

রাধু সরে এসে পিয়ারীর বুকে মুখ রাখে, সে যেন বলতে চায়, 'তোমাতে আশ্রয় নিয়েছি, তুমিইতো দেখবে।'

বেড়ার ফাঁক হতে খিল খিল হাসি শোনা যায়, বোঝা গেল মেয়েরা আড়ি পেতেছে। দুজনে তাড়াতাড়ি দুদিকে ফিরে ঘুমোবার ভান করে পড়ে রইল।

* * * *

বিয়ের পরদিন দুপুরে বরকর্তা, বর, বরযাত্রীরা সকলে এসে উপস্থিত। তারা যখন নদীতে নৌকা করে প্রায় কাছেই এসেছে, তখন ঝড় বৃষ্টিতে নৌকো উল্টে যায়। বর সমেত বরযাত্রীরা নাকানি চোবানি খেয়ে কোনমতে পারে ওঠে। ভিজে কাপড় চোপড়ে কাদা মাখা অবস্থায় রাতে এক গ্রামের দোকানে থেকে, পরদিন হেঁটে উপস্থিত হয়েছে।

পাঁচুগোপাল তো হতবাক, এখন তুমুল না হয়। সতীশবাবু বললেন, "মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। আপনাদের জন্য তো আর মেয়েটিকে না খাইয়ে মেরে ফেলতে পারি না ; তাছাড়া লগ্নভ্রষ্টের দোষ আছে।"

বরের বাবা, বিয়ে হয়ে গেছে শুনে রাগে কাঁপতে থাকেন। বলেন, তিনি দেখে নেবেন। এমন অপমান তিনি সহ্য করবেন না। বরযাত্রীরা পেছনে আস্ফালন করতে থাকে। সতীশবাবু সোজা তর্জনী দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে বলেন, "সে কোর্টে হবে, এখন তো বিদেয় হন।" বেচারা বর আশা করে এসেছিল। ফুলের মালা দুলিয়ে, আতর মেখে, টোপর মাথায় দিয়ে নতুন বৌকে পাশে নিয়ে পাল্কীচড়ে বাড়ী যাবে, তা না নদীর জল

খেয়ে কাদা মাখা অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। করুণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সে দলের সঙ্গে ফিরে চলল।

এদিকে রাধু আর পিয়ারী জানলা একটু ফাঁক করে বরের কাদামাখা চেহারা দেখে বার বার হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

॥ দুই ॥

কয়েকটা দিন খুব আনন্দে গেল কিন্তু পিয়ারীলালের খাবার সময় ঘনিয়ে আসে। রাধুর মুখ শুকিয়ে ওঠে। পাঁচুগোপাল পিয়ারীদের ঘর-বাড়ী মেরামত সুরু করে। মতিলালের মৃত্যুর পরে তো আর সংস্কার হয়নি।

সতীশবাবু খুলনায় যাবার দিন পিছিয়ে দেন। পিয়ারী অসুস্থতার কথা জানিয়ে আরও পনরো দিন ছুটি নিল। পিয়ারীর আকাশ-বাতাসের রং যেন একেবারে বদলে গেছে। মধু, মধু, মধু। চারদিকে এখন রাধু ছাড়া আর কিছু নাই। নির্জনে কখনও বেরিয়ে, শূন্য আকাশে রাধুর নাম উচ্চারণ করে। সমস্ত দিন তো অসহ্য যন্ত্রনা, রাত্রীর কামনায় দিন কাটে। বন্ধুবান্ধব, এমন কি মাকেও যেন আর ভাল লাগে না। এক একটা রাত যেন জীবনের এক একটা সর্গ। কি আনন্দময়, কি রহস্যময়, রসঘন প্রতিটি মুহূর্ত। এত সরসতা, এত নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি জীবনে কখনও মেলেনি। রাধুর মনে হয়, এ যেন হঠাৎ নিবিড় আঁধারে বনে যেতে যেতে পুর্বদিগন্তে পুর্ণচাঁদের দর্শন পাওয়া। কি তার মায়া, কি তার স্নিগ্ধ আলো। তাদের থাকার ঘর ঠিক হয়েছে পাঁচু গোপালের বাড়ীতে, ভোর হতেই রাধু শ্বাশুড়ীর কাছে চলে আসে। সমস্ত রাত অসংলগ্ন কথা, অপরিমিত প্রতিশ্রুতি, অবান্তর গল্প, মদির স্পর্শ নিয়ে কখন যেন ভোর হয়ে যায়। দুজনেই অপ্রস্তুত। রাধু তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে শ্বাশুরীর কাছে যায়। পিয়ারী কিন্তু পড়ে ঘুমোয়। পাঁচুগোপাল আড়ালে হাসে, ভাবে ঘুমোক, এই তো রাত জাগার বয়েস।

সারাদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে রাধুও ঘুমে ঢোলে। তরকারি কুটতে কুটতে ঘুমের ঝোঁক আসে, কোন কথা বলতে বলতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে

আসে। পারুলবালা, ধমক দেয়, "বঁটির সামনে এতো ঘুম কিসের ?" রাধু ধড়মড় করে চমকে ওঠে।

বনো এসে বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করে বলে, "বলনা বৌদি সেই গল্পটা, রাক্ষসী রাণীর হার মুড়মুড়ি রোগ হয়েছিল।" রাধু বলে, 'দুপুরে বলবো।' বনো জানে দুপুরে কখনও বলা হবে না। দুপুরে মায়ের পাশে পড়ে পড়ে ঘুমুবে বৌদি, তখন শত ডাকলেও সাড়া মিলবেনা তার।

পনেরোদিন দেখতে দেখতে কেটে যায়। যাবার আগের দিন রাতে রাধু কেবল কাঁদে। অনেক প্রতিজ্ঞা করায়, ঠিক সময় খাবে, ঠিকমত বিশ্রাম করবে, সপ্তাহে অন্ততঃ একখানা চিঠি দেবে। রাধুর মাথার চুলের একগুচ্ছ কেটে স্মরণের জন্য পিয়ারীকে দেয়। পিয়ারী বলে, মাকে যেন সে যত্ন করে, ছোটভাইটাকে যেন দেখে। মা বড় দুঃখী, সারাজীবন কষ্ট করেই গেলেন। বধূ প্রতিজ্ঞা করে। শেষে দুজনে সারারাত গল্প করে, তারপর হঠাৎ কখন ভোর হয়ে যায়। বাইরে কাক ডাকে।

বিকেল সাড়ে চারটের ট্রেন। পিয়ারী খেয়ে দেয়ে বারোটার মধ্যে রওনা হল, কারণ ছমাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সতীশবাবুও সঙ্গে গেলেন, তিনি ভাটিয়া পাড়া হতে স্টীমারে খুলনায় যাবেন।

পাঁচুগোপাল জামাইকে অনেক উপদেশ দিল, যেন সাবধানে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমত দেয়, মেদিনীপুরে সাপ খুব বেশী, রাতে আলো না নিয়ে না বেরোয়। আরও কত কি। শেষে দুখানা দশ টাকার নোট জামাইয়ের হাতে দিয়ে বলে, "পথে কিছু খেও।"

পিয়ারী অনেকবার গ্রাম ত্যাগ করেছে, কিন্তু এবারের মতন এমন ভারী মন নিয়ে আর কোন দিন যায়নি। দাদুর সঙ্গে হিজলগাছ, রয়না গাছের তল দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে চলে।

পারুলবালা, রাধু, যতক্ষণ পারে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে। মজুমদারদের বকুলতলা পার হতেই আর কাউকে দেখা গেল না। তখন দুজনে চোখে কাপড় দিয়ে ঘরে ফিরে আসে। একজনের অভাবে ঘর তাদের কাছে আজ শূন্য, অর্থহীন, নিরানন্দ।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

কানুনগো সাহেব মোহিনীবাবু বোঝাচ্ছিলেন, পিয়ারী আর অনন্ত পালকে। পৃথিবীর শেষ নেই। মানুষ কত মাইল হেঁটে যেতে পারে পায়ে পায়ে? কত গ্রাম আছে এই বাংলায়, কত ঘর বাড়ী, কত পরিবারে কত জীবলীলা। কত বৈচিত্র্য জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পরিবারে পরিবারে মানুষে মানুষে। আবার এখানেই তো সে বিচিত্রতার শেষ নয়। এর পরেও পৃথিবীর চলার পথ এগিয়েছে। সেখানে আরও ভিন্ন প্রদেশ, তার পরে দেশে দেশে বিভিন্নতা। ভাষা পৃথক, গায়ের রং পৃথক, ধর্ম পৃথক। কিন্তু মানুষের মন এক। সে মনের বোধও এক।

এখানে যেমন মানুষ স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর বাঁধে, বিদেশযাত্রী ছেলের দিকে তাকিয়ে মা চোখের জল ফেলে, প্রবাসী স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য স্ত্রী ভগবানকে ডাকে, সমুদ্রপারেও তাই। ভূপ্রকৃতি বদলায়, মানুষের বাইরের চেহারাও পাল্টায়, কিন্তু যতদূর জলবাতাস আছে ততদিন মানুষ ভিতরে ভেতরে এক। সে ঘর বাঁধে, ভূমি অধিকার সংরক্ষণ করতে চায় প্রতিবেশীর কাছ হতে। বিবাদ বাঁধে। সে বিবাদ মেটাবার জন্যই তো আমিন আসে মাঠে, দখল লেখে। কানুনগো বিচার করে, স্বত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ করে। শুধু সরকারের খাজনার জন্য নয়, মানুষের জন্মদাত্রী, বাসদাত্রী, প্রাণদাত্রী, মাটির স্বত্ব, দখল গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে মাঠে, পাহাড়ে নদীতে, পুকুরে, লিখতে হয় মানুষেরই অধিকার সংরক্ষণ করতে, বিবাদ ঘোচাতে। তাই আমাদের কর্তব্য মহান।

দেখুন, এ মাটি না থাকলে মানুষের কি মূল্য ছিল, সভ্যতার জয়স্তম্ভ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি সবই তো মাটিকে অবলম্বন করে। জমি নিয়ে বিবাদ বিসংবাদ সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে আজও অব্যাহত। কেউ তা নির্মূল করতে পেরেছে কি? হ্যাঁ, তবে বিবাদের ধারাটা পাল্টেছে। আগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত জমির দখল নিয়েই। কি তফাৎ তার সঙ্গে, উত্তর বাড়, মহম্মদপুরের সুরেশ্বর মাইতি আর মনোরঞ্জন ঘোরইর মারপিটের

সঙ্গে ? ইতিহাসতো জমি নিয়ে মারপিট ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। ডিস্পিউটের সময় এমন লোকও আছে যে সীমানা একহাত পিছিয়ে এনে বিবাদ এড়িয়ে যায়। এরাই হয়তো বুদ্ধিমান।

শেষে তিনি সতর্ক করে বল্লেন, "এর মধ্যে আমাদের কর্তব্য হল, এ বিবাদ আমরা বাড়তে দেব না, বরং সততার সঙ্গে কমাব। দেখবেন আপনারা সব সময় আমার সুনাম রক্ষা করবেন।" বাড়ী ফিরতে ফিরতে কানুনগো সাহেবের বক্তৃতা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, বিশেষ করে নরেন মাইকাপের ঘটনা মনে করে।

আজ প্রায় একবছর হল তারা কাঁথি ভগবানপুরে এসেছে। গত পূজোতে কারও ছুটি মেলেনি। মহম্মদপুরে নরেন মাইকাপের বাড়ীতে সে ও অনন্ত পাল আছে। ঘর মেলে না। এতদিনে এ হল্কাটার উঠল। এবার বাকী খোদ ভগবানপুর। এগিয়ে চলতে হবে। আজ গিয়েছিল অফিসারের কাছে সীট্গুলি জমা দিতে। বাড়ীর কষ্ট ছাড়া ঐ নদীর পারে মন্দ কাটেনি। কাজ যখন থাকত না, তখন বিরাট বাঁধের উপর বসে সময় কাটত। মনে আসত দেশের কথা, বিশেষ করে রাধুর কথা। কি অসহ্য যে যন্ত্রনা হত। মাঝে মাঝে চিঠি লিখত।

এ গ্রামে কিছুই নেই, কারও সঙ্গে মিশবারও পথ নেই। একটা শুধু সরকারি ডাকবাংলা। মাঝে মাঝে সেখানে দু-একজন অফিসার এসে উঠতেন। সে শুনেছে পূর্বে সাহেবরা এলে চৌকিদারদের ওপর হুকুম হত 'জেনানা' জোগাড় করবার জন্য। চৌকিদাররা জোগাড় করে আনত মেয়েছেলে তা সে জেলেই হক বা পোঁদই হক, কালো কুশ্রী যাই হক না কেন। নির্জন দেশে সাহেব রাত কাটাবে কি করে। অত্যাচারের ভয়ে লোক উঠে পালিয়ে যেতে সুরু করল। চৌকিদারের ঘর ছাড়া, আর সব ঘর শূন্য হয়ে পড়ল।

একবার নাকি ম্যাজিস্ট্রেট্ এলেন। সেদিন কোন জেনানাই জোগাড় করা সম্ভব হল না, চৌকিদারের পক্ষে। সন্ধ্যায় এসে সে করযোড়ে তার অক্ষমতা জানালে। সাহেব তখন মদ টেনে টং হয়ে বসে আছেন। তিনি হুকুম দিলেন, ওকে বেঁধে, চাবুক লাগাও। প্রহারে জর্জ্জরিত

করা হল, তাকে। তারপর তার অচৈতন্য দেহটাকে পাশের বাথরুমে তালা দিয়ে রাখা হোল। সেপাইরা আবার বেরুল, এবারে আধ-ঘণ্টার মধ্যে একটী অল্পবয়সী মেয়েকে ধরে আনল। দুদিন সাহেব রইলেন ওখানে। যাওয়ার সময় মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন। ঘর খুলে দেখা গেল চৌকিদার মরে গেছে, ওকে টেনে কেলেঘাই নদীতে ফেলে দেওয়া হল। মেয়েটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। তারপর সবাই চলে গেলে, সে ঐ বাংলোর বারান্দায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল। দূর গ্রামের সবাই অবাক হয়ে দেখল যে চৌকিদারের বৌ জানকী বাংলোতে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে।

এটা একটা পুরানো গল্প, পিয়ারী ছ'ফুট দীর্ঘ বৃদ্ধ সনাতন মাইতির কাছে শুনেছে। সে সব দিন আর নেই। পঞ্চমজর্জের রাজত্ব, দেশ সুশাসিত। তাছাড়া এ দেশে স্বদেশীয়ানা খুব বেশী, কোন সাহেবই সহজে এখানে আসতে চাইত না। ২৪-পরগণার সেট্‌লমেণ্ট অফিসার বার্জ সাহেব এখানে এসে স্বদেশীদের গুলিতে প্রাণ দেন। মেদিনীপুর বিদ্যা-সাগর, বীরেন শাসমল, ক্ষুদিরামের দেশ। আগুন এখানে মানুষে বুকে।

সে আর অনন্ত বেশ কিছুদিন এখানে রইল, গ্রামের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছিল। নরেনবাবু যত্নও বেশ করেছিলেন।

এরপর আজকের ঘটনা। পরদিন তারা বিছানা বাক্স নিয়ে ভগবান-পুর সুরেন মাইতির ঘরে গিয়ে আস্তানা গাড়ল। পরশু হতে কাজ সুরু হবে। কানুনগো সাহেব বিকেলে এলেন পি-৭৬ সীট্ নিয়ে। অনেকক্ষণ রইলেন। এমনি সময় সাহেবের আর্দালী এসে খবর দিল, "সার্কেল অফিসার মিঃ রাহা এসেছেন, খাসমহল বাংলোতে উঠেছেন। আপনাকে ডাকছেন।" মোহিনীবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই ব্যাটা এসেছে জ্বালাতে। কাজ করবে না, খালি মাতব্বরি করবে, আর খাওয়াতে হবে।" পিয়ারী আর অনন্ত তো অবাক, বলে কি? তারা শুনেছে কাঞ্জিলাল সাহেবের মাথায় একটু ছিট আছে, কিন্তু তাই বলে···? মোহিনীবাবু বলেন, "চলুন, আপনারাও চলুন পি-৭০ সীট নিয়ে।"

বাংলোতে যেতেই দেখা গেল সাহেব একটা আরাম কেদারায় বসে খাসমহলের ম্যানেজারের সঙ্গে গল্প করছেন। পিয়ারী ও অনন্ত মাথা

নীচু করে নমস্কার করল। মোহিনীবাবু কোনমতে দায়সারা গোছের হাত উঁচু করলেন। সার্কেল অফিসার মনে হল একটু রুষ্ট হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কি কাজ হয়েছে? কি বল্লেন, ভগবানপুর এখনও ধরা হয়নি? এত স্লো কাজ হচ্ছে কেন?" কানুনগো উত্তর দেন, "এর চেয়ে শীঘ্র কাজ কোন আমিনই করতে পারত না। ভাল কথা, আমাকে বসতে বলছেন না তো, এই আমি বসলাম।" কাঞ্জিলাল সাহেব একটা চেয়ার শব্দ করে টেনে বসে পড়লেন। ব্যাপার দেখে ম্যানেজার সতীশবাবু উঠে পাশে নিজেরবাড়ীতে চলে যান। কাঞ্জিলালের সঙ্গে তারও আলাপ আছে। মিঃ রাহা হয়ত পূর্বে এ কানুনগোকে জানতেন না। তিনি নতুন এসেছেন এ অঞ্চলে। তিনি উঠে ঘরময় পায়চারি স্থুরু করলেন, ভাবখানা, পারলে এখনই তিনি কানুনগোকে ডিস্‌চার্জ করেন। ক্ষমতাটাই নেই, এই যা। ঘরের হাওয়াটা একটু নরম হল, কারণ কানুনগো সাহেবের আর্দালী এককাপ চা নিয়ে প্রবেশ করল। চা খাওয়ার পর সাহেব বলেন, "অলরাইট কাল আমি কাজ দেখব। মোহিনীবাবু উত্তর করেন, "দেখ-বেন। তাহলে এখন আমি উঠি, আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।" তিনি বের হয়ে আসছিলেন। পেছনে পিয়ারী ও অনন্ত যাচ্ছিল। সাহেবের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে, তিনি চাপা স্বরে বলেন, 'বেয়াড়া ঘোড়া কোথাকার।'

ব্যস্ আর যায় কোথায়। মোহিনীবাবু বিদ্যুতগতিতে ফিরে এলেন মিঃ রাহার সামনে। সে চোখে দাউ দাউ করছে আগুন। মিঃ রাহা ভয়ে পিছিয়ে এলেন দু'পা। মোহিনীবাবু চিৎকার করে বলেন, "মনে করবেন না যে আপনি আমার অন্নদাতা। আমি পঞ্চম জর্জের চাকরী করি। আপনিও আমার মতন চাকর শুধু ভাগ্যবলে আপনি উপরওয়ালা। আজ চাকরী ছেড়ে দিলে রাস্তায় আপনাকে ধাক্কা মেরে পথ চলব।"

মিঃ রাহা থতমত খেয়ে গেলেন। পিয়ারী আর অনন্ত জীবনে এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় কখনও পড়েনি। তারা মোহিনীবাবুর হাত ধরে টানা-টানি স্থুরু করলেন।

কে কার কথা শোনে, তিনি বলে চলেন, "আপনাকে ভয় করি না কারণ আমি অসৎ নই, যে চাকরীর ভয় করব। আর বিবাহিত নই যে

বদলীর ভয় করব।" গোলমালে সতীশবাবু, থানার দু-এক ভদ্রলোক, সবাই এসে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। তখনও তিনি গর্জাচ্ছেন। রাত্রিটাই মাটি হয়ে গেল পিয়ারী আর অনন্তর কাছে। পিয়ারী বলে, "রাহা সাহেব যে চটলেন এটা কি ভাল হল? আমাদের ওপর দিয়েও ঝাল যাবে।" অনন্ত পাংশু মুখে সায় দেয়। রাত্রে কিন্তু মোহিনীবাবু নিজের বাড়ীতে রান্না করিয়ে রাহা সাহেবের খাবার পাঠালেন, পিয়ারী ও আর্দালীকে দিয়ে। সাহেব ও তাঁর আর্দালী গম্ভীর হয়ে খেলেন। পরদিন ভোরে তারা যখন সার্কেল অফিসারকে চা দিতে গেল, তখন ঘরে কেউই নেই। খুব ভোরে তিনি আর্দালীসহ কাঁথির পথে রওনা হয়ে গেছেন। মোহিনীবাবুকে খবর দিতে তিনি মৃদু হাসেন। বলেন, "অফিসারকে যত নরম কাটবে, তাতেই তারা পেয়ে বসবে। আমার কাজ তারা দেখতে পারে, কিন্তু আমাকে অপমান করবার তারা কে? আমাদের দেশের অফিসাররা অধঃস্তনদের ওপর অত্যাচার করাই কর্তব্য বলে মনে করে।"

ম্যানেজার সতীশবাবু এলেন, সাহেব আর্দালীকে বললেন, চা করতে। চা তৈরী হল সবার জন্য। সতীশবাবু প্রশ্ন করেন, "এটা কি ভাল করলেন, মোহিনীবাবু, শত হলেও ওপরওয়ালা তো। কি রিপোর্ট গিয়ে ওপরে করে।" মোহিনীবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন, সতীশবাবু থতমত খেয়ে চোখ নীচু করে চা খেতে সুরু করলেন। মোহিনীবাবু বলেন, "দেখুন, আমি বার্জ সাহেবকে তার এই লুজ্ কথা বলার জন্য ছাড়িনি। তিনি আমায় অ্যাপ্রিসিয়েট করে গেছেন, আর এ সার্কেল অফিসার রাহা আমাকে যাতা বলবে?" চা খেয়ে সতীশবাবু আর কোন কথা না বলে বিদায় নেন। বৈশাখের আতপ্ত দিন। গ্রামের মধ্য দিয়ে তারা ফিরছিল। গাছে বেশ বড় বড় আম হয়েছে। গত বছর এই সময় সে দেশ ছেড়েছে। উঃ কতদিন হল। ছোটবেলার একটা গ্রাম্য ছড়া খুব মনে পড়ে, তার আম সম্বন্ধে। মজুমদার বাড়ীর পাঠশালায় যখন পড়ত, তখন সবার সঙ্গে সেও ছড়া কাটত.

"মাঘে বোল,<br>
ফাল্গুনে গুটি।

চৈত্রে ধরে আঠি,
বৈশাখে কাটাকুটি ।
জ্যৈষ্ঠে দুধের বাটি,
আষাঢ়ে আদাড়ে আঠি,
শ্রাবণে বাজায় বাঁশি ।”

দীর্ঘ সাতটা মাস বাংলা দেশে আমাকে নিয়ে স্তুতি । এখন তার দেশে মা হয়তো স্নান করে রাধুকে নিয়ে ভাত খাচ্ছেন । বনো আগেই খেয়ে ঘুমিয়েছে, নয়তো পাশের বাড়ীর ক্ষুদিরামের ছেলে মণ্টুর সঙ্গে খেজুর গাছের নীচে ঠাকুর পূজোর আসন পেতেছে । দূরে কিংবা কাছে হয়তো কোকিল ডাকছে । কবে যে সে বাড়ী যেতে পারবে কে জানে । অনন্ত'র কথায় স্বপ্ন ভেঙে গেল । “ভাই একটা টাকা ধার দিবি ?” পিয়ারী বলে, “সেদিনের টাকাটা শোধ করলে না তো ?” অনন্ত উত্তর দেয়, “মাইনে পেলে সব ফেরৎ পাবি ।” পিয়ারী কথা না বলে, পকেট হতে একটা রূপোর টাকা ওর হাতে দিল । অনন্ত একবার বাজিয়ে পকেটে রাখল ।

ভগবানপুরের কিস্তোয়ার সুরু হল । অফিসার সীট পাশ করে দিয়েছেন । খুব ভোরে ভাত খেয়ে সীট টেবিল নিয়ে মাঠে যায় । তিন-পায়া টেবিল পেতে, মোরব্বাকে দুচেন অন্তর ভাগ করে । সে লাইনই হল অ্যাডভান্স লাইন । ঐ লাইন বরাবর অপটিক্যাল প্রিজম্ নিয়ে এগিয়ে যায়, প্লটের কোনো বাঁকে চেনম্যান বাঁশ নিয়ে দাঁড়ায় । পিয়ারী প্রিজম্ নিয়ে দেখে সামনের অ্যাডভান্স লাইনের মাথায় ফ্ল্যাগ্ আর বাঁশ মিশে গেছে কি না । না হলে সামনে পেছনে এগিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে, তারপর বাঁশ দিয়ে পিওন দূরত্ব মেপে নিচ্ছে । ফিল্ডবুকে নোট হচ্ছে । পিওন এগিয়ে যাচ্ছে, আমিনও এগিয়ে চলেছে । এই লাইন শেষ হলে পরের লাইন ধরা হচ্ছে । কিছুটা কাজ হলে আবার টেবিলে বসে সরু পেন্সিলের সাহায্যে সীটে প্লট তৈরী করা হচ্ছে । অনন্ত পাশের সীটে কাজ করছে । বাড়ী তার নোয়াখালি জেলায় । খুব পরিশ্রমী ছেলে । যেখানে জঙ্গল, চেন চলছে না, দৃষ্টি চলে না, তারা ত্রিভুজ করে এগিয়ে যাচ্ছে । বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই । হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটান, পায়ে লাল জুতো, মুখ রোদে ঘামে কালো ; তারা কাজ করে চলেছে । হাতে

গায়ে মাটির গন্ধ, সমস্ত গ্রামটির ছবি তারা চেন, স্কেল, ডিভাইডার দিয়ে সাঁটে তুলে নিচ্ছে। তৈরী হচ্ছে ম্যাপ। প্রায় একদিন পর পর কানুনগো সাহেব আসছেন, কাজ দেখছেন, পরতাল দিয়ে ভেরিফাই করছেন। সারাদিন প্রায় মাঠেই থাকছেন তিনি। অদ্ভুত পরিশ্রমী। শেষ হবার একটু আগে সাইকেলে উঠে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছেন।

এমনি করেই কাজ এগিয়ে চলে। দিনের পর দিন, মাঠে মাঠে কাটিয়ে আমিন ম্যাপ তৈরী করে, সে ম্যাপ ছাপা হয়, কিন্তু তাতে তাদের নামের বদলে ঝক ঝক করে সেট্‌লমেন্ট অফিসারের নাম। আমিনদের কঠিন পরিশ্রমের কথা কারও মনে থাকে না।

মেদিনীপুরের এই সেট্‌লমেন্ট, খাসমহল সেট্‌লমেন্ট। কিস্তোয়ার প্রায় শেষ। ওদিকে অনন্ত কালুরভেড়ী মৌজা মাপা শেষ করে এনেছে। সার্কেল অফিসার আর আসেননি। এরপর খানাপুরি বুঝারত হবে।

একশো করে খতিয়ান ফরম বেধে নেওয়া হল। খতিয়ানের ঘরগুলি পূরণ করে নিতে হবে মাঠে গিয়ে গিয়ে। সবগুলি ঘর পূরণ করা চলবে না, খানাপুরির সময়। এরপর বুঝারত, এর কাজ করবে কানুনগোরা বা অভিজ্ঞ আমিনরা।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। খানাপুরি এগিয়ে চলেছে। আকাশে মেঘের সঞ্চারে বর্ষার আগমনী গান। দু'এক পশলা বৃষ্টি মাঝে মাঝে হচ্ছেও। মেদিনী-পুরের মাটিতে বৃষ্টি হলে আর কাজ করা যায় না। তাছাড়া চাষীরা চাষের জন্য তৈরী হচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলবারও অবসর নেই, মোহিনীবাবু নিরুপায় হয়ে পিয়ারী আর অনন্তকে বুঝারতে পাঠাচ্ছেন, তিনি নিজেও যথেষ্ট খাটছেন।

সেদিন মঙ্গলবার, সন্ধ্যায় কাজ শেষে তারা হাট করতে গেল গোপীনাথ-পুরে। এবরো-খেবড়ো রাস্তা। হাটের ওপরেই জগন্নাথ হাতীর তেলে-ভাজার দোকান। তাকে দেখে বলে, "কোনঠি যাবু বাবু?" তারা উত্তর দেয়, বাজার করতে এসেছে। যমদূতের মত কালো চেহারার একটা লোক, তাড়ি খেয়ে চোখ লাল, গনগনে উনুনের সামনে বসে আছে। জড়ান স্বরে লোকটা বলে, "চা খান, বেগুনি খান, আমিনবাবুরা।" ভাজাগুলি দেখলে লোভ হয়। বাঁশের মাচার উপর দু-গ্লাস চা নিয়ে তারা বসে। জগন্নাথ

গরম তেল হতে তুলে হুটো প্লেটে কতগুলি ভাজা এগিয়ে দেয়। এত গরম যে ধোঁয়া উঠছে। অনন্ত একটা তুলে মুখে দিয়েই উঃ উঃ করে চিৎকার করে মুখ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়। সেই লোকটা বলে, "বাবু, জল ঢেলে ভাজা ঠাণ্ডা করুন, দেখবেন, পান্তা ভাজা কি ঠাণ্ডা।" পিয়ারী ফিক করে হেসে ফেলে, সে তখনো মুখে দেয়নি। মাতাল মদ খেলে কি সব আবোলতাবোল বলে। অনন্ত এবার সাবধানে ফুঁ দিয়ে এক একটা মুখে দেয়। চা শেষ করে পান চাইল। ওর মুখ পুড়ে গেছে।

বেশ বড় হাট। হুজনে চাল, বেগুণ আর মাগুরমাছ কিনল। অনন্তর কাছে টাকা। টাকা দেবার জন্য অনন্ত কোঁচার গিঁট খুলতে একরাশ পাঁচ-টাকা আর দশটাকার নোট দেখে পিয়ারী অবাক। মুহূর্তে অনন্ত কোঁচায় গিঁট বাঁধে। পিয়ারীর মুখ ঈর্ষায় কালো হয়। তাহলে অনন্ত অসদুপায়ে উপার্জন করছে। মোহিনীবাবু জানলে আর রক্ষা নেই। তাকেও তো সন্দেহ করবে। হুজনে হাঁটাপথে ফিরে এল। সারা পথ পিয়ারী কেবল এই কথাই ভেবেছে। আচ্ছা, তাই যদি হবে তবে অনন্ত তার কাছ থেকে ধার নেয় কেন? না কি, এও একটা ধোঁকা দেবার কায়দা। হয়ত তাই। কিন্তু সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই।

বৃহস্পতিবার বৃষ্টির জন্য কাজে বেরোন হয়নি, সে আর অনন্ত বসে গল্প করছে। চেনম্যানদের ছুটি। এমন সময় মঙ্গলামাড়ু গ্রামের শিশির পইড়্যা বলে একটা লোক এসে দাঁড়ায়। ওদের অনেক কাজকর্ম এ লোকটি করে দিত। পরে পিয়ারী জেনেছিল যে লোকটি অনন্তর দালাল। লোকের বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিত জমির গোলমাল কিছু আছে কি না। থাকলে বলত, অনন্ত আমিনকে বলে সব ঠিক করে দেবে। তারা হাতে স্বর্গ পেত। যে টাকাটা এ বাবদে আদায় হত তার হুভাগ অনন্তর, একভাগ তার। অনন্ত'র কাছে হুই সেট খতিয়ান বই থাকত। যে টাকা দিত তার সামনে নকল খতিয়ান বই থেকে প্রতিপক্ষের নাম ঘ্যাচকরে কেটে তার নাম বসিয়ে দিত। শ্রাবণে তারা যখন কাঁথি চলে যায় তার আগে কাঁকড়া জগমোহনপুর এসে নকল বইটা তালপুকুরে ডুবিয়ে দিয়ে যায়। আসলটা অফিসারের কাছে দাখিল করে।

থাক্ সে কথা। শিশির পইড়্যা হাতের একটা পুঁটলি নামিয়ে রেখে

বলে, " একটু মুর্গির মাংস এনেছি আমিনবাবু।" দুজনের দেহেই শিহরণ বয়ে যায়। তখন একাজটা খুব গর্হিত ছিল, হিন্দুর ছেলে মুর্গির মাংস খাবে কি! পিয়ারী মুর্গির মাংস একবার খেয়েছিল ক্যানিংএ পীরবক্সের ঘরে, তাও লুকিয়ে।

ওর মুখ শুকিয়ে যায়, যদি বাড়ীর মালিক সুরেন মাইতি টের পায়, তবে তো এখুনি গিয়ে কমপ্লেন করবে। অনন্ত বলে, "কোন কথা বলিসনা, কেউ টের পাবে না।" বাইরে সমান তালে বৃষ্টি চলছে। শিশির পইড়্যা চলে গেছে। পিয়ারী মশলা বেঁটে দিল। ইঁটের উনুনে অনন্ত মাংস বসিয়ে দেয়। পরে ভাত হবে। নির্বিঘ্নে সব হয়ে গেল। এই বৃষ্টিতে আর সুরেনবাবু খবর নিতে আসেনি। খাওয়া দাওয়া হয়ে যায়। নিষিদ্ধ বস্তু খাওয়ায় যে কি আনন্দ! রান্নাও চমৎকার হয়েছিল। খাওয়া শেষ হলে, তারা এঁটো বাসন ধুয়ে ফেলল। কোন চিহ্ন রইল না আর। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম। বাইরে তখনও উদ্দাম বৃষ্টি। মনে হচ্ছে কালও কাজ হবে না।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। দরজা খুলতে দেখা গেল, সুরেনবাবু ছাতা মাথায়। ছাতা বন্ধ করে তিনি ভেতরে এসে দাঁড়ালেন, তারও খাওয়া শেষ। সুরেনবাবু প্রশ্ন করেন, সুন্দর মাংসের গন্ধ বেরিয়েছিল, মাংস কোথায় পেলেন ?"

পিয়ারীর মুখ শুকিয়ে গেল। বুড়ো টের পেল নাকি।

অনন্তকে বাহাদুর বলতে হবে, সে চটকরে বলে, না এই টোটানালায় একটা খাসি কেটেছিল, সেই একভাগ আনিয়েছিলাম।" সুরেনবাবু বলেন, "ও টোটানালায় খাসি কেটেছিল নাকি। বেশ বেশ ভাল কথা।" তিনি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে যান। অনন্ত দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ে, দুজনে মজা পেয়ে হাসতে থাকে। বুড়োটা গন্ধ ঠিক পেয়েছে, কি নাক রে বাবা। তবে আচ্ছা ধাপ্পা দেওয়া গেছে ওকে।

এর কিছু দিন পরে বর্ষা নেমে এল পূর্ণোদ্যমে। বাঁধের ওপর হাঁটা যায় না, পা হড়কে গেলে সেই আঠারো ফুট নীচে। বুঝারতও প্রায় শেষ। নতুন অফিসার আসবে, এটেস্টেশন করতে। ওরা এলেই তারা কাঁথি গিয়ে রিপোর্ট করবে, তারপর নতুন পোষ্টিংএর অনিশ্চয়তা।

গত সপ্তাহে বাড়ীর চিঠি পেয়েছে। লিখেছিল রাধু আর পারুলবালা। পারুলবালা লিখেছে পাঁচুগোপালের শরীর খুবই খারাপ। বনোও ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠল। পিয়ারী কবে আসবে ইত্যাদি।

আর রাধু গোটা গোটা অক্ষরে, সুন্দর করে লিখেছে, বার বার মাথার দিব্বি দিয়ে, এবার দুমাসের ছুটি নিয়ে আসতে। দাসী শ্রীচরণ সেবা করে অনেক শান্তি পাবে। চিঠির স্থানে স্থানে চোখের জলের ফোঁটা। একস্থানে মাথার একটী দীর্ঘচুল, একজায়গায় সিঁদুর লাগান। তারপর লিখেছে তার জন্য একখানা ডুরে নীলাম্বরী শাড়ী আনবার জন্য। মার জন্য প্যাণ্ট। শ্বশুরের জন্য একখানা ধুতি যেন আনা হয়। শ্বশুরের সে তো ছেলের মতন। দেশে খুব ম্যালেরিয়া লেগেছে। পিয়ারী যেন সাবধানে থাকে। ইত্যাদি। চিঠির অপর পিঠে চার লাইন কবিতা,

"তুমি এসে দেখে যাও, তব প্রাণেশ্বরী,
তোমার বিহনে ভূমে যায় গড়াগড়ি।
চেতন হারাবে নাথ, বিলম্ব করিলে,
তব সুধা বাক্যদানে, বাঁচাও তাহারে।"—রাধু। নাল

খামের মুখে ৭৪।।০ লেখা।

চিঠিখানা পেয়ে অনেকক্ষণ পড়ল। তারপব ফোঁস করে একটী দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল। এ চিঠিই প্রথম নয়, আরও কখানা চিঠি সে রাধুর পেয়েছে। প্রথম প্রথম তার কান্না আসত চিঠি পেয়ে। দিনে তবু লোকজনের ভীড়ে ও কাজের চাপে ব্যথা কম মনে হত, কিন্তু রাতে বিছানায় শুলেই মনটা হুহু করে উঠত, দুচোখ জ্বালা করত। মাঝে মাঝে মনের রাশ আলগা করে দিয়ে রাধুকে নিজের পাশে কল্পনা করত, কখনো বা একাই দুজন হয়ে রসাস্বাদন করত। কখনো হৃদয়ের ব্যথা দুর্বার হয়ে উঠত, ইচ্ছে হত ঐ বাঁধ হতে নেমে সবংএর মাঠ পেরিয়ে সোজা পশ্চিমে গিয়ে রেল ধবে। বালিচক স্টেশন কতদূর ? অনন্ত জানে, তার কাছে শুনেছে ওপথে যান-বাহন নেই, আর সবংএ অত্যন্ত কাদা হয়। রাস্তায় জল জমে। তবে, পথে অনেক জামগাছ আছে, জাম খেয়েছিল অনেক যেতে যেতে।

নতুন অফিসার কালিপদ ঘোষ সঙ্গে সমস্ত ষ্টাফ্ নিয়ে এলেন চার্জ বুঝে নিতে। মোহিনীবাবু সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে

চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। সতীশবাবু সবাইকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করলেন। খাসির মাংসই প্রধান পদ। রাতটা বেশ আনন্দেই কাটাল তারা। পরদিন রাত থাকতে তাঁরা সার্ভিস নৌকায় করে ভগবানপুর হতে কাঁথি রওনা হলেন। স্থানীয় লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাব্বাঃ, যে বদরাগী লোক! কত লোককে আসেনি বলে ঘাড় ধরে টেবিলে নিয়ে এসেছেন। অথচ সবাই মোহিনীবাবুকে সমীহ করে চলত তাঁর সততার জন্য।

॥ দুই ॥

কাঁথি এসে শুনল পূজোর পরে তাদের যেতে হবে দিনাজপুর। ততদিন কাঁথিতে থাকতে হবে। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। মোহিনীবাবু ঢুকেছিলেন চার্জ অফিসারের ঘরে, সার্কেল অফিসার তাঁকে দেখে বেরিয়ে গেলেন। চার্জ অফিসার কানুনগোকে যেন কি বলছিলেন বেশ উঁচু গলায়, পিয়ারী আর অনন্ত বাইরে থেকে শুনে ভীত হয়। আবার কি হল কে জানে। কিন্তু আশ্চর্য, মোহিনীবাবু চুপ করে আছেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলে ওরা দুজনে ছেঁকে ধরে, "কি হয়েছে স্যার?" মোহিনীবাবু হাসতে থাকেন, বলেন, "তোমাদের ভগবানপুরের বাড়ীওয়ালা, সুরেন মাইতি দরখাস্ত করেছে যে তোমরা মুর্গি খেয়ে তার বাড়ী অপবিত্র করেছ। সেই কথাই হচ্ছিল।" পিয়ারী চমকায়, অনন্ত বোবা হয়ে যায়। মোহিনীবাবু নিজেই বলেন, "বিলকুল মিথ্যে। ওর কোন কাজ হাসিল হয়নি বলেই ঐ দরখাস্ত করেছে, এই বলে দিলুম।" দুজনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, বড্ড ফাঁড়া গেছে।

শহরে এসে ওরা ভারি খুশি। চারদিকে বালি আর বালি। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সমুদ্রগর্জন শোনা যায়। পিয়ারী ভাবে পদ্মা, মধুমতীর কোপে কত গ্রাম তলিয়ে যায়, আর এ শহর টিঁকে আছে কি করে? অনন্ত'র অনুরোধে মোহিনীবাবু তাদের সঙ্গে নিয়ে রসুলপুর কালিবাড়ীর দিকে বেড়াতে যান। রসুলপুরের নদী, এদিকে কেবল বালিয়াড়া, মাঝে মাঝে কাঠগোলাপের বাহার। মোহিনীবাবু একদিন বেড়াতে গেলেন প্রায় সাতমাইল দূরে, ফিরে এলেন হাতে রাজভোগ নিয়ে। এক রবিবার সকলে মিলে গেল জুনপুটে সমুদ্র দর্শনে। জীবনে এই প্রথম। ঢেউয়ের পরে

ঢেউ মাথা উঁচু করে গর্জন করে ছুটে এসে তীরে আছড়ে পড়ছে। কত লাল কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরতে গেলেই গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছে। আহা, রাধু আর মা যদি দেখত, কি মজাই না হত তা'হলে।

১৯৩৫ সনের ভাদ্র মাস। প্রকৃতির রং একটু একটু করে বদলাচ্ছে। পিয়ারী ও অনন্ত যুক্তি করে ছুটি চাইল একমাসের। মোহিনীবাবু চার্জ অফিসারকে বলে মঞ্জুর করিয়ে দিলেন। আর সময় মত এসে রিপোর্ট করতে বলে দিলেন। বিদায়কালে, তাঁর চোখে জল দেখা যায়। বললেন, "আবার দেখা হবে।" কিন্তু এরপরে মোহিনীবাবুর সাথে তাদের আর দেখা হয়নি। তিনি বদলী হয়েছিলেন হুগলী জেলায়, আর তারা উত্তর-বঙ্গের দিনাজপুরে। সে অনেক কথা।

অকৃতদার এই যুবকটি পিয়ারীর কাছে এক বিস্ময়। এরকম কানুনগো আর সে দেখেনি। ১৯৫০ সনে ঢাকার দাঙ্গায় তিনি নিহত হন। পিয়ারী এ সংবাদ সংবাদপত্রে পড়ে চোখের জল সামলাতে পারেনি। পাকিস্তানের দাঙ্গায় কত অমূল্য প্রাণ হারিয়ে গেল, কত পরিবারের সর্বনাশ হল, কেই বা তার খবর রাখে!

## নবম পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

শরতের আকাশ ভারি সুন্দর। বর্ষায় বৃষ্টি হয়ে মেঘের আর জলবর্ষণের ক্ষমতা নেই। সমস্ত নারানপুর জলে ভাসছে। পুকুরগুলি কচুরিপানায় ভর্তি। ভোরবেলাটা যেন একটা সুখের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে, সে সুখ যে কি তা' কে জানে। ঘাটে এসে রাধু চোখের জল মোছে। লোকটার কি মায়া দয়া একটুও নেই, সেই কবে গেছে, আজও এল না। এবার এলে আর কথা বলবে না সে পিয়ারীর সঙ্গে, মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। এত দিব্বি করে চিঠি লিখল তবুও এল না। আবার মনে হয়, লোকটা সুস্থ আছে তো, যে খাটুনি মাঠে মাঠে। তারপর লোকটার একদম নিজের বলতে জ্ঞান নেই। খুব ভয় হয় রাধুর। দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি চাল ধুয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে ঘাট হতে

উঠে আসে। পারুলবালা বলল, "বৌ, তুমি. ভাতটা দেখ, আমি তোমার বাবাকে দেখে আসি. কেমন আছে আজ।" বৌ ঘাড় নাড়ে। পাঁচু দাস আজ কয়েকমাস ধরে শয্যাগত। হাঁপানির টানটাও বেশী। দেখবার লোক একদম নেই। দোকান বন্ধ। পিয়ারী বিদেশে। পারুলবালাকে একাই সামলাতে হয়। রাধু মাঝে মাঝে বকুনি খায়। তখন চোখের জল নামে। রোজই মনে হয়, বুঝি পিয়ারী আজ আসবে। বনোয়ারীলাল গ্রামের স্কুলে বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা করছে, মনে হয় পড়াশুনায় ভালই হবে। সে এসে প্রশ্ন করত, "দাদা কবে আসবে, বৌদি?" রাধু কৌতুক করে জবাব দিত, "যে মাসে বিষ্যুৎবার নেই, ভাই।" বনো আবার প্রশ্ন করত, "সেটা কবে, বৌদি?" রাধু আর পারুলবালা তুজনেই হাসত, কোন উত্তর দিত না। বলে রাগ করে চলে যেত।

পাঁচুগোপালের অসুখটা ভালর দিকে নয়। রাধু তুপুরে বাবার শিয়রে বসে চোখ মোছে। সন্ধ্যায় বাড়ীর বাইরে গাছে একটা কুক্ পাখীর ডাক অশুভ মনে হয়। সমস্ত বাড়ীতে থম্থমে ভাব। গ্রামের কবিরাজ মথুরা-মোহন গুপ্ত দেখছেন, ওষুধও দিচ্ছেন।

পাঁচুগোপালকে আর চেনাই যায় না। সেই হাড় জিরজিরে চেহারায় পুরানো দিনের ঝাঁকড়া চুলের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়, সেই দৃপ্ত যুবককে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাক্স ঘাঁটলে এখনও তু'একটা রূপোর মেডেল সেই গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্যরূপে পাওয়া যাবে। সমস্ত গোপালগঞ্জে ফুটবল খেলায় নারানপুরের খুব নাম ডাক। বৃদ্ধরা উজানীর মাঠের সেই খেলার কথা এখনও ভোলেনি। তুই পক্ষই প্রবল। নারানপুরের সেণ্টার ফরোয়ার্ড পাঁচু ও লেফ্ট-ইন জ্যোতি রায়। জ্যোতির কাছ থেকে বল পেয়ে পাঁচু বিত্যুৎগতিতে এসে পড়ল প্রতিপক্ষের গোলের মুখে। বল ডান পায়ে, গোলকীপার ঝাঁপ দিতেই চক্ষের নিমেষে বল বাঁ পায়ে নিয়ে দড়াম করে গোলে মেরে দেয়। বল গোলের মধ্য দিয়ে পিছনের হিজল গাছের ডালে আঘাত করে। নারানপুরের সোল্লাস জয়ধ্বনি, উজানীর দলের মুখ চুন। সেদিন ফেরার পথে কি উল্লাস! কি সব দিন গেছে! এ সব গল্প রাধু, পিয়ারী ও সবাই জানে। সেই পাঁচু ওষুধ আর খেতে চায় না। বয়স হয়েছে, মেয়েটার গতি হয়েছে, এখন চোখ বুঁজলেই হয়।

পুজো এসে গেল। ১৯৩৫ সনের পুজো। কাঠামো তৈরী হচ্ছে, এরপরে বেনা বটা হবে। মজুমদার বাড়ীর কুমোর যাদব পাল নৌকা করে এসে গেল। একদিন এ গ্রামে থাকবে। একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাধুর মনটা খুশিতে ভরে যায়। উঠোনে রাশি রাশি শিশিরসিক্ত শিউলি ফুল ঝরে পড়েছে। শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। ছুটে গিয়ে কিছু ফুল দুহাতে কুড়িয়ে নেয়, আঃ কি মিষ্টি গন্ধ! চোখ বুঁজে গন্ধ নেয়, গালে ছোঁয়ায়, মন চলে যায় এক অচেনা, অদেখা দেশে যেখানে পিয়ারী-লাল থাকে। সে দেশটা কেমন? পিয়ারীও কি রোজ শুকতারা দেখে? বিপিন দাস এসে বলে, "মা, কিছু কাজ আছে?" পারুলবালা বলে, "তুমি ক'টা নারকেল পেড়ে দিয়ে যাও, পুজো আসছে। আর ঐ তেঁতুলের ডালটা কেটে রান্নার জন্য কিছু কাঠ ফেড়ে দিয়ে যাও।" বিপিন কাজে গেল, দুপুরে এখানে খাবে। বিপিনের বয়স প্রায় চল্লিশ, গরীব, বিয়ে-থা করেনি বলে সবার উপহাসের পাত্র। বিয়ের কথা বলে সবাই নানা কাজ করিয়ে নেয়। দুপুর নাগাদ বিপিন কুড়িটা নারকেল পেড়ে দিল। বনোকে খেলবার জন্য সোনালী নারকেলের মঞ্জরী এনে দিল। তেঁতুলগাছের ডাল কেটে কিছু কাঠ কেটে দিল।

মজুমদারদের কালিবাড়িতে তিনটে পাঁঠা পড়েছে। তাদের চাকর সজনী নৌকা করে বড় একবাটি প্রসাদ দিয়ে গেল। পারুলবালা সাবধান করে বলল, "বৌ, প্রসাদী মাংস, পেঁয়াজ দিওনা কিন্তু।" রাধু মাংস রাঁধল। বনোর মাংস দেখে মহানন্দ। "আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন, মা কলাপাতা কাটি।" বিপিন ওর আগ্রহ দেখে কলাপাতা কেটে আনে। পারুলবালার জন্য রান্না হয় মুগের ডাল, কচুর বৈ, ও রাঙ্গাআলু ভাজা।

তবু এ বাড়ীটাতে একটু আনন্দের ঢেউ এল। পারুলবালা ভাবে, এ সময় পিয়ারীটা এলে আরও আনন্দ হত। ছেলেটা কত দূরে থাকে, কত কষ্ট করে তাদের দুমুঠো খাওয়াবার জন্য। নইলে শুধু ভাগের ধানে কি আর সংসার চলত।

বিপিন খেয়ে কখন চলে গেছে। বনোরও খাওয়া শেষ। ক্ষুদিরামের বৌ দুটো পাথর বাটিতে মটরডাল, চালতের অম্বল আর কয়েকটা বকফুল ভাজা পারুলবালাকে দিয়ে গেল। ক্ষুদির বৌ মায়া আর রাধু দুজনে

সই। কাজের ফাঁকে সময় পেলেই দুজনে গল্পগুজব করে, বেতফল, ডউয়া একবাটিতে নুন, হলুদ, ঝাল দিয়ে মেখে বেতের ঝাঁপিতে মুখ বন্ধ করে ঝামিয়ে রসিয়ে খায়। মণ্টু এসে মায়াকে ডেকে নিয়ে যায়, বাবাকে ভাত দেবার জন্য।

পারুলবালার স্নান হয়ে গেছে, রাধুকে বলে স্নান করতে। রাধু বলে, "মা, দেখে যাও, মায়ার পিসী কি পাঠিয়েছে।" ভিজে কাপড়ে পারুলবালা হবিষ্যি ঘরে উঁকি মারে। রাধু ঢাকা তুলে দেখায়। পারুলবালা বলে, "আবার দেয়া কেন। ঐতো একার মত রান্না।" রাধু সব রান্না ঢেকে রেখে স্নান করতে গেল। পারুলবালা ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে।

ঘাটে গিয়ে রাধু কিছুক্ষণ পৈঠার উপর বসে জলের দিকে চেয়ে থাকে। কাকচক্ষুর মত জল, কতগুলি পুঁটিমাছ চেলামাছ খেলা করছে। মাছগুলি এক একবার কাৎ হচ্ছে, আর তাদের পিঠে রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্‌ করছে। ওপারের হিজল গাছটায় একটা নাল রঙের কাঠঠোক্‌রা ক্রমাগত ঠোক্‌রাচ্ছে, ঠক্‌···ঠক্‌···ঠক্‌ ··। পূববাংলার বর্ষা, গ্রামের রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেছে। এ বাড়ী ও বাড়ী যেতে হলে নৌকা ছাড়া গতি নেই। রয়না গাছটার ছায়ায় একটা ঘুঘু ডাকছে, ঘু-ঘু-ঘু। রাধু সামনে তাকিয়ে দেখে একখানা ছৈওয়ালা নৌকা আসছে এদিকে। ঘোমটা একটু টেনে দেয় সে, কোন বাড়ী যাচ্ছে নৌকা? নৌকার গলুই ঘুরতেই দেখা যায় ভেতরে পিয়ারীলাল। ওকে দেখতে পেয়েছে, পিয়ারী ডাকে, 'রাধু।' কোথায় রাধু। ঘটি ঘাটে রেখে পড়ি কি মরি করে ছুটল, কোথায় রইল কাপড়, কোথায় বা গামছা। হাঁফাতে হাঁফাতে পারুলবালাকে বলে, "মা, তোমার ছেলে এসেছে।" পারুলবালা ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছিল, ফেলে রেখে ঘাটের দিকে ছুটল। বনো ঘুমোচ্ছিল, রাধু গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ডাকে, "বনো, দাদা এসেছে, শীগ্‌গির ওঠো।" বনো ধড়মড় করে উঠে বসল। "উঃ ছাড়ো না, লাগছে যে। কৈ, দাদা কোথায়, ঘাটে?" সেও ছুটল ঘাটের দিকে। রাধু গিয়ে লক্ষ্মীর আসনে রাখা মা কালীর ফটোর সামনে ভক্তিভরে হাতজোড় করে প্রণাম করে, চোখে আনন্দাশ্রু।

পিয়ারী নৌকার ভাড়া মিটিয়ে ততক্ষণে পাড়ে এসেছে। পারুলবালা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "এত দেরী হল যে?" "দেরী কোথায়,

এইতো ছুটি পেলাম," পিয়ারী বনোকে কোলে তুলে নিয়ে বলে। মার হাতে তিনটে পোঁটলা দিয়ে নিজে স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে বাড়ীর দিকে এগোয়।

নারানপুরের আমিনবাড়ীতে আনন্দ এসেছে। পুজো এসে গেছে, ঠাকুর গড়াও শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। এর পরই প্রত্যেক বাড়ীর ঘাটে এসে এক একখানা করে নৌকা লাগবে, আর তা থেকে সানন্দে লাফিয়ে নামবে প্রবাসী ছেলেমেয়েরা। সব বাড়ীতে আনন্দের হাট বসবে, মা বৌদের মুখে হাসি উথলে উঠবে। বধূরা সলজ্জ, আনন্দস্মিত মুখে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে এঘর ওঘর করবে। ভাইয়েরা, ছেলেরা হাসবে, বাবা হাসবেন। শুধু কি এখানেই শেষ ? নদী, কাশবন, আকাশের ছেঁড়া মেঘ হাসবে, দাসদাসী, আত্মীয় পরিজন আনন্দে মুখর হবে ; এমন কি, মা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মহাদেব, অসুর পর্যন্ত মুখভরা হাসিতে উজ্জ্বল হবে।

কত কথা, কত খোশগল্প। ওবাড়ীর বাবুরা কলের গান এনেছে, কালো থালায় গান হয়। চৌধুরীদের বড়ছেলে পাখীর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্দুক কাঁধে, ঘোড়া টিপলে 'দ্রাম্' করে শব্দ হয়। বধূরা নতুন শাড়ী পরে পরস্পরকে বলবে, "কেমন দেখাচ্ছে, ভাই ?" ছোট ছেলে-মেয়েরা নতুন জুতো জামা পড়ে বলবে, "পায়ে ফোস্কা পড়েছে। একটু কাপড় দিয়ে দে না দিদি জুতোতে।" কলকাতার নলেন গুড়ের সন্দেশ এসেছে, রাজশাহীর রাঘবশাহী, বেলডাঙ্গার চম্‌চম্, উলুবেড়ের, আমতার পানতুয়া, আরও কত কি। ঢাক বাজবে, ডুমাডুম, তার সঙ্গে কাসি বাজবে, কাঁই না না, কাঁই না না……। মণ্ডপে মণ্ডপে গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ হবে। সেদিন চলে এল বাংলা দেশে। বাংলার প্রবাসী সন্তানেরা ঘরে ফিরতে ব্যস্ত। শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশনে ভীড়।

সবাই এল, কিন্তু লক্ষ্মী এল না এবারে।

খাওয়া দাওয়ার পরে সব খুলে খুলে যার যার জিনিস দিল। মার জন্য নরুনপাড়ের ধুতি, শ্বশুরের জন্যও ধুতি একখানা, বৌর জন্য এনেছে জড়ি-বসানো নীলাম্বরী, চুলের ফিতা, কাঁটা, সেমিজের কাপড়, গন্ধ তেল, পাউডার, স্নো। বনোর জন্য এনেছে প্যাণ্ট, শার্ট, জুতো ও লজেঞ্চ।

নিজের জন্য কিনেছে একখানা ধুতি আর পাঞ্জাবী। আর একটা পোঁটলা স্যুটকেস থেকে বেরোল। সকলের উৎসুক দৃষ্টি। খুলতে বেরোল মার জন্য কাঁথির কাজু বাদাম, কিসমিস, এক প্যাকেট ভাল ব্রুকবণ্ড চা আর কিছু সুজি।

এত জিনিস পারুলবালা জীবনে দেখেনি। রাধু আড়াল হতে বনোর হাত দিয়ে পান পাঠিয়ে দিল পিয়ারীর কাছে। বনো বলে, "মা, দাদু কি রকম বলেন, 'ও পারু, গুয়ো আচে, একটু পচা গুয়ো পালিও খাতাম'।" সতীশবাবুর স্বরটুকু অবিকল নকল, এমন কি খুলনার টানটুকু পর্যন্ত। পিয়ারী তো হেসেই খুন, বলে, "দেখছ মা, বনোটা কি দুষ্টু হয়েছে।" পারুলবালা হেসে বলে, "বৌ'র শেখানো সব।" ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে মা বলে, "বড্ড রোগা হয়ে গেছিস রে, আর গায়ের রং পুড়ে যেন কালো হয়ে গেছে।" পিয়ারী বলে, "যা খাটুনি, সকালে বেরুই, আর ফিরি সেই বিকেলে। তারপর খানাপুরি, বুঝারতের সময় লোকের সঙ্গে দিনরাত বকবক করা।" পারুলবালা বলে, "নৈহাটীতে কেমন আরামে ছিলুম, বাবা।" গ্রামের মেয়েদের কাছে নৈহাটীর অনেক গল্প করেছে। রায়দিঘীর কথাও বলেছে মাঝে মাঝে। তবে সে বড় নোনা দেশ, সব ফাঁকা ফাঁকা। খাবারদাবার ভাল পাওয়া যায় না। মেয়েরা শুনে অবাক। জল নোনা, সে আবার কি! কই এদিকে তো তেমন নয়। গল্প শুনে রাধুর ইচ্ছে হত, সেও স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যায়, দেশবিদেশ দেখে।

পিয়ারী বলে, "জান মা, কাঁথিতে 'বৈতাল' বলে কুমড়োকে। সেখানকার কথা তোমরা বুঝবেই না।" পারুলবালা হাঁ করে থাকে। পথের বর্ণনা, দেশের বর্ণনা, পিয়ারী অতিরঞ্জিত করে শোনায় দুই নারীকে চমক লাগাবার জন্য। সমুদ্রের কথা শুনে পারুলবালা বলে, "সে কত বড় হবে? আমাদের সিঙ্গিমারা বিলের চেয়ে বড়?" পিয়ারী হাসে, বলে, "আরো বড়।" পারুলবালা, সংশোধন করে জিজ্ঞেস করে, "কাজুলিয়াদিঘীর চেয়ে বড়? পিয়ারী বলে, "আরও অনেক বড়। সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না, না দেখলে। কী তার ঢেউ, ঐ তালগাছের সমান, আর তেমনি তার গর্জন।"

ওরা অবাক হয়ে শোনে। বিকেলে পিয়ারী রাধুকে নিয়ে শ্বশুরকে

দেখতে গেল। পাঁচুগোপালকে দেখে সে শিউরে উঠল। পাঁচুগোপাল তাকে দেখে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারল না। গ্রাম সুবাদে রাধুর পিসী, নাম বাতুলি, তিনি সব সময় দেখতেন। পিয়ারী শ্বশুরকে ধরে বালিশে হেলান দিয়ে দেয়।

পাঁচুগোপালের মুখ হর্ষোৎফুল্ল। অনেক কথা বলল, "তার আর কোন দুঃখ নেই জীবনে, রাধু সুখী হয়েছে, এই তার সুখ।। দম নিয়ে আবার বলতে সুরু করে "রাধু যখন খুব ছোট তখন ওর মা মারা যায়। সে আজ কতদিন। তারপর সেই মা মরা মেয়েকে বুকে বুকে রেখে দোকান করেছি, আজ এত বড় হয়েছে। তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয় সেটাও ওর মার ইচ্ছে ছিল, তাই হল শেষ পর্যন্ত। তুমি ওকে দেখো যেন মা মরা মেয়ে দুঃখ না পায়।" রাধু কাঁদতে থাকে, বাবার গায়ে হাত বুলোয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সে আর কতটুকু করতে পারে। কলকাতার সন্দেশ বাবাকে খাওয়াল, তারপর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এল।

পিয়ারীর মনে পড়ে এ পূজোর প্রায় একবছর পরে ১৯৩৬ সনের কথা। সেদিনটা ছিল ভাদ্রের পূর্ণিমা। সন্ধ্যা হতেই আকাশে থালার মত চাঁদ উঠেছে। কদিন ধরে পাঁচুগোপাল ভুল বকছিল। কবিরাজ মথুরা মোহন দুপুরে ওষুধ দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে গেছেন, "আজ রাতটা একটু সতর্ক থাকবেন।" রাধু এনে তার ছেলেকে দেখিয়ে নিয়ে গেছেন। এক-মাস আগে বুড়ো নাতির মুখ দেখেছে। পিয়ারীর দু একদিনের মধ্যেই আসবার কথা। সে এলে রাধু আর পারুলবালা হাতে একটু জোর পায়। বাতুলি পিসি মাঝে মাঝে একা বসে কাঁদে। আত্মীয়তা গ্রাম সুবাদে। বালবিধবা, পাঁচুগোপালকে দাদা বলে ডেকেছে, আর পাঁচুগোপালও ভালবাসে খুব। তখন এরকম মধুর সম্পর্ক বিরল ছিল না।

পারুলবালা অনেকক্ষণ ছিল বাড়াবাড়ি দেখে। ক্ষুদিরাম সে রাত্রে পাহারা দিতে রাজি হল। রাত বেড়ে চলেছে। রোগীর ঘরের বিপরীত দিকে অপর একখাটে ক্ষুদিরামের বিছানা। পিসী মাটিতে বিছানা পেতে শুয়েছে। ঘরে স্তিমিত আলো। অনেক রাতে, পাঁচুগোপাল একবার ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। তারপর জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল, চাঁদের দিকে। সবার তন্দ্রা এসেছে। ঘরে চাঁদের আলো আসছে। বাইরে

একটা স্বর্ণলতা আমগাছের উপর ঝুলছে। সব যেন ছায়া ছায়া। পাঁচুগোপালের মনে হচ্ছে রাধু যেন খুব ছোট হয়ে তার সামনে এসে ফোকলা মুখ নিয়ে হাসছে। 'ওকি মা, কলসিটা ফেলে দিস না, জল আছে। ফেলে দিলি পাগলী। কে রাধুর মা, এসেছ এতদিন পরে। কপালে একটু হাত দাওনা। তুমি চলে গেছ, আমার কত কষ্ট। আমায় নিয়ে যাবে চল। কিন্তু আমিতো উঠতে পারব না, হাত ধর, পারব…। চল।…

ঘরের মধ্যে হঠাৎ মেয়েদের চুড়ি আর লোহার শব্দ শুনে বাতুলি পিসী ধড়মড় করে উঠে বসে, দেখে পাঁচুর শিয়রে দাঁড়িয়ে রাধুর মা, পরনে লালপেড়ে শাড়ী, কপালে বড়করে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে শাখা। সে চিৎকার করে ওঠে, "বৌ"। ক্ষুদিরাম ধড়ফড় করে উঠে বসে, "কি, কি হয়েছে।" বাতুলি পিসী বলে, "যেন বৌকে দেখলাম, পাঁচুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, পরিষ্কার, যেই ডাকলাম।……

রাত তখন চারটে, ডাকাডাকি করে সবাইকে জাগান হল। মথুরা-মোহন এলেন, নাড়ী দেখে বললেন, "পাঁচু মারা গেছে।" পরদিন বিকেলেই তো সে এসে উপস্থিত।

* * * *

পিয়ারী ভাবে দুটো পুজোতে কত তফাৎ। পিণ্টু যে পুজোয় হল, সে বছরই নাতির মুখ দেখে শ্বশুর মারা যান। আর এ বছর পুজোয় কত আনন্দ উৎসব, তাকে নিয়ে। বুড়ো যেন মারা যাবার আগে জীবনটাকে চেখে চেখে উপভোগ করে গেছে। পিয়ারীর মনে হয় জীবনে পুজো-গুলোর হিসেব করলে দেখা যায় জীবনটা যেন সেদিনের, কত শীগ্গীর আমরা মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছি।

সেদিন দুপুরে পারুলবালা বনোকে নিয়ে পাঁচুগোপালকে দেখতে গেছে। পিয়ারী শুয়ে শুয়ে একটা পাসিংশো সিগ্রেট টানছে। মাথার কাছে বৌ বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। হঠাৎ সে একটা পাকাচুল বের করে আনল, "এই দ্যাখো গো, তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ।" পিয়ারী দেখে সত্যিই তো, একটা চুল পেকেছে। রাধু খুঁজে খুঁজে আরও চারটে তুলল। মনটা পিয়ারীর খারাপ হয়ে যায়, 'তা হলে এর মধ্যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।'

রাধু বলে, "ও অনেক সময় পাকে গো। আমার বাবা যখন বিয়ে করতে যান, শুনেছি, তার মাথায় চুল অর্ধেকই তখন পেকে গেছে।" পিয়ারীর মনটা একটু হাল্কা হল যেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বিছানায় এসে উঠেছে, তখনও রাধুর কাজ শেষ হয়নি। সকলে শুলে, একটা টিনের প্লেটে পান নিয়ে, রাধু ঘরে ঢুকে মাথার কাপড় ফেলে, পানটা পিয়ারীর হাতে দিয়ে বলল, "কি, মশারী ফেলনি যে।" "ওতো তোমার কাজ," পিয়ারী পান চিবুতে চিবুতে জবাব দেয়। "আমি পারব না এই আমি শুলাম," বলে রাধু নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে। অগত্যা পিয়ারীকে উঠে দরজা বন্ধ করে, চৌকির তলা দেখে, মশারী ফেলে আবার আলো নিভিয়ে শুতে হয়। রাধু শুয়েই চোখ বুজেছে, কোন কথা নেই। পিয়ারী পাখা নাড়তে নাড়তে বলে, "ঐদিকে জানালার ধারে, ঐ নিমগাছটার ওপরে ও কিরে বাবা। বড় বড় চোখ, লম্বা হাত।"

চকিতে সরে এসে রাধু, স্বামীর বুকের মধ্যে লুকোয়। পিয়ারী বলে, "আচ্ছা তুমি এত রাত করে শুতে আস কেন।" রাধু হাসে, বলে, "বারে আমার কাজ শেষ হবে তবে তো আসব, আমার বুঝি লজ্জা করে না।"

পিয়ারী বলে, "লজ্জা কেন।"

"ধ্যেৎ"

"বেশ তাহলে আমিও কাল হতে রাত করে ফিরব," বলে পিয়ারী রাগ করে পাশ ফিরে শোয়।" রাধু বলে, "ওদিকে বেশী যেও না, পূবের জানালার ওপর একটা কাঁকড়াবিছে দেখেছিলাম, বিকেলে।" পিয়ারী ভয় পেয়ে সরে আসতেই রাধু দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, "কেমন, এখন যাওতো।" পিয়ারী বুঝল রাধু ভয় দেখিয়ে ভয় দেখানোর শোধ নিলে। দুজনে গল্প সুরু করল। সে গল্প রাজপুত্রের নয়, মন্ত্রীপুত্রের নয়, তেপান্তরের মাঠের নয়, কিচ্ছু নয়। সে গল্প শুধু অবান্তর, অর্থহীন কথা, ছেলেমানুষি হাসির ছর্‌রা। রাধু এক সময় স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে, "আচ্ছা আমি যদি মরে যাই।"

পিয়ারী বলে, "দূর, তাহলে আমিও মরে যাব।"

"ধ্যেৎ, তা কেন, তুমি আর একটা অল্পবয়েসী মেয়ে দেখে বিয়ে করবে।"

"কখখনো না।"

রাধু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, "নিশ্চয়ই করবে।" অগত্যা পিয়ারী বলে, "তাহলে করব।"

রাধু রাগ করে সরে গেল, "তোমরা পুরুষরা সবই পার। তোমাদের ভালবাসা যেন মুসলমানের মুর্গি পোষা।" পিয়ারী কথা পাল্টে বলে, "শোন, আমাদের এক আমিন বন্ধু কাজের জায়গায় তার বৌকে নিয়ে গেছিল। তুমি যাবে?" রাধুর রাগ এক মুহূর্তে জল। বলে, "হ্যাঁ যাব, যাব। কিন্তু বাবা, মা এদের কি হবে?" পিয়ারী হাতের পাতা উল্টে বলে, "তাহলে তো যাওয়া চলে না। তুমি থাকো, আমি একাই যাব।"

"ইস্, আমি যাবই তোমার সঙ্গে." রাধু জেদ করে।

এমনি করে তারা কথা বলে চলে, রাতও বেড়ে যায়। এক সময় জল খেতে উঠে পিয়ারী বলে, "ইস্, রাত প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘুমোও।"

দুজনে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোনর চেষ্টা করে। রাধু একবার চোখ খুলে কাকুতি করে বলে, "আমায় খুব ভোরে উঠিয়ে দিও। বেলায় উঠলে মা বকবেন।"

পিয়ারী শয়তানি হাসি হেসে চোখ বন্ধ করে।

গ্রামের পূজো মহা আনন্দের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এরপর জীবনে যত পূজো এসেছে, দারিদ্র্যভারগ্রস্ত, মা-স্ত্রী-পুত্র উৎপীড়িত হয়ে সে কখনও পূজোর আনন্দ ভাল করে উপভোগ করতে পারেনি। সংসার কেবল তার দাবীই মিটিয়ে নিয়েছে, তার কাছ হতে। পরিবর্তে দিয়েছে দুশ্চিন্তা আর বার্ধক্য। কার্তিক মাস সুরু হয়েছে। একটু শীতের আমেজ যেন পড়েছে। লেপগুলো বার করে রোদে দিচ্ছে পিয়ারী, এমনি সময় ক্ষুদিরাম ডাকে, "পিয়ারী শোন।" পিয়ারী এগিয়ে গেল। ক্ষুদি বলে, "বিপিনকে বিয়ে দেব।" পিয়ারীতো অবাক, "বলে, কার সঙ্গে?" ক্ষুদি বলে, "রাত্তে দেখবি, চক্রবর্তী বাড়ী যাস।" সন্ধ্যার পরে চক্রবর্তীদের বাড়ীর বৈঠক-খানায় যেতেই দেখে, সেখানে গ্রামের প্রায় সকল যুবকই উপস্থিত। বিপিনকে সাজানো হয়েছে বর বেশে। গলায় ফুলের মালা, মাথায় টোপর। শ্রীমান বিপিনচন্দ্র মিটিমিটি হাসছে। শুধু ক্ষুদিরামই আসেনি।

কিছুক্ষণ পরে শাড়িপড়া বৌ, মাথায় টোপর, ঘোমটা দেওয়া, নিয়ে এল 'বিশ্বনাথবাবুর ছোট ছেলে নির্মল। একজন শাঁখ বাজাল।

কোটালিপাড়ার ছোকরা পুরুত বলে, "এইতো মেয়ে হাজির, এবার টাকা দাও বিপিন।" বিপিন তো মহাখুশি, সে ছুটো টাকা বার করে দিল কোমর হতে। পিয়ারী ভাবল, যাক, বিপিনের বিয়ের সাধ মিটল, এতদিনে। কিন্তু মেয়েটি কার·· ?

আতপ চাল, ফুল ছড়িয়ে ওম্ ওম্ বলে বিয়ে হল। শুভদৃষ্টির সময় বিপিনের তো চক্ষুস্থির। ও কে রে বাবা, এ যে ক্ষুদি, বড় গোঁফ নিয়ে ঘোমটার মধ্য দিয়ে তাব দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। পিয়ারী প্রথমটা বুঝতে পারেনি। তারপর যখন বিপিন রেগে বধূর ঘোমটা একটানে খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠেছে তখন দেখে বধূ আর কেউ নয় ক্ষুদিরাম। ঘর তখন ফাঁকা। বিপিনের হাতে ধরা ক্ষুদির শাড়ী, সে ঘুসি তুলেছে মারবে বলে। ক্ষুদি প্রাণভয়ে শাড়ী ছেড়ে, আণ্ডার-প্যাণ্ট পরেই উধাও। হাসতে হাসতে পিয়ারীর খিল ধরে গেছে পেটে, সেও সবে পড়ে একদিকে। তার চিৎকারে বিশ্বনাথবাবু এসে দেখেন বিপিন গলায় মালা, গায়ে বিয়ের সাজ, প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। সামনে ছুটো টোপর, শঙ্খ, শাড়ী, ঘরময় ফুল আতপ চাল ছড়ান।

বিশ্বনাথবাবুকে দেখে বিপিন হুঁহুঁ করে কেঁদে ফেলে, বলে, "দেখুন প্রেসিডেণ্ট বাবু, আমাকে বিয়ে দেবে বলে, সবাই ছুটাকা নিয়েছে। আর ক্ষুদিকে মেয়ে সাজিয়ে এনে,···কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। বিশ্বনাথবাবু বলেন, "বেরোও হারামজাদা, আমার বাড়ী থেকে। তোমাকে বিয়ে দেব বল্লেই, তুমি নাচতে নাচতে আসবে ? বেরোও।" প্রেসিডেণ্ট-বাবুর আঙ্গুলের ইসারায় বিপিন ঘব হতে বেরিয়ে যায়, তার ভাঙ্গা গালের ওপর দিয়ে তখন অজস্র জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

একদিন মা পায়েস পিঠে করল। পিয়ারী আর বনো খেল পেটভরে। নতুন রস উঠেছে, সকালে সেই রস বনো, প্যাকাটী দিয়ে চুষে খায়। বলে "দাদা, রস খেলে আরও শীত করে।"

পিয়ারীর আজ এই বয়সে মনে হয়, সেই দিনগুলিকে মা যেন ভরে দিতে চেয়েছিল আন্তরিকতায় আর স্নেহে, রাধু ভালবাসার নিবিড়তায়, বনো আবদারের মায়ায়। আর সে নিজে ? সে নিজে তাদের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আনন্দ রস পান করেছে। কিন্তু

পিয়ারী জানে না, তার অবচেতন মনকে আরও মাধুর্যরসে ভরে দিয়েছে, জন্মস্থানের বট, অশথ, আশশ্যাওড়া, আম, কাঁঠাল, জাম, হিজল, পলাশ প্রভৃতি গাছের বন, গ্রামের শেষের বেনুবন, পূর্বপ্রান্তের কালিবাড়ী, সকাল সন্ধ্যার আকাশ, ঝিল্লিমুখর ঘুঘু ডাকা দুপুর, আর দেশের পরিচিত আত্মীয়তামাখা মুখগুলি। তাদের মায়া যেন শেষ হতে চায় না। জল অবগাহন কামনা করে, মাটি দুহাতে আদর করে ডাকে, আয় ফিরে আয় যাসনে।—দিন কেটে যায়, বিদায়ের দিন এগিয়ে আসে। রাধু গোণে, আর দশদিন বাকি, নদিন, আটদিন, সাতদিন……। ভাবে, আর দুটো দিন ধরে রাখা যায় না ?

কিন্তু মানুষকে কেউ কি ধরে রাখতে পারে ? কোন অদৃশ্য টানে মানুষ ঘুরে বেড়ায়, দৃশ্য পরিবর্তন হয়, মানুষের রূপ পরিবর্তন হয়। সেই তো তার অদৃষ্ট। জমির শ্রেণী পাল্টায়, কিন্তু পাল্টায়না মানুষের ভাগ্য। যেখানে গিয়েই ওপরে তাকাও, দেখবে সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, একই তারার মালা তোমার মাথার উপর অন্ধকারের মধ্যে ঝক্‌মক্‌ করছে। রায়দিঘি, নারানপুর, কাঁথি বারুইপুর, ময়মনসিং, যেখানেই যাও, সব আকাশেই তারা তোমার মাথার উপর তীব্রদৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের হাত থেকে নিস্তার নেই।

রওনা হবার মাত্র দুদিন আগে, মেদিনীপুর হতে চিঠি এল, এই মর্মে যে তার চাকরী আর রইল না, এসম্পর্কে পরে জানান হবে। চিঠি দিয়েছে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার। এটা তখনকার দিনের একটা কৌশল মাত্র ছিল। এ দুমাস আর মাইনে দেওয়া কেন আমিনদের। যে যাওয়ার দুঃখে বাড়ীর সবাই কাতর, এখন চাকরী নেই, যেতে হবে না শুনে সবাই মুষড়ে পড়ল। যাওয়াই যেন ভাল ছিল। স্বাধীনতার পরে সেট্‌লমেণ্টে এরকম আর নেই ; এখন আমিনরা মাস মাইনে পায়, বছরে বছরে ইনক্রিমেণ্ট হয়ে চাকরীর উন্নতির ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক সুব্যবস্থাও হয়েছে। সেট্‌ল-মেণ্টের গরীব কর্মচারীদের উন্নতির আর একটা মূল কারণ ছিল, পরে খাদ্যদপ্তর হতে সব রকম লোকের এ বিভাগে আমদানি। তারা এসে শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়ে তোলে। চকচকে চেহারার কানুনগো, আমিন, খাঁচমুহুরিরা এসে জরীপ বিভাগের ভোলই পালটে দেয়। চাটাই মাদুর

উঠে যায়, চেয়ার টেবিল তৈরী হয়। কিন্তু আমিনদের দিকে তাকিয়ে সে নিরাশই হয়েছে, ওরকম ধোপদুরস্ত প্যান্ট পরা, পরিশ্রম কাতর, ম্যাট্রিক আই এ পাশ যুবক কখনও কিস্তোয়ার করতে পারে, রোদে, বৃষ্টিতে ?

* * * *

মেদিনীপুরের চিঠি পাবার পর পিয়ারী কদিন বোকা হয়ে বসে রইল। তার মনে হতে লাগল, যেন সে চুরি করেছে। কারুর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না। ছেলের রকম সকম দেখে পারুলবালা বলে, "ওতে মুষড়ে পড়ার কি হয়েছে। গ্রামের দু একটা কাজ ধর, এর মধ্যে চিঠি আসবে।" পিয়ারী কদিন পরে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, সবার বাড়ী যায়, কাজ আছে কিনা খোঁজ করতে। মজুমদারদের বাড়ীর সীমানা ঠিক করার জন্য একটা ফরমাস পেল। কাজ শেষ হলে পাবে দশ টাকা।

মুশকিল হল চেন নেই। ডিভাইডার স্কেল নেই। একটা দড়ি বাইশ গজ মেপে, একশো ভাগে ভাগ করে নেয়া যাক, এটা দিয়ে চেনের কাজ চলবে। অসুবিধের কথা মাকে বলতেই, সে মতিলালের পুরানো ট্রাঙ্ক খুলল, সেও তো অনেক জরীপ করত, গ্রাম্য বিবাদের ফয়সালা করত। ট্রাঙ্ক খুলতে মিলল একটা জড়ান ফিতা, মজুমদার-চৌধুরী বাড়ীর খতিয়ানের নকল আর সব নীচে কাগজে মোড়া একটা ষোল ইঞ্চি মেটাল স্কেল, গুনিয়া ও একটা ডিভাইডার। পিয়ারীতো আনন্দে দিশাহারা। বাবার জিনিস, এতো মস্ত এক আশীর্বাদ। কাজ সুরু করল, অগ্রহায়ণ মাসে পঞ্চাশ টাকা আয়! ভাল আয়, রাধুর আনন্দ আর ধরেনা। বিদ্যে থাকলে মানুষের চিন্তা কি। পারুলবালা মা লক্ষ্মীকে নমস্কার করে, 'সব তোমার ইচ্ছে মা।' পিয়ারী বড় আমিন হয়ে তার বাবার মুখ রেখেছে। বাড়ীতে ছোটখাট ভীড় লেগেছে। এর খতিয়ানটা বলে দাও, ওকে জমির সীমানা মেপে দাও। বেশ আয়ও হতে থাকে।

একদিন চক্রবর্তী বাড়ী হতে ডাক এল। সে যেতেই বিশ্বনাথবাবু বললেন, "আমার জমিজমাগুলো সব ঠিক করে দাও, একটা অর্বাচীন লোক রেখেছি, কিছু বোঝেনা।" পিয়ারীর মনে জেগে উঠল পূর্বের এক স্মৃতি, অপমানকর উক্তি। এ[illegible] ভাবল, বলে, সে পারবে না। কিন্তু তার শান্ত রক্ত, তার আমিনী অভিজ্ঞতা তাকে নিষেধ করল, মানীর মান

নষ্ট করল না। পিয়ারী বাড়ী, গোয়াল, উঠোন, পুকুর, সব মেপে ঠিক করল। তারপর ধানের খাস জমিগুলি হিসেব করে আলাদা করে ফেলল। প্রজা বিলি জমির হিসেবের সময়, ছুটো দাগ যা প্রজারা চাষ করছে, অথচ মালিকের খাস, এরকম ভুল বের করে, বিশ্বনাথবাবুকে বুঝিয়ে দিতে তিনি খুশি হলেন। মোট জমি মিলে গেল। পিয়ারীকে দুটি দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "সামনের মাপের সময়, তোমাকে ডাকব।"

পৌষের মাঝামাঝি অর্থাৎ ইংরিজি ডিসেম্বর প্রায় যায় যায়। ১৯৩৬ সন সামনে। পিয়ারী সেদিন পাঁচুদাসকে দেখে ফিরছিল, এমনি সময় এক সুদর্শন সাইকেল আরোহী জিজ্ঞেস করলেন, "জ্ঞানদা চক্রবর্তীর বাড়ী কোনদিকে?" পিয়ারী জিজ্ঞেস করে, "আপনি কোত্থেকে আসছেন ? "ফরিদপুর হতে, আমি ও বাড়ির জামাই," ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। পিয়ারী দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক চলে গেলেন। পিয়ারী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, এই তাহলে লক্ষ্মীর জামাই। পরে শুনেছিল লক্ষ্মীর বর ফরিদপুরে বদলী হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মী এবার পূজোয় এলনা কেন ? কারণ সে অনেক পরে জানতে পেরেছিল।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সেট্‌লমেন্ট অফিসার হার্টলি সাহেবের চিঠি এল, তাতে তার নিয়োগ পত্র, 'অবিলম্বে দিনাজপুরের সেট্‌লমেণ্টে যোগদান কর।' বাড়ীতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল। মা ও রাধু গিয়ে কালিবাড়ীতে পুজো দিয়ে এল। রাধুর মুখে গৌরবের হাসি ফুটল। খাবার আগের দিন স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে সে বলল, "একটা কথা বলব ?" পিয়ারী বলে, "বল"। লাজরক্তিম মুখে রাধু ফিস্ ফিস্ করে বলে কানে কানে কি গোপন এক কথা।

পিয়ারী লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, বলে, "যাঃ।" রাধু বলে "দেখো।"

পিয়ারী প্রশ্ন করে, "মা জানেন ?"

"কি করে জানবেন ?" আরও ঘন হয়ে এসে রাধু জবাব দেয়। পিয়ারী দেখে রাধুর গালে, মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা। সে অবাক হয়ে ভাবে তার জীবনে এও কি সম্ভব। রাধুকে সে বলে, "একথা কিন্তু কাউকে বলনা, ছি, ছি, জানতে পারলে ভারি লজ্জার কথা হবে।"

রাধু বলে, "গোপন রাখলেই তো আর গোপন থাকবে না। পিয়ারী আরও লজ্জা পায়, ভাবে, তাইতো, তাহলে ?"

## দশম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

১৩৩৬ সন। চৈত্রের রোদ্দুর আগুন ছড়াচ্ছে। ভোরের শিশির-বিন্দু গাছের পাতা, ঘাস হতে একটু পরেই মিলিয়ে যাবে। দুটি হাতি আসছে হেলতে দুলতে, একটিতে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হার্টলি সাহেব, আর একটিতে কানুনগো গোকুল চন্দ্র বসাক। স্থানটি হল ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাণীসঙ্কাইল থানা। রাস্তা দিয়ে এসে সোজা কাশীপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নামেন তাঁরা। আর তখনই সমস্ত গ্রামের লোকেরা হৈ হৈ করতে করতে হাতে লাঠি, বল্লম, দা ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের তাড়া করল। অধিকাংশই পালিয়া. রাজবংশী ও মুসলমান। গোকুলবাবু পেছনের হাতি হতে প্রাণপণে চিৎকার করছেন, "এই, হাকিম আছেন, হল্লা কর না।" কে কার কথা শোনে, হল্লা এগিয়ে আসতে থাকে। সাহেব একটু আশ্চর্য হন। একটু নার্ভাসও হয়ে পড়েন, স্বদেশী-ওয়ালা কেউ নেই তো ? মাঠে কি চাষ হয়েছে ? তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই তাই, কিন্তু বোঝা যায় না তো। হঠাৎ কি যেন হল। লোকগুলো একটু থমকে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে ছুটে পালাতে লাগল। তাকিয়ে দেখেন, গ্রামের চৌকিদার লাঠি হাতে তাদের তাড়া করেছে। চৌকিদারকে ওরা খুব ভয় করে। কারণ গ্রামে সেই বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি, জেলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা তার আছে। চৌকিদার হাতির পিঠে সাহেব দেখেই বুঝেছে কেউকেটা কেউ হবে। তাই লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে। হার্টলি সাহেব তো হেসেই খুন। আশ্চর্য, আই-সি-এস সাহেব অফিসারকে ভয় করে না, আর চৌকিদারকে ভয় !

সাহেব নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসে কাশীপুরে শুনলেন, আমিন পিয়ারী আর মতিউদ্দিন মাঠে গেছে। কাজ হচ্ছে জগদল মৌজায়। মাইলখানেক কি দেড়মাইল পথ। তাঁরা হাতি ক্যাম্পে বেঁধে রেখে হেঁটে চললেন।

দিনাজপুরে আকাশ হতে ফটো তুলে কিস্তোয়ার কাজ সংক্ষেপিত হয়েছে, জঙ্গলের কতগুলো সীট ছাড়া। নাগর নদী, এপারে বেশ জঙ্গল। রাত্রে বাঘের দেখা মেলে। নদীর ওপারেই বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিষেণগঞ্জ মহকুমার গ্রাম গোয়ালিনি, কাঁকড়াদহ, ইত্যাদি। ওপার হতে রাস্তা দেবীগঞ্জ, পুনিচুকুলির খাল, লোধন, সয়বানী নদী হয়ে কিষেণগঞ্জের পথে পাড়ি দিয়েছে। হার্টলি সাহেবের সঙ্গে পিয়ারীর এই প্রথম সাক্ষাৎকার। সে মাথা ঘাড়, পিঠ ভেঙ্গে প্রায় ময়ূর হয়ে করযোড়ে নমস্কার করল। গোকুলবাবু তো থরহরি কম্পমান। সাহেব যদি কিছু ভুল বার করে বসেন, তার উপর সার্কেল অফিসার গাঙ্গুলী সাহেব নেই। এ আমিনটি নতুন। সাহেব বলেন, "কাজ করে যান, আমি দেখছি।" পিয়ারী অফসেট নিয়েছিল সেগুলি ফিল্ডবুক্ হতে ম্যাপে প্লট করে চলল। চেন পিওন নিশান দিতে গিয়েছিল, সে ফিরে এলে, আবার কাজ সুরু হল। সাহেব কিছুক্ষণ কাজ দেখলেন, নিজে দুটো একটা প্লট চেক করলেন, তারপর বললেন,"ডিভাইডারটা ঢিলে হয়ে গেছে, একটা নতুন নেবেন।" সাহেব চলে গেলেন মতিউদ্দিন যেদিকে কাজ করছে, সেদিকে। সাহেব অন্তর্ধান হতে, পিয়ারীলাল গাছের আড়ালে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

কাশীপুরে পিয়ারীর একটুও ভাল লাগেনি। এখানে না আছে একটা পোষ্টঅফিস না আছে কিছু। লোকগুলোর কথায় কেমন বিহারী টান। কিছু সাঁওতালও আছে। স্থানীয় লোকেরা প্রায় সবাই পালিয়া। পুরুষেরা পরে লেংটি, মেয়েরা একটা কাপড় বুকের কাছে পরে, সেইটাই সব। সপ্তাহে দুবার হাট, তাতেই যা জিনিস মিলত। কানুনগো সাহেব থাকতেন, আরও দূরে রাণীসঙ্কাইলে। জীবনে অনেক অফিসার, কানুনগো, সার্কেল অফিসার সে দেখেছে, কিন্তু গোকুলবাবুর মতন এমন মজার কানুনগো সে খুব কমই দেখেছে। সে কথা মনে করলে পিয়ারীর আজও হাসি পায়। একদিন গোকুলবাবু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করল, 'দেখুন তো বাবু, কটা বাজে?' গোকুলবাবু কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, "বলব ক্যানো, ঘড়িতো আর তোমার জন্য কেনা হয়নি।" লোকটা তো অপদস্তের একশেষ।

সেবারে খবর হল চার্জ অফিসার আসবেন। বেল সাহেব তখন চার্জ

অফিসার। গোকুলবাবু তো ফুলপ্যান্ট পরে তৈরী। এমন সময় একজন বৃদ্ধ আমিন, রসিকবাবু বললেন, "স্যার, চার্জ অফিসার, সার্কেল অফিসার আসবেন হাফপ্যান্ট পরে, আপনি পরলেন ফুলপ্যান্ট?" গোকুলচন্দ্র ঘাবড়ে গেলেন, "অ্যাঁ তাইতো, আমি কি করি এখন? সময়তো নেই। হাফপ্যান্ট তো আমার নেই। আপনার আছে আমিনবাবু? গেল, গেল, চাকরী গেল।" বৃদ্ধ আমিনবাবু মাথা নাড়েন, "না স্যার, আমিতো পরি না।" হঠাৎ খেয়াল হল, থানার বড়বাবুর ছেলে তো হাফপ্যান্ট পরে। গোকুলবাবু ছুটে গেলেন। ছেলেটি বলল, আমার তো হাফপ্যান্ট আছে, কিন্তু খাকীটা তো ময়লা।" মিলল, মিলল, অবশেষে খুঁজেপেতে পুরানো পুঁটলির ভেতর হতে। ওদিকে মাঠের প্রান্তে তখন সাহেবদের হাতি দুটো দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে হাফপ্যান্ট পরলেন, তাও কি কোমরে ওঠে। পিয়ারী এর মধ্যে এসেছে সীট নিয়ে। সে আর রসিকবাবু টেনে জোর করে কোমরে তুলল। কানুনগো সাহেব বল্লেন,"ব্যস, হয়েছে। দেখি মাথাটা আঁচড়ে নিই। আপনারা যান সীট বার করুন। যান, যান।" সাহেব দৌড়ে মাথাটা আচড়ে নেন।" চার্জ অফিসার, সার্কেল অফিসার নামলেন। গোকুলবাবু এসে বেল সাহেবকে নমস্কার করতেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন, "লুক্ গাঙ্গুলী, কানুনগো কি পরেছে। হা, হা……। গাঙ্গুলী সাহেব তীব্র কণ্ঠে বললেন, "আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? প্যান্ট কি রকম পরেছেন?" সকলে তাকিয়ে দেখে তাড়াতাড়িতে প্যান্ট তিনি উল্টো পরেছেন। আর প্যান্টের পকেট দুটো পাঠার কানের মত ঝুলছে। বোতামগুলি সব খোলা।"

বিড়ি ফেলে দিয়ে পিয়ারী আবার কাজ সুরু করে। সাহেবের ইনস্পেকশান ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে। পিয়ারীর মনে অসম্ভবের স্বপ্ন উঁকি দেয়। সাহেব খুশি হয়ে বলছেন, 'তুমার নাম পিয়ারী? আমি তোমার নাম ফকাস সাহেব, কার্টার সাহেবের কাছে শুনেছি। তুমি গুড আমিন আছে, এই নাও একশো টাকা নাও। সবাই অবাক হয়ে যায়।'

স্বপ্ন মিলিয়ে যায়, দূরে মতিউদ্দিন আসছে। ওর সীটেও ইনস্পেকশান শেষ হয়ে গেছে। সেও খাড়ুকে বলল, "টেবিল তোল।" খাড়ুর বাড়ী কিষেণগঞ্জ শহরে, এখানে এসে ওকে যোগাড় করা হয়েছে। ও

টেবিল কাঁধে তুলল। মতিউদ্দিনের কাছে খবর পেল, সাহেবরা আজ জমিদার বাড়ী থাকবেন। বিকেলে রওনা হবেন ঠাকুরগাঁর দিকে। মতিউদ্দিন বলে, 'দেখ কেমন মাছ কিনেছি সস্তায়।' ঝাড়নে বাঁধা কয়েকটা সিঙ্গি মাগুর দেখাল, দাম বলল এক পয়সা। পিয়ারী বলে, "আমায় একটা দে, আমার মাছ নেই আজ।" মতিউদ্দিন দুটো মাছ ওকে দিয়ে দিল, কালতো হাটবার, কোন চিন্তা নেই। তারা হাঁটতে থাকে।

বৈশাখের এক রাত্রে কানুনগো সাহেব খবর দিলেন, কাল তিনি আসবেন ইন্‌স্‌পেকশানে, সুতরাং তারা যেন তৈরী থাকে। মতিউদ্দিন এক মুসলমানবাড়ী থাকে, তাকেও যেন খবর দেওয়া হয়। তাকেও খবর দিল খাড়ু। যে আর্দালী এসেছিল, সে আর রাত্রে ফিরে গেল না। আর্দালীর নাম মধু মণ্ডল, বাড়ী বাঁকুড়ায়। এ অঞ্চলে এসে সে ভয়ে ভয়ে আছে। রাতের আঁধারে বাইরে যেতে চায় না, যদি বাঘে ধরে নিয়ে যায়। তাছাড়া বিষাক্ত সব সাপ আছে, বুনো শুয়োর আছে। বাড়ী ছেড়ে অবধি মধু সর্বদা তটস্থ। অবশ্য আরও ভয়ের জিনিস আছে, বুনোশুয়োর, ভূত, প্রেত সাহেব অফিসাররা, কোনটাই কম মারাত্মক নয়।

রাত্রে পিয়ারী মুর্গি মেরে রান্না চাপালো, মুর্গি এখানে ভারি সস্তা। আর্দালী হোক যাই হোক সাহেবের লোক তো। ওদের তুষ্ট রাখতে হয়। চেন পিওন খাড়ু নুন আনতে গিয়েছে সামনের বাড়ীতে। মাংসের গন্ধে খড়ের ঘরখানা ভরপুর। পিয়ারী কাঠ ঠেলছে উনুনে। কুপীর নিস্প্রভ আলোয় মুখগুলি লাল লাল অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মধু পিয়ারীর সঙ্গে গল্প করছে। মধু বলে, "আরে আমিনদা, সাহেবটা একদম পাগলা, কোন জ্ঞান নেই। কি বলে, কি করে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।" পিয়ারী কোন উত্তর করে না। উত্তর দেওয়া বিপদ জনক, কারণ মধু হয়তো নিজের কথা এবং তার উত্তর সবটুকুই লাগিয়ে দেবে সাহেবের কানে তার নাম করে। মধু বলে চলেছে, "এই সেদিন সাহেব একটা মুর্গি কিনে এনেছে সার্কেল অফিসারকে খাওয়াবে বলে। সার্কেল অফিসার আসবার কথা। বেশ একসের তিনপো মুর্গি। মুর্গিটাকে বেঁধে রেখেছি।" খাড়ু নুন নিয়ে ফিরে এসেছে। পিয়ারী মাংসের মধ্যে নুন দিতে দিতে বলে, "তারপর?"

"তারপর সার্কেল অফিসার তো এলেন সন্ধ্যায়। বললেন, মুর্গিটা কেটে

রান্না কর।” পিয়ারীর মাংস রান্না হল। খাড়ু জায়গা ঠিক করে ভাত বেড়ে দিল।

মধু বলে চলে, “যেই দড়ি খুলেছি, অমনি মুর্গি এক ঝাপটায় বড় আমগাছটার উঁচু ডালে গিয়ে উঠল। আর নামেনা।” পিয়ারী আর খাড়ু দুজনে হেসে ফেলে। জিজ্ঞেস করে “তারপর?” মধু বলে, “তারপর সাহেবের কি রাগ, মারেন আর কি। দুবার ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এলেন। শেষে সার্কেল অফিসার আটকান। সে মুর্গি আর সে রাত্রে নামলই না, আর একটা মুর্গি অনেক কষ্টে জোগাড় করে এনে কাটি।”

পিয়ারী খেতে খেতে বলে, “তারপর কি হল? মধু বলে, “ভাই, সাহেবটা সেই হতে আমায় মুর্গেশ বলে ডাকেন।” পিয়ারী হো হো করে হাসতে থাকে। খাওয়া হলে খাড়ু আর মধু থালা ধুয়ে আনল কাঁচা কুয়োর জলে। খুব ভোরে মধু রাণীসঙ্কাইল চলে গেল, সাহেব চা খেয়ে রওনা হবেন।

পিয়ারী মাঠে কাজ স্নুরু করল। যাবার আগে, চেনটাকে ঘরের বাইরে বাইশ গজ মাপে দুটো খুঁটো পোতা ছিল, তার সঙ্গে মেলাল। দেখল, না চেন ঠিকই আছে, বাড়েনি। দিনাজপুরে আকাশ হতে এরোপ্লেনে করে মাঠের ফটো নিয়ে সীট তৈরী হয়েছে। মাঠে সেগুলি পরতাল দিয়ে চেক করে তবে কাজ হয়েছে। পিয়ারীর এদিকটা ঘন জঙ্গল পড়ায় তাকে পি-৭০ সীটে কাজ করতে হয়েছে, কারণ জঙ্গলের ভেতরের প্রতিটি প্লটের চেহারা আকাশ হতে ফটোতে ধরা পড়েনি, যেমন পড়েছে মাঠের ধানের জমিগুলির। এই সীটে মাত্র দুটো মোরব্বা বাকী। খাড়ু গিয়ে সিকমী লাইনের শেষে নিশান দিয়ে এল। একটু একটু রোদ্দুর উঠছে, আকাশ নির্মেঘ, দূরে হিমালয়ের গাঢ় নীল রেখা, তার ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ দেখা যাচ্ছে।

পিয়ারী একমনে কাজ করে চলল। টেবিল এগিয়ে চলেছে অল্প অল্প করে। পিয়ারী নিশানার দিকে অপটিক্যাল প্রিজম ধরে, এক চোখে নলের ছায়া, নিশানের ছায়া ঐ প্রিজমের মধ্যে মেলাচ্ছে। ঠিক হলে খাড়ু কোদাল দিয়ে আলের ওপর একটা কোপ মেরে বাঁশের নল মেপে বলছে, ‘আশি লিঙ্ক্।” পিয়ারী বাঁহাতে ধরা ফিল্ডবুকে টুকে নিচ্ছে, আবার

এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল গাই দৌড়ে চলে গেল। দেহটা গরুর মতন, মুখটা হরিণের মত। গায়ের রং ছাই ছাই। খাড়ু একটা ঢিল কুড়িয়ে ওদিকে ছুঁড়ে মারে।

বেলা প্রায় দুটো বাজে, কানুনগো সাহেবের দেরি দেখে পিয়ারী খাড়ুকে ভাত আনতে পাঠাল। বাড়ী যাওয়া নিরাপদ নয়। কি জানি অফিসার যদি এসে পড়েন? পিয়ারী সীট কভার দিয়ে টেবিলটা ঢেকে জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলার পথ ধরে নদীর দিকে এগুলো। একটা উঁচু যায়গায় আসতেই দেখে, বনটা একটু ফাঁকা হয়ে গেছে। মধ্যে বেশ মনোরম একখানা ঘাসে ঢাকা ফাঁকা জমি। মাঝে মাঝে ছোট কুলগাছ, তাতে কুল শুকিয়ে রয়েছে। আর একটু এগুতেই চোখে পড়ে একটি কালো কুচ্‌কুচে সাঁওতাল মেয়ে, নিটোল গড়ন, একখানা ময়লা কাপড় পরা, ফুল ছিঁড়ছে। নিঃস্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা, মানুষকে হয়ত লুব্ধ করে তোলে, বর্বর করে ফেলে। প্রকৃতির এই পরিবেশে সাঁওতাল যুবতীটিকে দেখে পিয়ারীলালের ভারি ভাল লাগছিল। মেয়েটি পায়েব শব্দ শুনে তার দিকে একবার বড়বড় লালচোখে তাকিয়ে অন্য আর একটা গাছের দিকে রওনা হল। মেয়েটিকে সে চেনে, ওর স্বভাবটভাব তেমন ভাল নয়। পিয়ারী একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ডাকে, "এই শোন্।" মেয়েটি ফিরে তাকায়, তারপর ওখানেই দাঁড়িয়ে বলে, "বল্ কি বলবিক্?" পিয়ারী কাছে এসে বলে, "শুন্‌না, রাগ করছিস্ কেনে?" সাঁওতাল রমণীটি কর্ণাভরণ দুলিয়ে বলে, "কই রাগ করলাম। বল্ আমার মরদ আসি যাবে।" পিয়ারী একটা টাকা ও লাল পকেট চিরুণীটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "তুই নে।" সাঁওতাল রমণী ভারি খুশি হয়ে দাঁত বার করে বলল, "তুই আমাকে দিলি, বেশ আমি নিলাম।" পিয়ারী মদির হাসি হাসে ওর দিকে তাকিয়ে। মেয়েটি তার হাত ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ভাটিগাছের কুলগাছের বন ছাড়িয়ে বড়বড় আম, বাঁশ, বটগাছের জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলল। সেখানে ঘুঘু, দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, কোকিল, শালিক, কতরকমের পাখীর ডাক, সেই নির্জন স্থানটিকে মুখরিত করে রেখেছে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, অদূরে নাগর নদীর সাদা জল, আর তীরের রাশি রাশি বালি। সেই জল দুই তীরের সঙ্গে

খেলা করছে, আর নির্লজ্জ হাসি হাসছে। ওপরে নীল আকাশ আর দুপাশে বন যে সাক্ষী থাকছে সে খেয়াল একদমই নেই।

* * * *

খাড়ু বলে, সে এতক্ষণ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে, এখানে এসে বসে আছে। পিয়ারী বলল, "একটু নদীতে হাত মুখ ধুয়ে এলাম, নে ভাত ঠিক কর।" দুজনে ভাত খেতে বসে গেল বটগাছের নীচে। পিয়ারী ভাবে এইমাত্র চলে যাওয়া সাঁওতাল মেয়েটির কথা। চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, ভয় নেই. রাশ ছেড়ে দেওয়া এদের জীবন। যা পেল তাই আনন্দে গ্রহণ করল। সহজ, সরল এরা, তাই শহুরে লোকেরা এর সুযোগ নিতে দ্বিধা বোধ করে না। খাওয়া হলে খাড়ু থালাবাসন ধুতে গেল নদীতে। পিয়ারী গাছের নীচে শুয়ে একটা বিড়ি ধরায়। গরম হাওয়া, গাছের নীচে কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। একটা কাক কি বিশ্রী ভাবে ডাকছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙ্গে খাড়ুর ডাকে, "কী, কাজ করবেন না, আমিনবাবু ?" পিয়ারী বেলা পড়ে এসেছে দেখে বলে, "না, সাহেব তো এল না। টেবিল তোল।"

এরপর দিন ছয়েক বাদে গোকুলবাবু বেলা একটা নাগাদ এসে হাজির। কাজকর্ম দেখে পরতাল টেনে চলে গেলেন। খাবার সময় পকেট হতে একখানা খাম দিয়ে গেলেন। চিঠি খুলে দেখে মা লিখেছে, টাকা এখনও পায়নি। বেয়াই মশাই একটু ভাল। বৌমার শরীর খুব খারাপ। পিয়ারী কবে আসবে, ইত্যাদি। রাধু লিখেছে :

প্রাণপ্রিয় পরমগুরু শ্রীচরণেষু,

অনেক দিন তোমার কোন পত্র-পত্রাদি পাই নাই। সেজন্য দাসী খুব চিন্তিতা আছে। বাবার শরীর একটু যেন ভালই মনে হয়। এবার দেশে খুব আম হইবে, একমাস আম খাইবার ছুটি নিয়া এখানে আসিবা। অন্যথা করিলে নিদারুণ মনোকষ্ট পাইব। সেদিন বিকালে হাত হইতে চিরুণী পড়িয়া গিয়াছিল, ভাবিলাম, অভাগিণীর ভাগ্য হয়ত ফিরিল। শীঘ্র আসিয়া হাসিমুখ দেখাইয়া আমার মনো দুঃখ দূর কর। আসিবার সময় একটা ইয়ারিং কিনিয়া আনিবে। শতকোটী প্রণাম জানিবে। ইতি জন্মজন্মান্তরের পদাশ্রিতা সেবিকাদাসী রাধেশ্বরী।

নীচে একটু সাদা জায়গায় আঁকা একটা গাছ, তার উপর একটা ডালে দুটো পাখী মুখোমুখি বসে রয়েছে। খামের মুখে সাড়ে চুয়াত্তর লেখা। পিয়ারী চিঠি খানা পকেটে রাখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, কবে যে দেশে যাওয়া যাবে।

জ্যৈষ্ঠের গরম দিনগুলিতে মধ্যাহ্নে ঘুঘু ডাকে। উত্তর বাংলার বাতাস পাকা আম কাঁঠালের গন্ধে ভরপুর। সন্ধ্যায় ছেলেরা হাডুডু খেলে। বাইরের জীবনের জোয়ার এখানে লাগে না, কারণ খবরের কাগজ নেই। স্রোতহীনা মজা নদীর মত এই গ্রাম নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে নিজেই স্তব্ধ। বাইরে হতে আসা আমিন পিয়ারীলাল, মতিউদ্দিনের আর কোন ভাবনা রইল না। কোনদিন দুপুরে আম খেয়েই কাজ করে, কোন দিন আম-দুধ-গুড়-মুড়ি দিয়ে সকালের ফলার সারে। রাতে হয়ত দুধ কলা খেয়েই কোন কোন দিন চলে যায়। কলাও সস্তা, তেমনি মিষ্টি। নারানপুরের কলার মত বিচি ভর্তি নয়। দুটো পয়সা বাঁচলেই তো লাভ। প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষের মনও যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। ভাটিফুলের, ভেঁদালীফুলের স্তবক দিয়ে সাঁওতাল রমণীরা কানের দুল করে, আঁটসাট করে কাপড় পরে, তীরধনুক হাতে মরদের সাথে দূরের পথে পাড়ি জমায়।

মুসলমান মেয়েরা ওড়না রাঙ্গায় হলুদ রঙ্গে। সুরমাপরা চোখে মদির কটাক্ষ হেনে, জানালা অল্প বন্ধ করে দেয় পথিকের চোখের উপর। ওদের ফরসা সুন্দর গোলমুখ, ওড়নার রঙ্গ, অনেকক্ষণ বিভ্রম জাগায় পথিকের মনে। দূরদূরান্ত হতে লোক আসে, এখানকার হাটে। আম কাঁঠাল, জাম, বাঙ্গি, তরমুজে সব ভরে যায়। গরুর গাড়ী আসে একের পর এক। মাদুরে, তেলের টিনে, কাপড়ে, মিষ্টির দোকানে ভরে ওঠে হাট। সন্ধ্যায় অজস্র আলো জ্বলে ওঠে, তারপর হাট ফাঁকা হতে সুরু করে। লোকেরা মাঠে মাঠে, পথে পথে চলে যায়, দূরের গাছপালার আড়ালের গ্রামে। অন্ধকারে মাঠের দিকে গরুর গাড়ী পাড়ি জমায় হাটের কেনা বেচা শেষ করে।

রাত্রে নদীগুলি, স্বচ্ছ জল নিয়ে তাকিয়ে থাকে এক আকাশ নক্ষত্রের দিকে। ওরা নাকি ভগবানের অজস্র সৃষ্ট জগতের অজস্র সূর্য। রাতের

নিস্তব্ধতায় নিশীথ সমীর মৃদু শব্দে এগিয়ে আসে, ফুলে পাতায় বুলিয়ে যায় কোমল স্পর্শ। তারা কি যেন বলে, এ রহস্যময় নিশীথে কারা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়ায়, জঙ্গলে জঙ্গলে নাগর নদীর পাড়ে। জোনাকির স্ফুলিঙ্গ তাদের প্রকাশ করতে পারে না। শিশিরে শিশিরে ভিজে যায় বন, পাতা, ঘাস, ফুল। নিথর রাতের নিস্তব্ধতায় ফুল নিজের গহন-আঁধার দেহকোষে ফলের সম্ভাবনা আনে। বিশ্বজগত তখন গভীর নিদ্রামগ্ন। ভোরের সূর্য সব প্রকাশ করে দেয়। মনে হয় চারিদিকে রহস্যময় কিছুই নেই। মানুষ কাজে বেরোয়, পাখীর গানে চারিদিক মুখর হয়ে ওঠে, পশুরা বেরোয় খাদ্যের সন্ধানে। চাষীরা মাঠে যায় লাঙ্গল কাঁধে, বলদ, মহিষ সাথে। আমিনরা মাঠে যায় টেবিল চেন নিয়ে। চাষীরা যখন চাষ করে, মাটির সঙ্গে তারা একাত্মা। পায়ে, গায়ে মাটি লাগে, মাটির রসে তাদের দেহ পুষ্ট হয়। ফসলের স্বপ্ন দেখে তারা। সবুজ পাটুয়া, সবুজ ধান কবে তুলবে এই ক্ষেতে। দেহমন তাদের মাটির রসে, আনন্দ রসে ভরে যায়।

আমিনরা যখন জরীপ করে, মাটির বাইরের চেহারাই তাদের লক্ষ্য। কোথায় কোন প্লট শেষ হল, কোনটা নদী হল, কি রকম তাদের ছবি হবে ম্যাপে। মাটির সঙ্গে তারা তেমন নিবিড় ভাবে মিশতে পারে না, যেমন পারে চাষীরা। তাবা স্বপ্ন দেখে কবে শেষ হবে এই কাজ, কবে ফিরব ঘরে। তাড়াতাড়ি কাজ কর। চাষ হলে, বন্যা হলেই তো চেন চলবে না। চেন টানো, শীগ্‌গীর। কাজের সমাপ্তির আশাই তাদের সঞ্জীবিত করে। দুজনেরই কারবার মাটির সঙ্গে, একজন প্রাণের চাষ করে আর একজন তার ছবি আঁকে।

পিয়ারীর হাতের কিস্তোয়াব শেষ হলে গোকুলবাবু একটা নতুন সীট দিলেন। পিয়ারী পি-৭০ সীটের চৌকো গুণে বলে, "এতবড় সীট এ বর্ষার মধ্যে শেষ হবে না। তারপর পাটচাষ সুরু হয়েছে।" গোকুলবাবু বলেন, "বড় পলাশবাড়ীতে বস্তি আছে, আগে মাঠের নীচু জমি শেষ কর, তারপর উঁচু জায়গায় উঠে এস।" না বলা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। ট্রাভার্স খুঁটিগুলি, যার ওপর ম্যাপের কঙ্কাল রচনা হবে, সেগুলি খুঁজে মোরব্বা তৈরী করতেই দুদিন গেল। তারপর সীটটা পাশ করিয়ে কাজ সুরু করল।

রোজ কুড়ি একর করে কাজ করতে পারলে একমাসে শেষ হবে। মতিউদ্দিন বদলী হয়ে কুসুমুণ্ডি থানায় গেল। সমগ্র জেলায় তো একসাথে কাজ হচ্ছে। নতুন যে আমিন এল তার নাম, আলতাফ হোসেন। আষাঢ় এল। বর্ষণ সুরু হচ্ছে। এর মধ্যে একদিন নারানপুর হতে চিঠি এল। মা লিখেছে, গত বৃহস্পতিবার বৌমার একটি ছেলে হয়েছে, বৌমা ও শিশুপুত্র ভালই আছে। শিশুর কিছু কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। হাত শূন্য। পিয়ারী যেন অবিলম্বে কিছু টাকা পাঠায়। বৌমার বাবার অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি, সে যেন যথা সম্ভব শীঘ্র চলে আসে।"

ছেলে হয়েছে তার? কি অদ্ভুত, কি আশ্চর্য। এও কি সম্ভব।' পিয়ারী ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি সুরু করে। কেমন দেখতে হয়েছে? কার মত? রং কি ফর্সা না কালো হয়েছে? ওর মা তো ফর্সাই। খুব কি কাঁদে? নাঃ, মা কিছু লেখেনি। কেবল টাকাই চেয়েছে। বাক্সে দশটি টাকা আছে, কালই মনি অর্ডার করে দেবে। চেনম্যান খাড়ু আমিন-বাবুর অস্থিরতা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চিঠিটা পেয়ে আমিন-বাবু অমন করছে কেন? খারাপ সংবাদ তো মনে হয় না। মিটি মিটি হাসছে। তবে?

বেশিক্ষণ চাপা গেলনা খবরটা। খবর শুনে খাড়ুর কালো খাঁদা, কুশ্রী মুখটা হাসিতে ভরে গেল। বলল, "ছেলে হইছে? তরে আমি হোসেন সাহেবকে খবর দিয়ে আসি।" পিয়ারী বাধা দেবার আগেই, খাড়ু একদৌড়ে বনের পথে অদৃশ্য হল, এ খবর হোসেন সাহেবকে না জানালে যে পুরোপুরি আনন্দ হবে না। হোসেন সাহেব যখন এল তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। বৃদ্ধ এই আমিনের বাড়ী চট্টগ্রামে, ধর্মভীরু মুসলমান। এসেই পিয়ারীকে অভিনন্দন জানাল। ছেলের কল্যানে নামাজ পড়ল। খাড়ু পদ্মপাতায় করে কিছু চিনির সন্দেশ কিনে এনেছিল, সেগুলি হোসেন সাহেবকে দিল। তারপর চা করতে বসল। হোসেন সাহেব সেগুলি খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

রাত্রে পিয়ারী বলল, "রাতে আর যাবেন না। পাট ক্ষেতের মধ্যে এদেশে বাঘ থাকে। ভাত খেয়ে শুয়ে থাকুন, খুব ভোরে চলে যাবেন।"

বৃদ্ধ রাজি হলেন। খাড়ু ডাল আর মাগুর মাছের ঝোল রাঁধল। হোলেন সাহেব খেয়ে রান্নার খুব তারিফ করেন।

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমুলে, পিয়ারী বাইরে এসে দাঁড়াল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় রাস্তা, মাঠ চকচক করছে, ওল্ড দিনাজপুর রোডের বিশাল গাছগুলি জ্যোৎস্নাধারা শিক্ত দেহে তাদের প্রলম্বিত ছায়া আরো গভীর করেছে। ভাঁটিফুলের শুভ্রদেহ, অবনতমুখী কলাগাছগুলি, উঠোনের কোনে পেঁপে গাছগুলি জ্যোৎস্নালোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আর সবাই মিলে যেন এক রহস্যময় স্বপনপুরীর সৃষ্টি করেছে। দিনের বেলার সেই অতি পরিচিত কুটুম্বদের আর চেনা যাচ্ছে না, সব যেন অপরিচিত, অনাত্মীয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে পিয়ারী তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে পিতা হওয়ার অভিনব স্বাদ রসিয়ে রসিয়ে গ্রহণ করে। বুকপকেট হতে চিঠিটা তুলে নিয়ে একবার গালে বুলিয়ে নেয়। ভক্তিভরে নারানপুরের কালীকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম জানায়, 'ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রেখো মা, এ পূজোয় দেশে গিয়ে পাঁচপয়সার বাতাসা দেব।'' সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয় হয়, অনেকগুলো মানত করা আছে এর আগে, তাও দেওযা হয় নি। ভাবে, সব একসঙ্গে শোধ করবে, দেবতার ঋণ আর রাখবে না।

খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে, সবাই ঘুমুচ্ছে বিছানায় শুয়ে। সে মনে করল, হয়ত এই ছেলেই তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে, তার দুঃখ ঘোচাবে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে প্রকৃতি তখনো তেমনি জ্যেৎস্নামেদুর। আকাশের তারা আর পৃথিবীর গাছ পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে মিটি মিটি করে কি যেন ইঙ্গিত করছে। মাটির রাস্তা বনের দিকে সাদা চোখে তাকিয়ে রয়েছে। অনেক জন্ম-মৃত্যু, মানুষের ঘরকন্না ওরা দেখেছে। মানুষই থাকে না, তা' মানুষের আশা! সে তো আরও পলকা। আজ আছে, কাল নেই। জ্যোস্নাবিগলিত রাত্রির এই মায়াময় রূপ যেমন দিনের আলোর আগমনে মিলিয়ে যাবে।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

ইংরেজী ১৯৩৭ সনের চৈত্র মাস। দিনগুলি একটি একটি করে পার হয়ে যাচ্ছে। দিনাজপুরের এই অংশটায় রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ এখনও কাটেনি। দুপুরে প্রচণ্ড গরম। ঘরে মাছি ভন্ ভন্ করে। মাঠে উঠোনে, চারদিকে শুধু বালি আর বালি। অনেকখানি জায়গা বালির চড়া পড়ে নদী সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। হেঁটে নদী পার হওয়ার সময় পায়ে হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা লাগে।

নদীর ওপারে বিহারের ইসলামপুর থানা। দেবীগঞ্জ-গোয়ালপুখর হতে সোজা কাঁচাসড়ক ঝিনঝিনের হাট, ডুঙ্গডুঙ্গির হাট, ফকীর হাটের পাশ দিয়ে, সোনমতী, মহিডাঙ্গা, দলঞ্চা নদী পার হয়ে কাটুভিটা, সাতভিটাকে পাশে রেখে, থুকরাবাড়ী, মাঠিকুণ্ডা হয়ে চোপরার দিকে গেছে। এপথে একটু ঘুরে ইসলামপুরও যাওয়া চলে। দুপারেরই সম্বল অজস্র গরুর গাড়ী। হাটের দিনে আসে অজস্র গরুর গাড়ী চাল ডাল কাপড়, পাট প্রভৃতি অজস্র সম্ভার নিয়ে। বিকেলটা বিকিকিনি চলে তারপর সন্ধ্যায় তারা রাস্তা ধরে মাঠে নেমে যায়। মাঠের লিক্ ধরে এগিয়ে চলে। দু-একখানা সোয়ারী গাড়ী চোখে পড়ে। তার ধারার (ছৈ) মধ্যে হয়ত মুসলমান শিশু, বধূ, পেছনটা তার কাপড় দিয়ে বাঁধা। গাড়ী এবরো খেবরো রাস্তায় উঁচুনীচু মাঠে কখনও ওপরে উঠছে, কখনও সমস্তসুদ্ধ নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনখানে ফাঁকা বিশাল মাঠ, ঘাসে ঢাকা, তার পাশ দিয়ে গাড়ী চলছে। হঠাৎ কখনও নাগর আত্মজা কোন ছোট নদীর কাছে এসে উঁচু রাস্তা হতে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারপর গাড়ী জলের মধ্য দিয়েই পার হচ্ছে। ক্লান্ত গরুগুলি জল পেয়ে মুখ নীচু করে জল খেয়ে নিচ্ছে, নড়তে চাইছে না।

······গাড়ী চলছেই। আর দেরী নেই পৌঁছবার। সামনে আর একখানা গাড়ী। পাশ দিতে হয় গরুকে গাড়ীশুদ্ধ জঙ্গলে নিয়ে। পাশের গাড়ীখানা চলে যায়। ধুলোওড়ে রাস্তায়, গাড়ীর মধ্যে ধুলো আসে। বনজঙ্গল

মথিত করে আবার গাড়ী ছোটে। কখনো জোরে কখনো আস্তে। এক সময় চাঁদ ওঠে আকাশে, গাড়ীও এসে যায় তার গাঁয়ে।

দেশ স্বাধীন হবার পর দিনাজপুরের এ অংশটা পাকিস্তানের অংশে যায়। আর নদীর ওপারে পূর্ণিয়া জেলার ঐ অংশটা ১৯৫৬ সনে ইসলামপুর মহকুমা হয়ে পশ্চিম বাংলার মধ্যে আসে। সে অনেক পরের কথা, তখন দেশে জমিদার শ্রেণী উঠে গেছে।

দিনাজপুরের থানা বালিয়াডাঙ্গি, গ্রাম কদমতলি। তজদিগের কাজ শুরু হয়েছে। একটা পুরানো ভাঙ্গা খড়ের ঘরের মধ্যে তজদিগ চলছে। পূজোর পরে দেশ ঘুরে এসে, গত অগ্রহায়ণে এখানে যোগ দিয়েছে। সে আছে বিজন্দর সিংএর বাড়ী। এরা জাতে রাজবংশী। পুরুষেরা কাপড় পরে নেংটির মতন করে, মেয়েরা একখানা কাপড় বুকের কাছে বাঁধে। বাড়ীর চারপাশ বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা, উঠোনে একটা ছোট গোলা, মাথায় খড়ের চাল। ঘরগুলো সব খড়ের, দেয়াল বাঁশের। টিউবওয়েল নেই, আছে গভীর কাঁচা মাটির কুয়ো, তার মুখে আগাছা জন্মেছে। বাড়ীর মধ্যে এদের গরুর গাড়ী, বাইরে ক্ষেত। কতগুলি গরুছাগল আছে, বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। বাড়ীর বড় ছেলে একটি দোকান করেছে বাড়ীর মধ্যে। পিয়ারীকে থাকতে দিয়েছে দরজা ছাড়া একটা বাইরের ঘরে। খাড়ু রাঁধে বাড়ীর ভেতরের একটা ঘরে। অহেতুক লজ্জাসরম এদের মেয়েদের নেই, পুরুষদেরও মেয়েদের সম্পর্কে অহেতুক শুচিবাই নেই। স্ত্রীস্বাধীনতা এখানে অবাধ, তা কাউকে বিব্রত করে না। কানুনগো সাহেব আছেন গ্রামের প্রান্তে একটি বাড়ীতে। সঙ্গে তার আর্দালী। সাহেবের নাম অমিয়ভূষণ সোম। এখন আর মাঠে তেমন কাজ নেই। মাঝে মাঝে দখল তদন্তে যেতে হয়। নির্দিষ্ট কাজের পর এসে শুয়ে থাকে। আজকাল মাথায় বাড়ীর চিন্তা খুব। গত পুজোতে শ্বশুর মারা গেছে। বাড়ীঘরগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। বিক্রি করতে পারলেই ভাল হয়, হাতেও কিছু টাকা আসে। বনো গ্রামের স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ছে, তার মাইনে দিতে হচ্ছে। বই কেনা এখনও বাকী। নিজের ছেলে হয়েছে, তাদের ঐতিহ্য অনুসারে ছেলের নাম রাখা হয়েছে, কিশোরীলাল, ডাক নাম পিন্টু।

মার ব্যবহার বধূর সঙ্গে, তার সঙ্গে, কেমন পাল্টে যাচ্ছে। গত পুজোয় এখানে আসবার কদিন আগে সেদিন রাধুর ঘুম হতে উঠতে একটু দেরি হয়েছে, মা কি যাতা বল্ল বৌকে। ছোট ভাইটাকে পর্যন্ত মা যেন কেমন তার বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে, নিজের দলে টানছে। এর কি মানে? সর্বোপরি, টাকায়ও যেন আজকাল কুলিয়ে উঠছে না। সংসারটা যেন একটা টানা জালের মত তাকে আটকে ক্রমাগত টানছে।

ক্যাম্পের পথে বাসায় ফিরছিল। পথে সেখ মনিরুদ্দিন আমেদের বাড়ী, তার বাইরের উঠোনের উপর দিয়েই পথ। শুনেছে এই মনিরুদ্দিন কিস্তোয়ার আমিনের সঙ্গে নাকি খুব দুর্ব্যবহার করে। সে শুধু একটু থাকতে চেয়েছিল, তা মনিরুদ্দিন দেয়নি। পাকাবাড়ী, বাইরে অনেক অতিরিক্ত খোড়ো ঘর পড়ে আছে তবু দেবে না। আমিন ছিল মিয়াজদ্দিন শেখ। খুব পাকা লোক। বয়েস প্রায় চল্লিশ, চোখের কোলে সুরমা। রাগ সে পুষে রেখেছিল। মাপের সময় বাড়ীর মধ্যে চেন চালিয়ে দিয়ে বলল, "এই খড়ের গাদা ভাঙ্গতে হবে।" বিরাট গাদা, মনিরুদ্দিন নিরুপায় হয়ে তাই ভাঙ্গল। শেষে আমিন সাহেব বললেন "এই ঘরের কোণ ভাঙ্গতে হবে, না হলে চেন চলবে না।" সর্বনাশ! পাকা দালান। মনিরুদ্দিন ফাঁদে পড়েছে। মনিরুদ্দিন সাহেব অনেক কান্নাকাটি করল। মিয়াজদ্দিন অটল, অনড়, না হলে ইংরেজ লাটবাহাদুরের কাজের ক্ষতি হবে। এমন জব্দ সে জীবনে হয় নি। শেষে আমিন সাহেবকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করে, তবে রক্ষা পায় তার বাড়ী।

এই মনিরুদ্দিন ফরিদপুর কালেক্টরেটে প্রথম জীবনে পিওন ছিল। ওর বাবা ছিল, একজন সঙ্গতিপন্ন চাষী, সেই যা জমি জমা করে যায়। আজ অনেক দিন হল মনিরুদ্দিন চাকরী ছেড়ে দিয়ে, দেশে চলে আসে। তখন বাবা জীবিত। পিয়ারী যখন সকালে অফিসে যেত, তখন দেখত একজন ফর্সামত মেয়েছেলে গরু বার করছে, গোবর নিকোচ্ছে। হাতে পায়ে গোবর। চেহারা অত্যন্ত শীর্ণ, পরনে ময়লা ছোট সবুজ শাড়ী। এমন কিছু দেখবার মত নয়। কোন কোন দিন ফেরবার সময় দেখেছে, উঠোনের উনুনে কাঠ দিয়ে রান্না করছে। পিছনে গুটি চারেক ছেলেমেয়ে, ন্যাংটা ধূলিমলিন চেহারা। শুনেছিল সে মনিরুদ্দিনেরই এক বৌ।

তার ক্যাম্পের বাড়ীওয়ালার কাছে সে শুনেছে গল্প। ফরিদপুর শহরের অন্নদা চ্যাটার্জী উকিলের মেয়ে। নাম বীণা চ্যাটার্জী, বাসা ছিল ট্যাপা-খোলায়। দীর্ঘপথ ট্যাপাখোলা হতে ঈশানস্কুল পর্যন্ত যেতে আলাপ হয় তার মনিরুদ্দিনের সঙ্গে। তার পরের ঘটনা সহজ, বীণা চ্যাটার্জী হারিয়ে যায়। অন্নদাবাবু থানা পুলিশ করে মনিরুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করান। বীণা চ্যাটার্জীকে পাওয়া গেল তার সঙ্গে। পরণে নতুন শাড়ী, নতুন জুতো।

নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে লোকে লোকারণ্য। অন্নদাবাবু নামকরা উকিল। পুলিশম্যাজিষ্ট্রেট, এস. ডি. ও, উকিলবাবুরা সবাই বীণাকে কেসের পূর্বে অনেক বোঝালেন। কিন্তু বীণা অনড়। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মা তুই একবার বল, আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, আমার অমতে। আমি তোকে ভাল বিয়ে দেব, কত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে।' মেয়ে কোন কথা না বলে ঘাড় হেঁট করে চুপ মেরে বসে রইল। কেস উঠল। অন্নদাবাবু উকিল, বললেন যে তার মেয়েকে মনিরুদ্দিন ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে, মেয়ে তার নাবালিকা। মনিরুদ্দিনের পক্ষে এক মুসলমান উকিল দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, "ওসব কথার প্রয়োজন নেই, মেয়ে কি বলে শুনতে হবে।" ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞেস করলেন বীণাকে। বীণা বলল, "সে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সে সাবালিকা। মুসলমান উকিলটি আনন্দে একটা লাফ দিয়ে উঠল।

অন্নদাবাবু, বীণার দিদিমাকে এনে হাজির করলেন। বললেন, "দেখ মা, তোর দিদিমার অবস্থা দেখ। না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে কি অবস্থা হয়েছে।" একপলকমাত্র তাকিয়ে বীণা বলল, 'না, তোমরা আমার কেউ নও। ঐ মনিরুদ্দিনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, সেই আমার সব।" অন্নদাবাবু কাঠগড়া হতে ঠাস করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কোর্টও শেষ হয়ে গেল। গল্পটা শুনে অবধি পিয়ারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেন বীণা চ্যাটার্জী এমনি করল, ইসলাম ধর্মের সে কি বোঝে? নিজ ধর্ম কেন সে ছাড়ল? মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। মনিরুদ্দিনকে সে দেখেছে এটেষ্টেশান কোর্টে, কানুনগো সাহেবের কাছে। চোখ দুটি দেখলেই বোঝা যায়, ধূর্তের একশেষ। বসন্তের দাগ লুকোতে একমুখ দাড়ি রেখেছে, তার মধ্যে সাদা ঝকঝকে দাঁত। এখন মামলার দালালি করে

শহরে কোন উকিলের কাছে। নিজের জমি ঠিক করতে রোজই ধর্না দিচ্ছে অফিসারের কাছে। কিছুদিন বাড়ীর চিঠি না পেয়ে মনটা খারাপ হয়েছিল। সেদিন রাতে খাড়ুর সঙ্গে নদীর পার দিয়ে ফিরছিল ক্যাম্প হতে। জ্যোৎস্নালোকিতরাত্রি, চারপাশে মাঠ, গাছ, নদীর পার আলোকিত হয়ে গিয়েছে। নদীর পারের বালিকে, জলকে অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। একটা বুনো শুয়োর দূর দিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। ওরা তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছে. এদিকে রাতে বাঘও তো বিচিত্র নয়। হঠাৎ খাড়ু বলে, "ঐ দেখুন, সোনাবিবি জল নিয়ে যাচ্ছে, নদী হতে।" পিয়ারী দেখল সত্যিই তাই, মনিরুদ্দিনের হিন্দু বিবি জল নিয়ে যাচ্ছে। সেও তাকায় তাদের দিকে। ক্লান্ত, রোগা অপরিচ্ছন্ন চেহারা। নাঃ, আজকের এই সোনাবিবির মধ্যে কখনো সেই বীণা চ্যাটার্জীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে সুন্দরী কিশোরী মরে গেছে।……বাড়ীওয়ালার কাছে সে শুনেছে, সোনাবিবিকে ঘরে আনবার বছর তিনেক পরে মনিরুদ্দিন সিরাজুলের বিধবা বোনকে নিকে করে ঘরে আনে। সোনাবিবি কিছু বলতে পারেনি তালাকের ভয়ে। ওর ওপর অত্যাচারের মাত্রাও বেড়ে চলে। গত বছরের আগের বছর মনিরুদ্দিন আহমেদ বিয়ে করে মর্তোজা বিবিকে, সেই এখন মনিরুদ্দিনের সবচেয়ে পিয়ারের।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে পিয়ারী বসে বসে বিজন্দর সিংএর সঙ্গে গল্প করে। বিজন্দর বলে, ওপারে দেবীগঞ্জের ডাকবাংলোর কাছে, সে গিয়েছে প্রায় কুড়ি বছর আগে, আর তারপর যায়নি। উঃ কি জঙ্গল নদী পর্যন্ত। পিয়ারী বলতে থাকে সে কোথায় কোথায় গিয়েছে। শুনে বিজন্দর তো হাঁ করে চেয়ে থাকে। পিয়ারী প্রশ্ন করে, "আচ্ছা এদিকের লোক সব হিন্দু তো ?" বিজন্দর বলে, "হ্যাঁ, তবে আজকাল পাদ্রীরা এসে অনেককে খৃষ্টান করে নিচ্ছে।" "কেন ?" পিয়ারী বলে। "কাউকে গরম কোট দিচ্ছে, কাউকে কম্বল, কাউকে প্যান্ট সার্ট। তাই দেখে অনেক পালিয়া, সাঁওতাল রাজবংশী হিন্দুধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে।" পিয়ারীতো অবাক। একটা কোট কম্বল পেয়ে ধর্মত্যাগ করছে! তার যেন অস্পষ্টভাবে মনে হল বীণা চ্যাটার্জী কেন মুসলমান হয়েছিল। মনে হয় সাধারণ লোকতো ধর্ম বোঝে না, কিছু একটার লোভেই তারা ধর্ম, ঘর-সংসার, আত্মীয়

ছাড়ে। পালিয়া, রাজবংশীরা ছাড়ে একটা কোট পেয়ে, আর বাঁণ্য্য-চ্যাটার্জীরা ছাড়ে দেহবিলাসের, আনন্দের আবছায়ার ইঙ্গিতে। বিজন্দর বলল, "একটা বিড়ি দিনতো আমিনবাবু।" পিয়ারী তাকে কৌটো হতে একটা বিড়ি এনে দিল, নিজেও একটা বিড়ি ধরাল। খাড়ু থালা বাসন ধুয়ে শুতে যায়। বিজন্দর বলে, "আমিও উঠি, অনেক রাত হয়েছে।"

—কাজ পুরোদমে চলেছে। অমিয়বাবু একজন বিচক্ষণ রেভিনিউ অফিসার, তার উপরে বেলসাহেবের পেয়ারের লোক। সাবডেপুটির নমিনেশান তিনি পেলেন বলে। ব্যবহারও তার সুন্দর, আমিনদের তিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন না। এরপর সে যখন ময়মনসিং সেট্‌লমেণ্টে যায়, তখন শুনেছে, কয়েকজন কানুনগোকে আলোচনা করতে, আমিন কথার মানে, একজন বলছিল, আ, মানে আপদ, মি=মিথ্যুক, ন=নচ্ছার। আর সবাই হো হো করে হাসছিল। খুব দুঃখ পেয়েছে শুনে। সে নিজে কখনো প্রলোভনে পা দেয়নি। আমিনদের মধ্যে সৎ অসৎ দুইই আছে। এ দোষ হতে কানুনগো সাহেবরাই কি মুক্ত? তাদের বাড়ীতেও ভেট আসে। কিস্তোয়ারের সীট বিলি করবার আগে সেবার তপন থানায় মণিবাবু কি করেছিলেন? আমিনরা প্রথমে দেখে আসত, কোন সীটে বস্তি আছে। তারপর তারা দাম হাঁকত, মণিবাবুর কাছে। এ যদি বলত দুশো টাকা ও বলত তিনশো। সে নিজে অবশ্য ও দলে ভেড়েনি। আর ভেড়েনি বলেই তার অবস্থাও কোনদিন ভাল হল না। সুরেন জানা স্বদেশে নন্দীগ্রামে কতবড় দালান দিল। অনন্ত পাল, বোনের বিয়ে দিল, বাড়ীঘর ভাল করল, আরও কত। সে কি করল? তবে সে কিছু করেনি বলেই অফিসাররা তাকে ভালবাসত। পিয়ারী তার এই জীবনে অফিসার কত দেখল। তপন থানার সার্কল অফিসার গাঙ্গুলী সাহেবকে দেখেছে, সুন্দর সপ্রতিভ চেহারা, চমৎকার ইংরিজি বলেন, নামকরা অফিসার। পার্বতীপুর থানার এক রেভিনিউ অফিসার সাহেবদের খুশি করত অদ্ভুত কৌশলে। সেট্‌লমেণ্ট অফিসার আসবেন, প্রোগ্রাম এসেছে, সব ঠিকঠাক। নির্দিষ্ট দিনে সাহেব সেট্‌লমেণ্ট অফিসার এলেন, সঙ্গে চার্জ অফিসার, সার্কল অফিসার। এসে দেখেন, এটেষ্টেশান কোর্টে লোক আছে, বেঞ্চ ক্লার্ক আছে, নেই কেবল হাকিম। সার্কেল

অফিসার, চার্জ অফিসার তো ঘাবড়ে গেলেন। কি ব্যাপার ? সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের ইনস্‌পেকশান, একি খেলা খেলা। পিওনকে জিজ্ঞেস করতে, ভেতরে দেখিয়ে দিল। সেট্‌লমেণ্ট অফিসার রাগ করে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন, পিছনে চার্জ অফিসার, সার্কল অফিসার। অফিসার একমনে পুজো করছে। সেট্‌লমেণ্ট অফিসার বলেন, "কি ওয়ারশিপ করছেন, বাবু ?" রেভিনিউ হাকিম ফিরে তাকান গদগদ মুখে। সবাই এগিয়ে গিয়ে দেখে সেট্‌লমেণ্ট অফিসারেরই এক কোট-টাই পরা ফটো, ফুল দিয়ে ধূপ দিয়ে ভক্তিবিনম্র চিত্তে পুজো করছেন হাকিম। সাহেবতো অবাক। এতো ডেভোশান্! জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি রোজ পুজো করেন ?" "রোজ স্যার। পুজো না করে আমি কলম ধরিনা।" বলাবাহুল্য ইন্‌স্‌পেকশান সেদিন ভালই হল। সাহেব বললেন, "এত ডেভোশান কৃষ্ণের দেশ ইণ্ডিয়াতেই সম্ভব।" তিনি দলবল নিয়ে বিদায় হলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সাহেব সেই রেভিনিউ হাকিমকে সাব-ডেপুটি করে দিলেন। এরপর তিনি শেষ বয়সে ডেপুটি হয়ে রিটায়ার করেন।

আরও কত গল্প আছে। সত্যমিথ্যা মেশানো সেসব গল্প। বিচিত্র এই সেট্‌লমেণ্ট বিভাগ। কতরকমের লোক আছে তার সীমা নেই। মূর্খ আছে, বিদ্বান আছে, জ্ঞানী আছে, সৎ আছে, অসৎ আছে। কেউ কেউ আমিনদের ভাল বাসত আবার কেউ কেউ ঘৃণা করত। আমিনদের কি হীন অবস্থা ছিল! এই অবস্থা কিন্তু ঘুরে গিয়েছিল স্বাধীনতার পরে। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয় ইউনিয়নের মাধ্যমে। তাদের মাইনে স্থির হয়, স্কেল হয়। টেবিল চেয়ার পায়, পায় সম্মান। ১৯৫৭ সনেই পিয়ারী দেখেছে একজন বি. এ. পাশ আমিনকে জমিদারী গ্রহণ আইনের ওপর একটা ইংরিজী অর্ডার নিয়ে একজন কানুনগোর সঙ্গে তর্ক করতে।

এদের হয়ত শেষ পর্যন্ত ভালই হবে ; তার তো চাকরীর তখন প্রায় শেষ। রিটায়ারের পরে একদিন গিয়েছিল টাকা চাইতে, বনোয়ারীলালের কাছে। বনো তখন আলাদা হয়ে গিয়েছে। টাকা সে দেয়নি, মাকে বলেছে, 'কেন টাকা দেব, এমন কী দাদা করেছে।" সে দিন চোখের জল মুছে সে বাসায় আসে। তখনও কিশোরীলাল চাকরীতে ঢোকেনি। অপর ।এ অংশ

কিশোরীলাল ঘুচিয়েছিল, সে কাকার চাইতেও বড় হয়েছিল। কাকাকেই অনেক সময় আসতে হয়েছে ভাইপোর কাছে, চাকরীর উন্নতির জন্য। রাধু খুশি হয়েছে, সে কিন্তু হয়নি। কারণ তার স্বপ্ন তো বনোকে ঘিরেও ছিল, যেমন ছিল কিশোরীলালকে ঘিরে। বরং বনোইতো প্রথম। ভাই হয়েও সেতো পিতৃস্নেহে লালন করেছে বনোকে। পিয়ারী জানে জীবনে সবাইকে নিয়ে, সব সাধ পূর্ণ না হলে সুখ হয় না। পাঁচআঙ্গুলের পাঁচটিতেই সমান ব্যথা। একটি কেটে আর একটিতে আংটি পড়লে কি সুখ আর বাহার হয় ? হয় না।

*  *  *  *

সেদিন সকালে অফিস যাবার পথে মনিরুদ্দিনের বাড়ীর কাছে আসতেই শোনে বুক ফাটানো কান্না। কি ব্যাপার ? এগিয়ে গিয়ে দেখে মনিরুদ্দিন একটা গরু পেটানো লাঠি নিয়ে সোনা বিবিকে মারছে। তার কাপড় প্রায় খুলে গেছে, কাতরাচ্ছে আর গড়াচ্ছে। সোনাবিবির ছোট ছেলেটা ভয়ে কাঁদছে। এক বীভৎস দৃশ্য। পিয়ারী দৌড়ে গিয়ে বলল, "কি করছেন, মরে যাবে যে।" মনিরুদ্দিন হাতের লাঠিটা ফেলে দিয়ে বলে, "যাঃ আজ খুব বেঁচে গেলি আমিন বাবুর জন্য।"সোনাবিবি খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে, তার পিঠ ফুটে তখন চাপ চাপ রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। পিয়ারী জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছিল ?" মনিরুদ্দিন বলে, "আরে মশাই, রোজ দেরী করে উঠবে আর বাছুরে গরুর দুধগুলি খেয়ে ফেলবে। ওকে দিয়ে কি করব বলুন তো ? তার চেয়ে একদিন পিটিয়ে মেরে ফেলব।" পিয়ারীর মন দুঃখে ভরে গিয়েছিল, সে কোন কথার উত্তর দিল না। তার জন্য পান এল, সুপুরি এল, কিন্তু সে একটুও স্পর্শ না করে উঠে এল।

কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় সে নাগর নদীর ধারে সোনাবিবির সঙ্গে দেখা করে। সে জল আনতে গিয়েছিল। তখন অস্পষ্ট আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পিয়ারী দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে বলে, "একটা কথা আছে, শুনবেন ?" সোনাবিবি ভীত চোখে তাকায়। পিয়ারী আশ্বাস দিয়ে বলে, "বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে বলব না। যদি রাজি হন তবে চলুন আপনাকে লুকিয়ে নিয়ে আপনার বাবা কিম্বা কোন আত্মীয়ের কাছে

রেখে আসি। এখানে থাকলে তো আপনি বাঁচবেন না।" সোনাবিবি চোখ তুলে তাকায়, "বাবার কাছে ?" তার চোখদুটি যেন নাগর নদীর অন্ধকার পেরিয়ে ফরিদপুরের টেপাখোলার কোন একটু ঘরের একটুকরো স্মৃতি কল্পনা করার চেষ্টা করল। পিয়ারী বলে, "বলুন যাবেন।" সোনাবিবি বলে, "কিন্তু তারা আমাকে নেবে কেন? আমিতো সেই তাদের মেয়ে আর নেই। তাদের মুখে কালি দিয়েছি।" পিয়ারী বলে, "নিশ্চয়ই নেবে। যদি না নেয়, চলুন আমার বাড়ী, সেও ফরিদপুরে। আমি আপনাকে মায়ের মত যত্নে রাখব।" পিয়ারীর মনে হল বীণা চ্যাটার্জী আঁধারে কাঁদছে। একটু পরে বলে, "আজ কত বছর এখানে রয়েছি, আর যেন পারি না। ওরা আমাকে গরু কোরবানি দেখায়, গরুর মাংস রাঁধায়, মারে, আরও কত অত্যাচার করে। ওর একটা খালু আছে, ফকীরুদ্দিন সেটা আরও দুশ্চরিত্র। ফাঁক পেলেই এই দেহের ওপর অত্যাচার করে।" দেরী হয়ে যাচ্ছে, পিয়ারী বলে, "বেশ, ভেবে কথা দেবেন।" তারপর সে ক্যাম্পের পথে পা বাড়ায়।

সোনাবিবির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেশ হতে ঘুরে এসে শুনেছিল, সোনাবিবি পালিয়েছে ফকিরুদ্দিনের সঙ্গে। পরে শুনেছিল ফকিরুদ্দিন তাকে নোয়াখালি নিয়ে যায়, তারপর মাস দশেক পরে তাকে এক মৌলভীর হেপাজতে রেখে পালায়। মৌলভী সাহেব, তাকে কিছুদিন রেখে বেচে দেয় এক মুসলমান দালালের কাছে। সে তাকে নিয়ে আসে কলকাতায় কোন এক বিখ্যাত গলিতে। এখন তার নাম হয়েছে কোকিলা সুন্দরী, তার একটা ঘর হয়েছে, বিছানা হয়েছে, হয়েছে গিল্‌টি করা কত গয়না। নিত্য সন্ধ্যায় সেখানে মাংসলোলুপরা আসে, রিকসাওয়ালা হতে আরম্ভ করে বিপথগামী ভদ্র যুবকেরা পর্যন্ত। কে জানে এখানে কতদিন, না এই তার ঠিক স্থান। বীণা চ্যাটার্জীদের রহস্য পিয়ারীলাল জানে না, কেন তারা এমনি হারিয়ে যায়। হয়তো এই তাদের বিধিলিপি।

## ॥ দুই ॥

রাধু তো অবাক। ওমা, কি করে এ লোকটা এমনি সময়ে এখানে এল। সে আর পারুলবালা, বনো আর পিণ্টুকে নিয়ে গিয়েছিল কীর্তন শুনতে, দরজায় শিকল দিয়ে। এসে দেখে দরজা ভেজানো, শিকল খোলা। দরজা ঠেলতেই দেখে পিয়ারী শুয়ে আছে চৌকিতে। পারুলবালা, বনো, সকলেই তো অবাক। পিয়ারী বলে, "মা একটু চা খাওয়াতে পার? ব্যাসপুর হতে যা হাঁটা হেঁটেছি।" মা গেল চা করতে। পিয়ারী পিণ্টুকে কোলে নিয়ে বলে, "অফিসারের কাছে ছুটি নিয়ে চলে এলাম, পালিয়েও এলাম বলতে পার।"

পনেরো দিন পরেই চলে যেতে হবে শুনে রাধু মুখ ভার করে। পারুলবালা চা করে এনে দেয়। পিয়ারী বলে, "বনো, তোমার সব বই এনেছি, ঐ ব্যাগে দেখ।" বনো এক লাফ দিয়ে ব্যাগ খুলতেই বেরুলো শুধু বই নয় আরও অনেক কিছু। একটা স্প্রীংএর লাট্টু, মার সুজি, চা, বৌর একটা কমলা রং এর শাড়ী। সবাই খুসি হল। পিণ্টুটা বাবাকে দেখে, হাসি মুখে বলে, "তুগ্গি—তুগ্গি......।" ঠাকুমার অনুকরণে দুর্গা দুর্গা।—পিয়ারী তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কি সুন্দর যে হয়েছে ছেলেটা।"

রাত্রে মা খেতে দেন লাল চালের ভাত, মুগের ডাল, ভেদামাছের ঝোল। বনো দাদার সঙ্গে খেতে বসে, অদূরে বধূ দরজার কাছে ঈষৎ ঘোমটা দেওয়া মাথাটা মার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে কি বলছে। সে ফিসফাস সবাই শুনতে পাচ্ছে। খাওয়া হলে, মা পাথরের বাটিতে একবাটি দুধ দিল, বলল, "মঙ্গলার বাছুর হয়েছে দেখেছিস্?" কতগুলি আম ছুলে দিল। একটা থেকে ঝিনুক দিয়ে পোকা বেছে দিতে হল। পিয়ারীর খুব আনন্দ হয়, সেদিন কেনা হল আজই বাছুর? বলে, "কেমন হয়েছে দেখতে, মা?" বনো বলে, "মঙ্গলার বাছুরের কাছে এখন গেলেই কিন্তু মারবে এক গুঁতো।" পাঁচুগোপালের কথা উঠতেই পারুলবালা দুঃখ করে, "অমন একটা বলভরসা ছিল আমাদের, কটা বছর

আর বাঁচল, অনেক গুছিয়ে নিতে পারতাম আমরা।" রাধু চোখ মোছে।

সে দিন রাতে ঝড় এল, শোঁ শোঁ শব্দে ধুলো বালি উড়িয়ে। জ্যৈষ্ঠের ঝড়, টিপ টিপ করে আম পড়ার শব্দ হচ্ছে। ধুলোবালি উড়ছে আর মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন। অন্ধকার রাত্রে বিচিত্র অনুভূতি। বধূ স্বামীর বুকের কাছে আরও সরে আসে ভয়ে। আকাশে গুরু গুরু গর্জন, কালো কালো মেঘ। সিঙ্গিমারার বিলে এখন জল কালো, আকাশ কালো। মধুমতীতে, নদীর নাচন সুরু হয়ে গেছে। গাছগুলি লুটোপুটি খাচ্ছে। গাছের ওপরে পাখীর বাসা ঝড়ে বিপর্যস্ত। এরপর নামল বৃষ্টি। টিনের ওপর, উঠোনের পাতার ওপর, জলের ওপর ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি সুরু হল। পিয়ারী উঠে জানালা বন্ধ করে দিয়ে এল। জলে ভিজে তাপদগ্ধ উঠোনের মাটির সোঁদাগন্ধ নাকে আসে। পিণ্টুটার কাঁথা ভেজা, রাধু কাঁথা বদলে দেয়। ঘুম আর এলনা, দুজনে নানা কথা বলে। রাধু জিজ্ঞেস করে, "মনে আছে এমনি একদিনে, বর এলনা। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হল। পরদিন·· ···।" পিয়ারী হেসে বলে, "খুব। আমার কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছিল, অমন খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেল। বিশেষ করে মাংসটার রং দেখে খুব খেতে লোভ হচ্ছিল।"

রাধু খিল খিল করে হেসে ওঠে, "ওরে পেটুক। শুধু মাংসের জন্যেই কষ্ট হল, আর আনন্দ হল না কিছুর জন্য ? পিয়ারী হাসে। রাধু বলে, "গত একমাস লক্ষ্মীদি এসেছে। কি যে চেহারা হয়েছে তার।" একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা তোমার তো ছেলেবেলাকার বন্ধু, তুমি লক্ষ্মীদিকে বিয়ে করলে না কেন ?" পিয়ারী চমকে উঠে বলে, "ধ্যেৎ। ওরা হল ব্রাহ্মণ। তাছাড়া ছোটবেলায় একসঙ্গে পড়তাম, খেলতাম, এই। রাধু বলে, "বিয়ের পরে দেনা পাওনা নিয়ে সেই যে লক্ষীদির শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে কি সুরু হয়েছে, এখনও গেল না। লক্ষীদি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। ওর বরটাও তেমনি, সেবার এসে জ্ঞানদাবাবুর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে গেছে। এবার সঙ্গে ছেলেটাকে পর্যন্ত পাঠায়নি। আচ্ছা ওর কত কষ্ট বলত।" পিয়ারীর মনে ছোটবেলার স্মৃতি এসে ঝিলিক দেয়। অন্ধকার রাত্রে মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বৃষ্টি তেমনি প্রবল।

'তখন বাবা মা তুজনেই তো বেঁচে। মজুমদারদের বাড়ীর পাঠশালে বক্সীমশাই যে পাঠশালা খুলেছেন, তাতে তারা পড়তো। তার বয়েস তখন নয় আর লক্ষ্মীর সাত। পড়াশুনায় পিয়ারীর কোন কালেই মন ছিলনা, ছিল খেলায়। মজুমদারদের অবনত টগর ফুলের গাছের উপর রেলগাড়ী খেলা, সন্তর্পণে প্রজাপতি ধরা, বনের ভাঁটিফুল গাছ, আঁশ-শ্যাওড়ার গাছ প্রভৃতির মধ্যে তারাপ্রসন্ন সেনের পরিত্যক্ত ভিটেতে ঘরকন্না খেলা, এসব লক্ষ্মী না হলে জমতে চাইত না। কতদিন ডউয়া, কাউফল, আম কুড়িয়ে ঘুঘু ডাকা, কোকিল ডাকা মধ্যাহ্ন চলে গেছে। সে সব এখন আর ভাল করে মনে নেই। তারপর কবছর পরে জ্ঞানদা বাবু মেয়ের পড়া বন্ধ করে ঘরে এনে রাখলেন, আর পিয়ারীর পড়া গ্রামের মাইনর স্কুলের ক্লাস ফোরের ওদিকে এগুতে পারল না। নরেন মাষ্টারের বেত খাওয়ার বিভীষিকায় সে আর ওপথে এগোয়নি···।' কথা নেই দেখে, রাধু স্বামীর মুখে হাতবুলিয়ে দেখে চোখে জল। বলে, "তুমি কাঁদছ নাকি ?" পিয়ারী তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ মুছে বলে, "কই নাতো। তবে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।" সে রাতে আর কথা ভাল করে জমলনা।

বনো খুব সকালে উঠে অনেক পাকা আম কুড়িয়েছে। কতগুলো লিচুও পাওয়া গেল, তলা কুড়িয়ে। সকালে চিড়ে, তুধ, আম, কলা খেয়ে বেরোল পাড়া বেড়াতে। ক্ষুদিরাম বাড়ী ছিল না, গেছে টেংরাখোলার বাজারে। গ্রাম প্রায় খালি, পূজোতে আবার যখন লোকজন আসবে তখন ধুমধাম। ইতঃস্তত বেড়িয়ে এসে জ্ঞানদাবাবুর বৈঠকখানায় বসল। জ্ঞানদাবাবু কুশল প্রশ্ন করলেন, শেষে বললেন, লক্ষ্মীকে বিয়ে দিয়ে মোটেই শান্তি হয়নি তার। ছেলে বিদ্বান অথচ মেয়েকে কষ্ট দেয়। শাশুড়ী ভয়ানক বদরাগী। সেই যে বরযাত্রী খাওয়ানো নিয়ে কি ত্রুটি হয়েছে, সে কথা তিনি এখনও লক্ষ্মীকে শোনান। তারপর তার একটি জামাই আছে, সেই হল পরামর্শদাতা। সে বিয়ের দান-সামগ্রীর বাসনে খুঁত ধরে, পূজোর কাপড়ে খুঁত ধরে, নিত্যনতুন উপদ্রব। আর তাই নিয়ে লক্ষ্মীকে গঞ্জনা। কি যে অশান্তি।

পিয়ারী শুনে তুঃখিত হয়। লক্ষ্মীর মতন মেয়েকে পেয়ে যারা হেনস্তা করে তারা মানুষ নয় চামাড়। জ্ঞানদা খুড়ো বলেন, "আমার একটিমাত্র

মেয়েতে শান্তি হল না, অথচ আমার ছেলেও নেই, ঐ তো সব। আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। ভয় হয় মেয়েটা শেষে অপঘাতী না হয়।" লক্ষ্মী এলো এক কাপ চা হাতে করে। চোখের কোনে কালি লেপে দিয়েছে যেন কে। চোয়াল জেগে উঠেছে। সে লক্ষ্মী আর নেই। জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ পিয়ারীদা?" পিয়ারী বলে "ভালই। কতদিন থাকবে?" লক্ষ্মী বলল, "জানিনা।" যতক্ষণ ছিল অবান্তর কথা, এলোমেলো কথা বলল, শেষে কেঁদে উঠে গেল।

ফিরতে ফিরতে পিয়ারীর মনে হল, একি তার বাল্যের সাথী সেই লক্ষ্মী। সেই যে চৌধুরীদের পেয়ারা গাছের মগডালে উঠে, ডাসা পেয়ারা পেড়ে, চিৎকার করে সে ডাকতো "লক্ষ্মীরে, লক্ষ্মীই···ই···ই···। পেয়ারা খাবিই···ই··· ?" ক্রীড়ারত লক্ষ্মী খেলা ফেলে ছুটে এসে আঁচল পেতে দাঁড়াত। আবার যদি সে তেমনি করে ডাক দেয় লক্ষ্মীকে, লক্ষ্মী কি ছুটে আসতে পারে না?

পিয়ারীর মনে হল, না পারে না, এখন দুজনের মধ্যে রয়েছে অনেক বাধা যা ডিঙ্গিয়ে লক্ষ্মী আসতে পারে না, পারবেও না।

যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। শ্বশুরের ঘরগুলি বেচে দিল, কিন্তু জমি বেচল না। স্মৃতি তো। রাধু চোখের জল ফেলে বলে, "আর দুটো দিন মাত্র থাক। আর থাকতে বলব না।" পিয়ারী মাথায় হাতবুলিয়ে বলে, "এইতো মাত্র তিন মাস পরে পুজো, তখনতো আসছি।" কে শোনে কার কথা, রাত্রে রাধু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। অগত্যা আরও দুদিন থেকে যেতে হল। যাবার আগে লক্ষ্মীর বাড়ী হয়ে এল। লক্ষ্মী পেছন পেছন এল বাগানটা পার হয়ে পুকুর পর্যন্ত। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পিয়ারী বলে, "লক্ষ্মী, মনে আছে, ছোটবেলা আমরা কেমন খেলতাম দুপুরে, সন্ধ্যায়। লক্ষ্মী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হল সে লজ্জা পেয়েছে। পিয়ারী বলে, "তোমার কষ্ট শুনে আমার খুব কষ্ট হয় লক্ষ্মী। যদি আমায় দিয়ে কিছু প্রতিকার হয় জানিও। আমি চেষ্টা করব।" লক্ষ্মীর চোখের জল অর্বাচীন এই আমিনের কথায় বাঁধ মানে না। সে দ্রুত পায়ে বাড়ীর দিকে চলে যায়। নিজের স্বামীর অবহেলা, সে কি সোজা কষ্টের জিনিষ! একথা অন্য কেউ বলে তাওতো ভাল লাগে না। পিয়ারীর মনে হয় সে

অনেকখানি শান্তি পেয়েছে। সে জানে তার সাধ্য কিছুই নেই, তবু মুখের সান্ত্বনাটুকুতো দিয়েছে লক্ষ্মীকে।

পরদিন ব্যাসপুর হতে গাড়ী ধরে, জানালার কাছে বসে তার কেবল এই কথাই মনে হতে থাকল, জীবনে লক্ষ্মীর মতন মেয়ে সুখে ঘর করতে পারে না, কেন ? ধীরস্থির, পতিপরায়ণা এমন মেয়ের ভাগ্য কি দিয়ে গড়া ? দূরে মাঠের ওদিকে কোন গ্রামে যেন আগুন লেগেছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সে লাল আভা চোখে আসছে। গাড়ী একটার পর একটা স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। ঘোষপুর গেল, সূর্যপুর গেল, বোয়ালমারি, কামারখালি, মধুখালি ছাড়িয়ে গাড়ী ছুটল কালুখালি জংশনেব দিকে। পিয়ারীর মনে হল গাড়ী যেন বলছে, 'কালুখালি কতদূর, কালুখালি বহুদূর, কালুখালি কতদূর…… ।'

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

পিয়ারী মাথায় জল ঢালছিল, খাড়ুর কথায় থামে। সে গিয়েছিল বেউর-ঝাড়ি গ্রামে একটা দখল তদন্তের জন্য। সেই সকালে গিয়েছে আর এই ফেরা। বেলা এখন দুটো। সাবান দিয়ে স্নান করবে বলে সাবান মেখেছে। জল ঢালতে যাবে, খাড়ু কুয়ো হতে জল তুলে দিচ্ছে। খাড়ু বলে, "আমিনবাবু, কত জায়গার জল মাথায় দিলেন বলুনতো ?" কথাটা হয়ত খাড়ু কিছু ভেবে বলেনি, অথবা মূর্খের মুখ দিয়েও মাঝে মাঝে খাঁটি কথা বেরিয়ে আসে। কিন্তু পিয়ারীর চমক লাগল। সত্যিইতো, কত যায়গার সঙ্গে তার পরিচয় হল, কতস্থানে সে থেকেছে, খেয়েছে, ঘুমিয়েছে। কতস্থানের জলে অবগাহন করেছে। খুলনার সাতক্ষীরার নোনা জল, নারানপুরের জল, বারুইপুরের চৌধুরীদের পুকুর, ক্যানিংয়ের কুয়োর জল, রায়দিঘির বিশাল দিঘি, কাঁথির বেলদার, কেদার সাউর বাড়ী, [illegible]নপুরে, রামপাতায়, টৌটানালায়, মহম্মদপুরে, দিনাজপুরের আরও কত জায়গার জল সে মাথায় দিয়েছে তা তার ভাল করে মনেও তো নেই। জলতো মাটির রস, মাটির গন্ধ তার বুকে। ভারি

অদ্ভুত বলে মনে হয়। থাড়ু তাড়া দেয় "বাবু জল ঢালুন, ভাত যে ঠাণ্ডা বরফ। পিয়ারী জল ঢালল। আবার সাবান দিল মাথায়।

সাবান নিয়ে বহুদিন পরে সে একটা গল্প শুনেছিল একজন সেট্‌ল-মেন্টের বড় অফিসার সম্পর্কে। ভারি রাশভারি আর দুর্দান্ত ছিলেন তিনি। সেট্‌লমেণ্টে এমন কেউ ছিল না তাকে ভয় করত না। পিয়ারী তখন সখেরবাজার সেট্‌লমেণ্ট অফিসে কাজ করছে। সাহেবের এক আর্দালী, সাহেব যখন থাকে না, তখন সাহেবের সাবান বেশ করে গায়ে মাথায় মেখে স্নান করে। সাহেবতো কদিন পরই টের পেলেন। কিছু বললেন না মুখে। সাহেব নতুন সাবান আর একখানা কিনে সোপ্‌কেসে রাখলেন, পুরানো খানা ফুরিয়ে এসেছে দেখে। আর্দালীর তো মহা আনন্দ, সে রোজ মেখে চলেছে সাবান, মুখে মাথায়। প্রায় মাসখানেক পরে আয়নায় মুখ দেখে খেয়াল হল, আরে মাথার চুলতো প্রায় সবই পড়ে গেছে। এখানে ওখানে বড়বড় টাক। গোঁফদাড়িও আর উঠছে না, কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা চেহারা, কি ব্যাপার? আর্দালীটা ভড়কে গেল। ঘাড় ফেড়াতে গিয়ে দেখে অফিসার পেছনে রয়েছেন দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, "সাবানে কেমন উপকার হচ্ছে? আর্দালী বুঝতে পারে, এ সাহেবের কাণ্ড। সে লজ্জা ও ভয়ে সেদিনই দেশে চলে যায়। পরে সে বুঝতে পেরেছিল অফিসার একখানা লোমনাশক সাবান কিনে এনে রেখেছিল, তাই সে মেখেছে রোজ, দিনের পর দিন।'

স্নান করে খেতে বসে সে। লালচালের ভাত, নাগর নদীর মাছ, আলু ভাজা। চারদিকে এখনো মাছি। আষাঢ় মাস, চারদিকে সবুজ পাটক্ষেত। এদেশের লোকরা বলে, পাটুয়া। 'পাটের শাক, পাটের খাট্টা এদের পরম প্রিয় খাদ্য। পিয়ারীর প্রায় বমি আসে। হিমালয় বেশী দূরে নয়। মেঘের পর মেঘ এসে জমতে লাগল। অন্ধকারে পাটক্ষেতে বাঘ এসে লুকোয় কাঁচনার জঙ্গল হতে এসে। উদ্দেশ্য গরু খাওয়া। বৃষ্টি এলে পাটক্ষেতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ হয়। রাতে এখনো শীত। নদী ভরে গেল জলে। হাকিমের কাজ কর্ম প্রায় বন্ধ। তিনি সার্কল অফিসারকে জানালেন কাজের অবস্থার কথা। শ্রাবণে পিয়ারীকে ধরল ম্যালেরিয়ায়। সন্ধ্যা হলেই প্রবলভাবে কাঁপিয়ে জ্বর আসত। দিনে ছেড়ে যেত। ঠাকুরগাঁও

পোষ্টঅফিস হতে কুইনাইন কিনে এনে, দিন পনেরো খাওয়ার পর একদম ছেড়ে গেল। বৃষ্টির পর বৃষ্টি, আকাশ সারাদিন মেঘাচ্ছন্ন। দূরে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে, আবার সে বৃষ্টি কখনো এগিয়ে এসে সব ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সবাই ঘরে আটকা।

অবসরে অমিয়বাবু বাঁশী বাজান, কখনও ষ্টাফদের সঙ্গে তাস খেলেন। রাত্রে কোন কোন দিন সবাই মিলে খিচুড়ি রেঁধে খায়, কিন্তু সময় আর কাটে না। সেরে উঠে পিয়ারী একখানা বই পেয়েছিল, নাম "গোপাল-ভাঁড়।" বাইরের বর্ষা আর ভাল লাগছিল না। বইটা দিয়েছিল ওপারের পূর্ণিয়া জেলার জাগতাগাঁওয়ের একজন স্কুল মাষ্টার। এপারে তার জমি ছিল। বইটা পড়ে পিয়ারী নিজের মনেই খুক্ খুক্ করে হাসত। খাড়ু রাঁধতে রাঁধতে নির্বোধের মত তাকিয়ে থাকত। আমিনবাবুটা হাসে কেন?

আমিনবাবু ততক্ষণে শ্বাশুড়ী জামাইএর লড়াই, জয় খট্টাঙ্গ পুরানের জয়, খাও বাবা কচুরি খাও, কাৎ করবেন না রস গড়িয়ে পরবে, ভীম একাদশী প্রভৃতি পড়ে পড়ে আত্মহারা। গোপালের বুদ্ধি ও তৎপরতায় বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পর্যন্ত জব্দ, এ্যা! গোপালের ভাঁড়দের সঙ্গে রঙ্গরস তার সবচেয়ে ভাল লাগত। এক ওড়িয়ার কপালে ফোঁটা দেখে, গোপাল রহস্য করে প্রশ্ন করে, 'কিরে তোর কপালে কি?' উড়ে বলে, "ফোঁটা কাটুচি।" গোপাল বলে, "ফোঁটা কাটুচিনা কাগ হাগুচি।" উড়িষ্যাবাসী এবার চটে বলল, 'কাগ হাগুচি না তোর বাপ হাগুচি।' লোকটি ভাবল মুখের মত জবাব হল। তারই মরা অন্ধ্যা গল্পটাই বা কত চমৎকার। পড়ে আর আশ মেটেনা। 'কর্তাকে বল সব পাবে', এতে আছে গোপাল আর তার স্ত্রী কেমন এক চোরকে জব্দ করেছিল। তারপর গোপালের রামনাম? একদিন মহারাজ গোপালের সঙ্গে উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কৌতুকচ্ছলে গোপালকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আচ্ছা গোপাল, তুমি আমায় ছাড়িয়ে যাও দেখি।" তখন গোপাল কেবল 'রাম রাম' বলে রামনাম স্মরণ করতে লাগল। মহারাজ বলে 'ওকি গোপাল, কি হচ্ছে?' গোপাল বলে 'রাম নাম করছি।' মহারাজ বলেন, 'কেন?' গোপাল বলে 'মহারাজ। দশার বেটার নাম শুনলে ভূত ছেড়ে যায়, আর আপনি আমাকে ছাড়বেন না?'

বেশ কাটছিল, অবসরের দিনগুলি গোপালভঁাড়ের সঙ্গে। সে ঠিক করল, পূজোর ছুটিতে বাড়ী যাওয়ার সময় এর একখানা বই কিনে নেবে, রাধুকে, মাকে পড়ে শোনাবে। সুন্দরবন সেট্‌লমেণ্টের পরে সে কৃষ্ণনগরে বেড়াতে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। সেখানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ী দেখেছে, কিন্তু বহু খুঁজে, জিজ্ঞাসাবাদ করেও গোপালভঁাড়ের বাড়ীর সন্ধান পায় নি। পূজোর পর, শীতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার এটেস্টেশন শেষ হয়ে গেল। পিয়ারী ও আর একজন খাঁচমুহুরী প্রাণপণে খেটে মৌজাগুলির খাঁচ শেষ করল। অফিসার মৌজা রেকর্ডগুলি ডি, পি তে ফেলে দিলেন, একের পর এক। যারা মনে করেছে, তাদের রেকর্ড ঠিক হয়নি তারা এ সময় আপত্তি দাখিল করতে পারত। অমিয়বাবু ভাল হাকিম ছিলেন, তাই আপত্তিও একটা তেমন পড়েনি। শুধু ক্যাম্পিং মৌজা উত্তর-পাড়িয়াতে শতকরা দশটি আপত্তি পড়েছিল। অমিয়বাবু আশা করছেন, যে-কোনদিন হয়তো বদলীর আদেশ এসে যেতে পারে।

সেদিন ছিল শনিবার। পাঁচটার পরে অমিয়বাবু বাইরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন, পরনে তার হাফপ্যান্ট ও সার্ট। ঘরের ভেতরে পেস্কার বীরেনবাবু, পিয়ারী, পিওনরা মৌজা বাঁধাছাঁদা করছে, কোর্ট ফি মেলাচ্ছে। সামনের বাঁশবন উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপছে। এমন সময় একটি স্থানীয় লোক দৌড়ে এসে খবর দিল, "তোদের বড় আমিনটা আইচ্ছে।" সবাই অবাক, বড় আমিনটা আবার কে? এমন সময় একটা ঘোড়া এসে থামল, তাতে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার বেল সাহেব। পেছনে আর একটি ঘোড়ায় সার্কল অফিসার। হার্টলি সাহেব ১৯৩৬ সনের অক্টোবরে চলে যাবার পর বেল সাহেব সেট্‌লমেণ্ট অফিসার হয়েছেন। দৌড় ঝাঁপ লেগে গেল। সাহেব নেমেই বলেন, "এককাপ চা খাওয়াতে পার অমিয়?" সার্কল অফিসার ঈর্ষান্বিত মুখে তাকায় অমিয়বাবুর দিকে। এদিকটায় ডাব পাওয়া যায় না, অফিসাররা খুব ক্লান্ত। দুটো চেয়ার পাতা হল, দুকাপ চা তৈরী করা হল। সাহেব টুপি রেখে, মুখ পুঁছে, চা-এর কাপ নিলেন। সার্কল অফিসারও হুবহু অনুকরণ করলেন। পেস্কার, আমিন, মুহুরি, পিওন সবাই একে একে হাতজোড় করে নমস্কার করে

গেল। অমিয়বাবু অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন চুপ করে। সাহেবের তালিমারা হাফপ্যান্ট পরা। তখনকার দিনে সকলেই হাফপ্যান্ট পরত। ইংরেজ অফিসারদের স্ত্রীরা রাতে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট সেলাই করে দিত, মাঠে কাজ করবার জন্য। দিনে তাই পরে তাঁরা ইনসপেক্‌শান করতেন। সন্ধ্যার পরে নিজের হেড কোয়ার্টারে ফিরে স্নান করে স্যুট পরে ক্লাবে যেতেন।

এখন আর সেদিন নেই। যুদ্ধের দৌলতে হাফপ্যান্টের চলন সেট্‌ল-মেণ্টে উঠে যায়। ট্রেনিং ক্যাম্পেই যে কদিন হাফপ্যান্ট পরা। তারপর এসেই ফুলপ্যান্ট। আজকাল আমিন, বেঞ্চক্লার্ক, এমন কি পিওনরা পর্যন্ত ফুলপ্যান্ট পরে। চিনবার উপায় নেই, কে আমিন, কে পেস্কার, কে পিওন। কারণ পিওনরা তো আর তাদের লাল কাপড়ের ব্যাজ ও পেতলের চাপরাশ পরে না। হাফপ্যান্ট আর চাপ্‌রাশ ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা অনেক অফিসার করেছেন, কিন্তু কেউ মানেনি। এমন কি চাকরির ভয় দেখিয়েও নয়।

বেল সাহেব ছুটো মৌজা তন্ন তন্ন করে চেক করলেন। মৌজা ফাইলগুলি চেক করলেন, অবজেকশান কেসগুলি পরীক্ষা করে পরে কোর্ট ফি গুণলেন। শেষে বললেন, "সামনে ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী, তুমি আঠারো তারিখে কালিয়াগঞ্জ অবজেকশান ক্যাম্পে যোগ দেবে। এখানে নতুন অফিসার আসবে। ষ্টাফ এখানে যা আছে, তাই থাকবে, নো চেঞ্জ। অর্ডার পরে আসছে।" ইন্‌সপেক্‌শান নোট দিয়ে বিদায় নেবার সময় অমিয়র হাতে তার প্রমোশনেব চিঠিটা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে বললেন, "কনগ্রাচুলেশান, মাই বয়।" সার্কল অফিসারও বললেন, "কনগ্রাচুলেশান, মিঃ সোম।" অমিয়বাবুর চলে যাবার খবরটা শুনে সকলে খুব ছুঃখিত হল। ষ্টাফরাও আন্তরিক ছুঃখিত হল। সকলে মিলে চাঁদা তুলে একটা ফেয়ারওয়েলের বন্দোবস্ত করল। ঠিক হয়েছিল ঠাকুর গাঁ হতে ফটোগ্রাফার এনে ফটো তোলা হবে, তা সেটা আর হয়ে ওঠেনি। নিজেরা খুব ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া করে অফিসারকে বিদায় দিল। অমিয়বাবু চলে গেলেন। ঠাকুর গাঁ পর্যন্ত গরুর গাড়ীতে যাবেন, তারপর সেখান হতে রেলে।

## ॥ দুই ॥

বাংলার স্তব্ধ দুপুরে পাখীরা গান গাওয়া বন্ধ করে, শুধু কানে আসে ঘুঘুর ডাক। মাঠে, মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে রাখাল ছায়াচ্ছন্ন বট, অশথ্ বা কোন গাছের ছায়ায় বসে বাঁশী বাজায় নিজের মনে। নিস্তব্ধ দুপুর, কোন সাড়াশব্দ নেই, ভারি মিঠে লাগে ঐ তানটুকু। রাখালের চারদিকে গরুরা মেলা করে, মাথার ওপর পাখীর কূজন। নদীর ধারা বয়ে চলে মাঠে, প্রান্তরে। জীবন এখানে নিস্তরঙ্গ, সময় এখানে অলস, মন্থর। প্রকৃতি এখানে সহর্ষ, মানুষ এখানে সরল, সহজ, মধুর।

সমস্ত বাংলা দেশেরই তো এই এক চেহারা। কি পূর্ব, কি পশ্চিম, কি উত্তর, কি দক্ষিণ সব স্থানেরই ঐ একরূপ, বাংলার। পিয়ারী কোন ব্যতিক্রম দেখেনি এর কোথাও। শুধু বহিঃপ্রকৃতির যা একটু অদল বদল দেখেছে, আর সবই তো সেই রাখাল বালকের রূপ। এর মাঝে শহরের চেহারাগুলি যেন বড় বেমানান। একটা বিরাট প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এই সমস্ত কথাই তার মনে আসছিল। একটা লতাজড়ান কুলগাছে একটা কোকিল ডাকছে। একজন রাজবংশী ছেলে তীরধনুক নিয়ে আমগাছটার দিকে তাক করেছে। ঐযে, একটা ফিঙে কাককে তাড়া করে নিয়ে চলেছে। পিয়ারী প্রান্তর পেরিয়ে নাগরের একটা খাল হেঁটে পার হল। উঁচু পার আর অল্প জল। তীরে উঠে মাঠ পার হয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে। গ্রামের সীমানায় আসতেই একটা পাহাড়ী কালো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করল। মাথার উপর মৌচাক। একটি জোয়ান বধূ কাঠ ফাঁড়ছে। গরু বাঁধা রয়েছে। কঞ্চির বেড়া, তারই ওপাশে মাকে ঘিরে দুটো ছাগল ছানা ম্যা ম্যা করছে। আমের মঞ্জরীর গন্ধে চতুর্দিক ম' ম' করছে। বটফল পেকে রাস্তায় পড়ছে, কোথা থেকে ভেঁাদালীর গন্ধ আসছে। বাঁশ গাছের কাছে আসতেই রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরে আবার আলে আলে গিয়ে, পুবে চলে গেছে। পিয়ারী মাঠে পড়ে ছাতা খুলল। এখনও অনেক দূর যেতে হবে, তার গন্তব্যস্থল মুলমুলে।

খাড়ুকে সঙ্গে আনেনি, কারণ তাহলে ফিরে গিয়ে আবার রাঁধতে হবে। নিজেই চোঙ্গা আর যন্ত্রপাতি নিয়েছে। হাতে একটা থলেতে গাণ্টার চেন্। একটা বলদের গাড়ী যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে। একবার পিয়ারী জিজ্ঞেস করল, ঠিক যাচ্ছে কি না। গ্রামে পোঁছে দেখল, ছুই দলই উপস্থিত। একপক্ষ মুসলমান, অন্যপক্ষ রাজবংশী। মাঠের একটা জমির দখল নিয়ে বিবাদ, ছু-পক্ষেরই আস্ফালন। ছুপক্ষই লোকজন বিস্তর হাজির করেছে। এদিকে বহু রাজবংশী, পালিয়া লাঠি, তীরধনুক, ভোজালি, বঁইশ্লা (বাঁশ কাটার অস্ত্র) প্রভৃতি নিয়ে হাজির। অন্যদিকে মুসলমানেরা লাঠি-বল্লম প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাজির। পিয়ারী দেখে মহা বিপদ, একটু হুঁসিয়ার হয়ে কার্যসিদ্ধি না করলে একটা "কাইজ্যা" লেগে যেতে পারে। পিয়ারী এ জমিটার কিস্তোয়ার করেনি, করেছে সাহাদাৎ মিয়া। বিবাদের ফর্দটা সঙ্গে এনেছে, খুলে দেখে মিয়া সাহেব কিছু করেছে কি না। না, কিছুই করেনি। এটেষ্টেশান হাকিম দখল গণি সাহেবকেই দিয়ে গেছে খসড়ানুযায়ী। ড্রাফ্ট পাবলিকেশানের সময় ছুখীরাম বিবাদ দিয়েছে।

পিয়ারী সব জিজ্ঞাসাবাদ করে, সবাইকে নিয়ে নিকটস্থ একটা মাঠে এসে বসল। বেলা তখন প্রায় একটা। পিয়ারী বলল, "সত্যি করে বলুন, জমিটা কে চাষ করেছে এ বছরে।" ছুপক্ষই তাল ঠুকে এগিয়ে এল। পিয়ারী বলল, "আচ্ছা, আপনাদের ছেলেপুলে আছে?" ওরা ওদের ছেলেদের ভীড়ের মধ্য হতে বের করে আনল। পিয়ারী গ্রামের মাতব্বরদের এনে বসাল। তারপর বলল, "বলুন যার যার ছেলের মাথায় হাত রেখে, কসম কেটে, জমি এ বছর কে চাষ করেছে।" গণি সাহেব মাথা নীচু করলেন। রাজবংশী ছুখীরাম সিং বলে, "আমি বলছি দেখুন।"... গণিসাহেব প্রকৃতপক্ষে একজন ধার্মিক এবং সৎ মুসলমান। গত বছর তিনিই চাষ করেছেন। কিন্তু এবার চাষ করে ফসল কেটে তোলে ছুখী। গ্রাম্য রেষারেষিতে যা হয়, তাই হয়েছে আর কি। আমিনের বুদ্ধির কাছে তিনি হেরে গেলেন। ধবধবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, ছুখী, আমি আর কোন গোল করব না। তুমি ও জমি ভোগ কর।" ছুপক্ষের দল ভেঙ্গে গেল। পিয়ারী বলে,

"নোটিশ যখন পেয়েছেন, হাকিমকে সত্য বলে দেবেন।" গণিসাহেব বললেন, "ঠিক আছে।"

তখনকার দিনে এমনি দখল তদন্ত অনেক সময় হত। কাউকে ছেলের মাথা, গীতা-কোরাণ ছুঁয়ে, কেউ বা ঠাকুরঘর বা মসজিদ ছুঁয়ে বা পশ্চিমমুখী হয়ে শপথ করত। আবার মৈয়মনসিংএ শোনা গেছে অনেক গ্রাম্য বৃদ্ধ আগুনের সামনে সত্যকথা বলে ফেলত, ভয়ে। তখন তবু একটা পথ ছিল, কিন্তু যুদ্ধের পরে মানুষের ধর্মভয় একদম কমে যায়। পিয়ারী দেখেছে ১৯৫৫ সনে ভাঙ্গর খানায় কাশীপুরে কি হিন্দু কি মুসলমান একটা মিথ্যে দখল লেখাবার জন্য এমন শপথ নেই যা করেনি। কোরাণ, গীতা, ছেলের মাথা, ঠাকুরঘর, মসজিদ, আগুন তো সবই তুচ্ছ। পিয়ারী কাজ সেরে উঠতে যাবে, গণি সাহেব হাত ধরলেন, "না খেয়ে যেতে পারবেন না।" পিয়ারী বিবদমান পার্টির বাড়ীতে ভাত খেতে নারাজ। গণিসাহেব বললেন, "আর তো বিবাদ নেই, চলুন আমিনবাবু।" দুখীরাম বলে, "কিছু দোষ হবে না, তুই খা বাবু।" অগত্যা পিয়ারী রাজি হল। স্নান করে সরু চালের ভাত, কইমাছের ছালুন, মুর্গির মাংসের ঝোল দিয়ে দিব্বি খেল। তারপর সন্ধ্যার কিছু আগে রওনা দিল, কদমতলির দিকে। তখন তার মনটা কর্তব্য সম্পাদনের আনন্দে প্রসন্ন।

অবজেকশান অফিসার সামসুল আলম, সমস্তটা শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। পেস্কার ধীরেনবাবু বলেন, "সাহাদাৎ মিয়া এর জন্য কম করে দুটো দশটাকার নোট নিয়েছে। আলম সাহেব বল্লেন, "কিন্তু যতদুর জানি ওর বাড়ীর অবস্থাতো বেশ ভাল। হাওড়া জেলার আমতা থানার ঝিকরেগাছির কাছে নাকি ওর বাড়ী। ওর বাবার চাষে ভাল আয়।" সকলে চুপ করে থাকে। পিয়ারী দেখেছে তার জীবনের অভিজ্ঞতায়, অবস্থা ভাল না হলেই যে ঘুষ খায়, আর হলেই যে খায় না, এটা ঠিক নয়। অনেক দরিদ্র আমিন, কানুনগো, পেস্কার আছে, যারা সৎ। আবার অনেক দরিদ্র অবস্থার লোক রাঘব বোয়ালের মতন হাঁ করেই আছে। এটা সিগ্রেট-বিড়ি খাওয়ার মত একটা অভ্যেস। একবার খেলেই খাওয়া স্নুরু হল।

এর একটা সকরুণ পরিণতি সে দেখেছে পরবর্তী জীবনে। তখন তার রিটায়ারের অবশ্য অনেকদিন বাকী। হরলাল দাসের বাড়ী ছিল নোয়াখালি, আমিন হিসেবেও তার নাম ছিল। বেশি দিনের কথা নয়। পিয়ারীর সমসাময়িক হলে কি হবে, টাকার গন্ধ পেলে রামের জমি রহিমকে আর শামছুদ্দিনের জমি শ্যামকে দিতে তার আটকাত না। ভারি কৌশলী ছিল সে। অথচ থাকার মধ্যে ঐ একটা মেয়ে ছিল তার সম্বল, তাকেও খুব অল্প বয়সে সে বিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে, শুধু সে আর তার স্ত্রী। মুখে মিঠে কথা ছিল, তাতে লোক শিকার হত ভাল। তারওপর প্রয়োগ করত শানিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কেসের সময় বিবদমান পক্ষ উপস্থিত থাকলে দুপক্ষের কাছ থেকেই এই কড়ার করে টাকা নিত, যে কাজ না হলে টাকা ফেরত দেবে। তারপরে কেস ওয়াচ করে রায় বেরোলে পরাজিত পক্ষকে টাকা ফেরত দিয়ে নিজের অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত ও বিজয়ী পক্ষের কাছে হাসিমুখে মিষ্টি খেতে চাইত। সাহেবের নাম করে টাকা খেলেও, সাহেব কিন্তু কিছুই টের পেতেন না। ব্যাপারটা পরে জানাজানি হয়ে যায় ; একই কৌশল বার বার খাটালে যা হয় আর কি।

অসদুপায়ে টাকা নেবার আর একটি উপায় পিয়ারী দেখেছে, অধঃস্তন কর্মচারীর কাছ হতে টাকা ধার নেয়া। চাইলে শোধ দিলেন, নইলে নয়। এও কি একরকমের উৎকোচ নয় ? যাই হোক হরলালবাবুর কোথাও বাধেনি। সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেল সুন্দরবন সেট্‌লমেণ্টে ভাঙ্গরে এসে। বিবাদটা ছিল ধাপা মৌজার ঘোড়াখালি ভেরির বুঝারতের সময়। জলকর খতিয়ানের মালিক সুনন্দরাম ঘোষ চেয়েছিলেন যে পাঁচ বৎসরের মেয়াদী দখলকার অমিয় নস্করের নাম আর রেকর্ড করে ফ্যাচাং বাড়িয়ে লাভ কি। সুনন্দরাম ঘোষ, হরলালবাবুকে খুশি করে দেন। মাঠে আমিনবাবু অনিল নস্করকে বলে দেন যে এ রেকর্ড সম্ভব নয়।

কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। নতুবা তিনি চেনপিওন ভূপতিকে পাঠাবেন কেন অনিলবাবুর বালিগঞ্জের বাড়ীতে ? অনিলবাবু বলেন, "বেশ আমিনবাবুকে কাল বিকেলে আসতে বলো, আমি টাকা দেব।"

পরদিন হরলালবাবু টাকা নিয়ে খুশি হয়ে বাড়ী আসেন। কিন্তু দেয়ালেরও কান আছে। অনিলবাবুর দুজন জেলে সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা পূর্বে সুনন্দরাম ঘোষের কাজ করত। ব্যাপারটা জেনে তারা সুনন্দরামবাবুকে সব জানিয়ে দেয়। ওরা বক্‌শিশ নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু খবর শুনে অতুল প্রতাপশালী সুনন্দরাম ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন, কি তার সঙ্গে বেইমানী! এর পরের শনিবার বিকেলে যখন আমিনবাবু বাসায় ফিরছিলেন, তখন বানতামার—একটু আগে সন্ধ্যে হয়ে যায়। বৃদ্ধ আনমনে হাঁটছিল—অকস্মাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে পাঁচজন মুখোসপরা লোক এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। হরলালবাবুরও ভয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়। যারা এসেছিল, তারাও কোন কথা না বলে দমাদ্দম লাঠি চালিয়ে হয়লালবাবুকে শেষ করে দেহটা কাটাখালের ঠাণ্ডা জলে ভাসিয়ে দিল। এ নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি, কাউকেই ধরা যায়নি। ও প্রসঙ্গ যাক।

এরপর, সেদিন খাড়ু ওপারে নিলাজীর হাটে গিয়ে কি ববে হঠাৎ একটা ইলিশ মাছ কিনে ফেলে। এদিকে ইলিশ মাছ বিরল। মহানন্দার মাছ অথবা মনিহারির মাছ হবে হয়তো। পিয়ারীতো মহা খুশি, বলল, "তুই সর, আমি রাঁধব।" খাড়ু ভাত রাঁধে, পিয়ারী কয়েকটা ইলিশের টুকরো বেগুন, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধল। তিনটি টুকরো একটা বাটিতে দিয়ে বলল, "যা পেস্কারবাবুকে দিয়ে আয়।" পেস্কার ধীরেন মাইতির বাড়ী মেদিনীপুরে। পিয়ারীর সঙ্গে খুবই ভাব।

পরদিন বীরেনকে পিয়ারী জিজ্ঞেস করল, "কেমন খেলে ইলিশ?" বীরেন বলে, "খুব ভাল।" পিয়ারী দেখেছে, মেদিনীপুরে ইলিশমাছ আলু দিয়ে রাঁধে। বলে, "বেগুন দিয়ে যদি রাঁধতে, দেখতে কি টেস্ হত।" বীরেন বাঁ হাত আকাশে দুলিয়ে বলে, "রাখ, তোমরা বাঙ্গালরা আবার খেতে জান নাকি?" ব্যস তুমুল তর্ক সুরু হল। একে অন্যের দেশের ত্রুটি ধরতে সুরু করল। বীরেন মাইতি বলে, "তোমরা খেতে জান তো, লঙ্কা আর ঝাল।" পিয়ারী জবাব দেয়, "তোমরা তো খাও তেঁতুল গোলার টক।" মাইতি বলে, "রাখো রাখো, ভেটকির পেটি দিয়ে তেঁতুলের টকের স্বাদতো জানলে না।

চিনেছ খালি সরষে বাটা।” সরকার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, “সরষেবাটা মেখে, ইলিশমাছ বা সরলপুঁটি ভাতে তো খাওনি, তাহলে ঐ মুখে ও কথা বেরুতো না। খেতে শিখেছো খস্‌লা শাক, আর বৈতালের ঘণ্ট।” দুজনে তুমুল লেগে গেল। এরপর ভাষা নিয়ে আরম্ভ হল। পেস্কার বলে, “তোমাদের আবার একটা কথা না কি, ক্যাম্‌বায়, কেডা, খাইচিস্‌, ঝিবুতপান···। যতসব মগের ভাষা।” আমিন লাফিয়ে উঠে বলে, “না ওটা ভাষা নয়, ভাষা হল, গটে, বৈতাল, কোন্‌ঠিযাবু।··· যতসব উড়েদের ভাষা।”

দুজনের ঝগড়ায় খেয়ালই করেনি, কখন, হাকিম এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। অফিসের সময় হয়ে গেছে। একজন পিওন তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ঝেড়ে দিল। তিনি বসলেন। সাহেব বলেন, “কি নিয়ে ঝগড়া শুনি, আমি, মীমাংসা করে কেসে হাত দেব।” দুজনে তাদের আপত্তি বলল, ইলিশমাছ হতে সুরু করে। আলম্‌ সাহেব সব মন দিয়ে শোনেন, তারপর বলেন, “শুনুন। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ। বাংলাও কম বিশাল নয়। এখানে আছে নানা ভাষা, নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা আচার ব্যবহার। এদের খাদ্য, পোষাক পর্যন্ত বিভিন্ন। এর কারণ হল, বাংলা ও ভারতবর্ষ কখনো এক কেন্দ্রের অধীন বরাবর থাকতে পারেনি। পাঠান এল, তাদের তাড়িয়ে মোগল, আর সব শেষে ইংরেজ। ইংরেজ আমাদের অনেক উন্নতি করেছে, তেমনি ক্ষতিও করেছে। ক্ষতি হল যে এরা কখনও আমাদের এক করতে চেষ্টা করেনি। বরং আমাদের ভিন্নমুখী বৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই জন্যই আরও দেশটার একজাতি, এক আচার, এক ভাষা হল না। দ্বিতীয় হল, আচার ব্যবহার তো ভৌগলিক। মাদ্রাজের একজন হিন্দু বিধবা পেঁয়াজ খেতে দ্বিধা করে না, কিন্তু বাংলায় এ কথা শুনলে বিধবারা জিভ কাটবে। মাদ্রাজ কি বাংলার চেয়ে খারাপ হল? মেদিনীপুরে ইলিশমাছ বেগুন দিয়ে খায় না বলে ওরা এমন কিছু অন্যায় করেনি, ওটা একটা চলতি নিয়ম-মাত্র। আবার পূর্ব বাংলায় মাছের পেটিতে টক না করে সরষে বাটা দিয়ে খায় বলে ওরা অপরাধ করছেন। এগুলি অতি তুচ্ছ। আচ্ছা রুটি বা লুচির সাইজ্‌ কি, গোল তো?” ওরা দুজনে মাথা নাড়ে। আলমসাহেব

বলেন, "যদি গোল না হয়ে, কোন দেশ বলে লুচি বা রুটি চৌকো করব, তবে কি দোষের হবে? না, তাতে পেট ভরবে না। কোন ব্যবহারই খারাপ নয়, শুধু দেখতে হবে, ব্যবহারের উপযোগী হচ্ছে কি না। যে দেশে কোন আচার বা প্রচলিত নিয়ম ব্যবহারের উপযোগী হবে সেটাই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেয়। এর নিশ্চয় একটা অর্থ আছে। আর সেট্‌লমেন্টে তো এই আমাদের শেখায়। দেখছেন না, যে দেশে যাই, সে দেশের প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন আমরা যত্নের সঙ্গে লিখে রাখি।"

দুজনে মাথা নীচু করে কাজে গেল। কেস শুরু হল। পিওন চিৎকার সুরু করল, "এক নম্বর কেস; বিবাদী, কাউয়া বিবি, হাজির·····?।" কাউয়া বিবি স্বামীর পেছনে পেছনে আসে। বিবাদী আসে, চলতে সুরু করে রেভিন্যু কোর্ট। ছুটির পরে বাইরে এসে দুজনে হেসে ফেলে, "অফিসার কি বলে বুঝলি ?" তারপর দুজনেই মাথা নেড়ে বলে, "একবিন্দু নয়।" বীরেন মাইতি বলে, "পাগল নাকি, লুচি রুটি চৌকো হলে দোষ নেই!" পিয়ারী বলে, "ছেড়ে দাও ওসব অফিসারদের কথা। তুমি একদিন ইলিশমাছ দিয়ে আলু দিয়ে খাইও তো।" বীরেন বলে, "সেটি হচ্ছে না, তার আগে একদিন তুমি, ইলিশমাছ বেগুন দিয়ে রাঁধ, খেয়েনি।"

## ॥ তিন ॥

১৯৩৮ সনের বর্ষা পার হয়ে পূজো প্রায় ধরো ধরো। একশো-তিন আপত্তি ধরার শুনানিও প্রায় শেষ। পিয়ারী জানালায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। দিনাজপুরের এ অঞ্চলটায় পূর্ব-বাংলা বা পশ্চিম-বাংলার মত তাল, নারকেল সুপারি গাছ চোখে পড়ে না। আর একটা জিনিস সে এ অঞ্চলে খুব দেখেনি, সেটা হল, পানবরজ। গৃহস্থরা আমগাছের ওপর পানের লতা তুলে দিয়ে পানগাছ বাঁচিয়ে রাখত। সে পান খেতে ভাল নয়। আকারেও ছোট। বেলিয়া-ডাঙ্গির থানার কত জায়গায় ঘুরল পিয়ারী, কত দেখল। দেখল

বেউরঝারি, চোরোগেদি, মুলমুলা, বাঁশবাড়ী, রত্নাই, ছোয়ালভিটা, দোমানি। আর গ্রাম দেখেছে ঠগ্‌বস্তী, গোয়ালটুলী, ধাইপারা, কানা-ভিটা, আরও কত। এর উত্তরে আটোয়ারীথানা, তারপর বোদা, তারপর সুরু হয় জলপাইগুড়ি। আরও পুবে যাও, হলদিবাড়ী, মণ্ডলবাড়ী, এদিকে পঁচাগড়। এর মাঝে একদিন রুইয়া বেড়াতে গেছিল। দেখেছে নাগরনদী মালিপারার কাছে কেমন মাঠের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এছাড়া নাগরনদীর পারে গর্তের মধ্যে পাখীর বাসা দেখেছে। যারা তীরে উঁচু খাড়ির ওপর দাঁড়ালেই ফুরুৎ করে দল বেঁধে উড়ে পালায়। নদীর স্বচ্ছ জলে বালির চড়া পড়েছে। কতদিন সে নদীর জল ভেঙ্গে পার হয়েছে, কতদিন দেহের ঘাম নদীতে বিসর্জন দিয়েছে। গাছে গাছে ফিঙে, বুল্‌বুল্‌, শালিক, কোকিলের কত আনন্দ নর্তন। কতদিন জরীপ করতে করতে নদীর পারে ঘাসভরা প্রান্তরের উপর ছায়ায় শুয়ে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। তখন শুনেছে ঘুঘুর ডাক, দেখেছে হরিতাল পাখীর পাতার আড়ালে আত্মগোপন।

উত্তর পাড়িয়া উদয়পুর, আঞ্জামঘোর, নদীর পশ্চিম তীরে বেনীকানর, ভেলাগাছি মৌজাগুলি ভবিষ্যতেও থাকবে, সেখানে নাগর নদীও, তার তীরের বনশোভা নিয়ে অব্যাহত চলবে : থাকবে না শুধু তারা, আজকের এই পার্টি। আবার ভবিষ্যতে হয়তো নতুন সার্ভেব দল আসবে, ক্যাম্প করবে, মাপ-জোক্‌ হবে, কিন্তু ওরা স্মরণ করতে পারবে না, তাদের স্মৃতি, তারা কোন দাগে দাঁড়িয়ে কি দুঃখ, ক্লান্তি, আনন্দের অনুভূতি বহন করেছিল। রাতে এই জানালায় বসে স্মরণে আসে, কতদিনের চিঠি না পাওয়ার উৎকণ্ঠা, হঠাৎ সুনামের আনন্দ, কর্মসমাপ্তির আগ্রহ। ঐ তো গয়ানাথের বাড়ীর আড়াল দিয়ে চাঁদ উঠেছে কোনদিন সন্ধ্যায়, কোনদিন মধ্যরাত্রে। নদী, গ্রাম, গাছ, মানুষ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পাটের চাষ হয়েছে—জ্যৈষ্ঠে, নীল আকাশের নীচে তাদের নধর দেহে কেমন সুন্দর পান্নার রং ধরেছে। শ্রাবণের বৃষ্টিতে তারা ভিজেছে। শেষে তাদের কেটে হয়েছে ধান চাষ। তখন বাদলে, ঘোরঘনঘটায় জেগেছে কি দুঃখ, যেমন জাগত রাসপাতা মহম্মদপুর বাঁধের উপর বসে। কিন্তু আমিনদের বিবাহিত জীবন তো কেবল দীর্ঘঃশ্বাস। কত অলস মধ্যাহ্ন

ও স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, বৃথা পার হয়ে গেছে, তবু উপায় নেই দেশে যাবার।...

চিন্তায় বাধা পড়ে, বীরেন মাইতি এসে বলেন, "আজ লেখা হল, এখানকার কাজ শেষ, এই রিটার্ণই হয়তো শেষ রিটার্ণ। পিয়ারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, উঃ, কতদিন শহর, গাড়ী, রেল, দোকান দেখেনি সে। পেস্কারবাবু বলেন, "গত রিটার্ণ খারাপ হয়েছিল, চার্জ অফিসার কি লিখেছিলেন জান?" পিয়ারী তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। পেস্কার বলে, "খাম খুলতেই দেখি, রিমার্কের ঘরে কিছু লেখা নেই, শুধু একটা আঙ্গুল প্রমাণ ফুলের ডাঁটি। প্রথমে তো বুঝতে পারিনি, কি ব্যাপার। শেষে অফিসার বললেন, "এর মানে তোমাদের রিটার্ণ খুব কম, তোমাদের লাঠি পেটা দরকার।" দুজনেই হাসতে থাকে।

পূজোর ছুটির কদিন আগে রায়গঞ্জে বদলীর আদেশ পেল। জিনিসপত্র রেকর্ড, ম্যাপ, সবকিছু ঠাকুরগাঁও সার্কল অফিসে জমা দিতে হবে। খাড়ু—দেশে গেল শুক্রবার, দুর্গোপূজোর পর রায়গঞ্জে জয়েন করবে। শনিবার গরুর গাড়ীতে তারা রওনা হল। অফিসার গেলেন সাইকেলে। পিয়ারীর গাড়ীটা শেষে, আগের গাড়ীতে পেস্কারবাবু ও অন্য সকলে। গ্রামের সকলে ভীড় করে বিদায় দিল। বিজন্দরের শিশু কন্যা দাহুরি সর্বদা পিয়ারীর কাছে পিতলের টুলটুলিয়া ( নথ ), সোনা ( দুল ) দুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো, সেতো কেঁদেই ফেলল। ওর জন্য পিয়ারীর খুব কষ্ট হল, আর কষ্ট হল কালো নেড়ী কুকুরটার জন্য, যাকে ও প্রায়ই ভাত না দিয়ে অন্য কুকুরকে দিত। খাড়ু শেষে ওকে ভাত দিত। কুকুরটা গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে শ্মশানের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যতক্ষণ না ওরা চোখের আড়াল হয়ে যায়।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

গ্রামে খুব কলেরা লেগেছে। ক্ষুদিরামের বাবা ও পিসী দুজনেই গেছে, মণিমোহনের ছোট ভাই মারা গেছে। ওদিকে মুসলমানপাড়া প্রায় ফর্সা। খবরটা সে পায়নি, তবে কলকাতায় খবরটা পেয়ে মজুমদারদের

পশ্চিম শরিক, চক্রবর্তীরা, চৌধুরীরা ঠিক করেছে এবার দেশে আসবে না। সকলেই গোমস্তা দিয়ে পুজো সারবে। শুধু মজুমদার বাড়ীর ছোটকর্তা দেশে থাকবেন, তিনি বরাবরই দেশে থাকেন। কলেরা লাগার আসল কারণ হল, ইলিশ মাছ। রাজবাড়ীর বরফের কলটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় কয়েকদিন গোয়ালন্দের পদ্মার ইলিশ কলকাতায় পাঠান সম্ভব হয় নি। মাছ পচে ওঠে। সে মাছ, এদিকে ওদিকে বাজারে ফরিদপুরে, খানখানাপুরে, কালুখালি, বহরপুর, মধুখালি প্রভৃতি অঞ্চল ছেয়ে ফেলে। অসম্ভব সস্তা ইলিশ। একটা ইলিশের দাম এক পয়সা, দুপয়সা। লোকে ইলিশ মাছ পাঠিয়ে গ্রাম্য ভদ্রতা শুরু করল। দরিদ্র মুসলমানরা ভাতের বদলে পাকা দেখে ( লাল, পচা ) মাছ কিনে ঝুড়ি. ঝাল করে খেতে লাগল। অসুখটাও লাগল ওপাড়া হতেই এবং দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। দিন পনেরো পরেই বরফের কল আবার মেরামত হল, বাজার আবার ইলিশহীন হল।

পিয়ারী বাসায় এসে জল গরম করতে বলল। কালিবাড়ীর টিউবওয়েল হতে জল নিজেই নিয়ে আসত। ক্ষুদিরামকেও সাবধান হতে বলল। গোপালগঞ্জ হতে সরকারের লোক এসে কিছু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে গেল। এবার পূজোর প্রথমটা যেন তেমন জমেনি। সকলের কেমন ভয় ভয় ভাব। পেট কামড়ালেই লোকে চমকে ওঠে, কলেরা নয়তো! গ্রামে বেশী লোক নেই। একটা ঢাকি খুঁজে পাওয়া ভার, কতগুলো মারা গেছে, কেউ কেউ আবার ভিনগাঁয়ে ভেগেছে। ক্ষুদিরামের অশৌচ, সে চৌধুরীদের মণ্ডপী হতে পারবে না, তাছাড়া ওর মনের অবস্থা ভাল নয়। পারুলবালা বলল "অন্যখানে যাবি নাকি ?" পিয়ারী বলে, "কোথায় যাবে মা ? দেশ ছাড়া আর আমাদের কোথায় জায়গা আছে।" পারুলবালা চুপ করে।

তবু ঢাকি, মণ্ডপী জোগাড় হল, প্রতিমা মণ্ডপে উঠল, ঢাকের পিঠে কাঠি পড়তেই সমস্ত গ্রামখানি চনমন করে উঠল। তার সঙ্গে যোগ দিল প্রকৃতি। শরতের হলুদ বর্ণের রৌদ্রকিরণ, পথিপার্শ্বের কাশবন, শেফালিকা ফুল, সাদা মেঘ, এরা মা দুর্গার পূজোর আসর জমিয়ে দিল। মনটা সবার প্রসন্ন হল। মহামারীর ভয়টা কমেছে। পিয়ারী ছেলেকে

কোলে করে ভাইকে নিয়ে ঠাকুর দেখে এল। পারুলবালার ডাক পড়ল মজুমদার বাড়ীর পূজোর নৈবেদ্য সাজাতে। খুব ভোরে উঠে সে চলে যেত স্নান করে, ও বাড়ীর নৌকো তাকে নিতে আসত, আবার দুপুরে দিয়ে যেত। জ্ঞানদাবাবু লক্ষীকে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুরবাড়ীতে। বললেন, "ওরাইতো তোর সব। আমরা তো দুদিনের মাত্র।" এবার পুজোতে লক্ষী তাই ছিলনা। লক্ষীর সঙ্গে তার আর দেখাও হয়নি।

এটা হল ইংরিজি ১৯৩৮ সনের পূজো। সেই দুর্ভিক্ষের বছরে ১৯৪৩ সনে. ফরিদপুরে সে গিয়েছিল দেখা করতে। তখন সে শিবরাম-পুর ক্যাম্পে। খুব আকাল দেশে। মন্বন্তর। গ্রামের সব পালাচ্ছে। চাল অগ্নিমূল্য। মা বৌ, ভাই, ছেলে সবাই তখন শিবরামপুরে, খুব অভাব চলেছে সংসারে। চাল নেই, ডাল নেই, ছেলের দুধ নেই। অসহনীয় অবস্থা চলেছে। দশ তারিখের পরে একটা পয়সা নেই হাতে। কে কাকে দেখে, কে কাকে সাহায্য করে। বাজারে যা আসছে, মিলিটারী পুলিশে ঝকঝকে নোট দিয়ে কিনে নিচ্ছে। পিয়ারীলাল কিস্তোয়ারের সময় জঙ্গলের মধ্য হতে পেঁপে, চালতে, সজনে তুলে আনত। কিন্তু তাতে ছাই কী হবে। দলে দলে লোক যাচ্ছে কলকাতার ফুটপাথে অন্ন খুঁজতে। সেখানে শহরে বড় বড় লোক থাকে, তাদের বড় মনের কাছে দাঁড়ালে তারা কি ফিরিয়ে দেবে! কিন্তু তারা বড্ড ভুল করেছিল, তারা জানত না—সেবা নেবার যাঁদের অভ্যাস, অন্যকে সাহায্য করবার স্পৃহা তাদের থাকে না।

একদিন বাজরার আটা খেয়ে কাটল। পরদিন আর মাঠে যাবার শক্তি নেই। এদিকে বাজরা খেয়ে অনেকের দাস্ত-বমি হচ্ছে। ইংরেজ সরকার তখন খাদ্য জোগাতে পারছে না, তাদের নাভিশ্বাস। এদিকের সেট্‌লমেণ্টের অফিসাররা ওয়ার ফ্রণ্টে টাকা তুলে দিয়ে নাম কিনছেন ইংরেজ মহলে। ভারতবন্ধু তারা। কংগ্রেস প্রস্তাব নিয়েছে, অসহযোগের। চারিদিকে আন্দোলন ফেটে পড়েছে। সুভাষচন্দ্র ভারতে নেই।...

পিয়ারীর মনে একটা চিন্তা এল। আচ্ছা লক্ষীর বর তো এখানে

সার্কল অফিসার, যাইনা কেন ? খেতে পাচ্ছিনা, লজ্জা কী ? ওর বাবাতো বরাবরই আমাকে সাহায্য করেছে। ট্রেণে উঠে ফরিদপুর ষ্টেশনে নেমে, হাঁটতে হাঁটতে গেল কমলাপুরের দিকে, যেদিকে তাঁর কোয়ার্টার। তারদিয়ে ঘেরা বাড়ী, দুতিন জন ভদ্রলোক সুন্দর পোষাক পরে বাইরে গল্প করছে। খবর নিয়ে জেনেছে, এটাই সার্কল অফিসারের বাড়ী। পিয়ারী ঢুকতে যাবে, একজন তার ধুলিধুসরিত পা, ঘর্মাক্ত শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "কোথায় যাবে ?" পিয়ারী লক্ষীর জামাইকে একদিন দেখেছিল, তাই চিনল। সে ঢোঁক গিলে বলে, "এই ইয়ে, মানে, আমাদের গ্রামের, মানে আমি লক্ষীর গ্রামের, আমাদের পাশের বাড়ী।" অন্য দুজন ওর কথাবার্তার রকম দেখে হো হো করে হেসে ওঠে। সার্কল অফিসার বিমল মুখার্জির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বল্লেন, "দেশের লোক বলেই মাথা কিনে নিয়েছ। সে এখন বাড়ী নেই, দেখা হবে না।" পিয়ারী ফিরে আসে। ফিরে যাবার পয়সাও তো নেই। পেছনে ভদ্রলোকদের উচ্চ কণ্ঠে আলোচনা ও মন্তব্য এখনও তার কানে আসছিল। তাড়াতাড়ি সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, ভাবল. তার যত অপমানই হোক লক্ষী যেন শুনতে না পায়, যে তার পিয়ারীদাকে অযথা অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। চোখে জলের ধারা নামছিল। হেঁট হয়ে মুছে ফেলে। টাকা অবশ্য সেদিন যোগাড় হয়েছিল, হাতের বিয়ের আংটিটা চকবাজারে স্যাকরার দোকানে পনেরো টাকায় বেচে।

পূজোর পরে পিয়ারী খুব ঘুমোল কদিন। ভালকরে বেড়া বাঁধল, যাতে মঙ্গলা ডাঁটাক্ষেত খেয়ে না ফেলে।

পচা কচুরিপানা পুকুর হতে জড়ো করে ধাপ বাঁধলো, ওর ওপর লাউগাছ বেশ নধর হবে। কচুরি ধাপ করার সময় ওর নীচ হতে বড় বড় কই মাছ পাওয়া গেল। ময়লা ছেঁড়া লেপগুলি ঝেড়ে রোদ্দুরে দিল ; শীত তো এল বলে। মা বলে, "তুই এর একটা লেপ নিয়ে যা বাবা, শীত তো এল বলে। তোর কাঁথাটা তো গেছে।" পিয়ারী বলে, "না আমি গিয়ে রায়গঞ্জ বাজারে একটা কিনে নেব।" পিয়ারী ভাবখানা এমনি করে যেন ইচ্ছে করলে এক্ষুনি কিনতে পারে। শুধু এখানে মেলে

না এই যা, দুঃখ। পিয়ারীর খুব সখের গৈরিক খদ্দরের পাঞ্জাবিটার ঘাড়টা কেটে উঠেছে। রাধু সযত্নে সেটা সেলাই করে।

বনো বলে 'আচ্ছা বৌদি, মজুমদারদের মনসাঘরের পেছনের পুকুরে নাকি দুটো কলসী আছে টাকা আর মোহর ভর্তি, তাদের মুখে সাপ পাহারা দেয়। সে দুটো নাকি ঐ পুকুরের মধ্যে গর্ত দিয়ে কালিবাড়ির পুকুরে যাতায়াত করে?" রাধু বলে, "হুঁ। ওদের সপ্তম কি অষ্টম পুরুষে নাকি পাবে ঐ টাকা।" বনো অবাক হয়ে শোনে। পিয়ারী বলে, "ঐ টাকা হল ওদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা সদাশিব মজুমদারের তিনি রাজা রাজবল্লভের দেওয়ান ছিলেন। ও টাকা অন্য কেউ ছুঁলে দেখবে শুধু শামুক ভর্তি। তাছাড়া বড় বড় দুটো সাপ জড়িয়ে আছে ঐ কলসী।" বনো অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। পিয়ারী বলে, "এ আর কি, কাজিটোলায় একটা দিঘি আছে, সেখানে সোনার থালা, বাসন-কোসন থাকত। লোকের বিয়েতে, নেমন্তন্নে দরকার হলে উপোস করে ভক্তি-ভরে প্রার্থনা করলে খুব ভোরে সোনার একখানা নৌকো এসে দিয়ে যেত ঐসব বাসন কোসন। লোকের কাজকর্ম মিটে গেলে তারা আবার ধুয়ে মেজে রেখে আসত রাত্রে। ঐ নৌকো এসে নিয়ে যেত। কেউ নৌকো দেখেনি।" রাধু বলে, "সত্যি, তারপর?"

পিয়ারী বলে, "তারপর একজন ব্রাহ্মণের একবার লোভ হয়। সে কাজকর্মের পর একটা বাটি চুরি করে রাখল, ভাবল কেউ টের পাবে না। কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে দেখে সেই সোনার বাটির জায়গায় মাটির বাটি পড়ে আছে। আর কোনদিন সোনার বাসন কাজিটোলার দিঘিতে ওঠেনি।" বনো বলে, "লোকটা সেই চাষী আর সোনার ডিমের গল্প তো পড়েনি। তাই বোকার মত চুরি করল।"

দুপুরে পিয়ারী, পিণ্টুকে খালি আদর করে। পিণ্টু দুবছরের হয়েছে, হাঁটে, আধো আধো, হঠাৎ হঠাৎ কথা বলে সবাইকে আশ্চর্য করে দেয়। বাবাকে দেখলে দুহাতে গলা জড়িয়ে বাবার কাঁধে মুখ লুকোয়। পারুলবালা বলে, "ওর সোহাগ দেখ। নাম আমার ছেলের কোল থেকে।" রাধু হেসে ওঠে। সবাই হাত বাড়ায়, কারুর কোলে যাবে না, বাবার কোল থেকে। এমন কি রাধুর কোলেও নয়। মা

বলে আজকালকার ছেলেরা যেন বাবাকেই বেশী চেনে, মার চেয়ে।' পিয়ারীর মনে হয়, তার ছেলের প্রত্যেকটি চাল চলন অসাধারণ। এত ছেলে বাংলা দেশে সে দেখল কেউ তো এমনি সেয়ানা হয়না, এই বয়সে মা, ছেলে বৌতে কত আলোচনা চলে।

বনো বলে, "পিণ্টুটা বড় হয়ে একটা লাট সাহেব হবে, দাদা। দেখছ কেমন তাকায়।" রাধু জানেনা লাট সাহেব কি। কিন্তু পিয়ারীর চোখের ওপর বিরাট সিংহ দরজাওয়ালা বাড়ী ভেসে ওঠে, কত আলো ফুলগাছ, তার মধ্যে। বনো বলে, এই "পিণ্টু, তুই বড় হলে কি হবি?" পিণ্টু গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বলে, "লাট সাহেবটা হমু।"

॥ দুই ॥

নভেম্বরের এক সোমবার পিয়ারী রায়গঞ্জ এসে যোগদান করল। এসে শুনল, তাকে আর খাড়ুকে যেতে হবে ইটাহার থানায়। খাড়ুর চাকরী অবশ্য ছিলনা, নতুন জায়গায় জয়েন করে তার চাকরী আবার শুরু হল। বহুকষ্টে সে আর খাড়ু এক গরুর গাড়ী করে সেখানে পৌঁছল। সারাদিন শুকনো চিঁড়ে আর গুড় চিবিয়ে সন্ধ্যায় ইটাহার পৌঁছল। বৃদ্ধ সার্কল অফিসার সামন্ত মশাই চমৎকার ব্যবহার করলেন। শুনল, তাদের যেতে হবে আরও দূরে সৈদপুরে। সে রাতে আর কোন কথা না বলে মাটিতে বিছানা খুলে দুজনেই খুব ঘুমোল। ভোরে উঠে দেখে পিঠে গায়ে, হাতে পায়ে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। নিশ্চয় গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনিতে। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আবার যাত্রা। সেই গরুর গাড়ী, কাঁচা রাস্তা ধরে চলল মাঠের মধ্য দিয়ে। আজ পিয়ারীর মনে হয় তবু সে দিনগুলি মন্দ যায়নি। অর্থাভাব থাকলেও, নিদারুণ দারিদ্র্য এসে আঘাত করেনি। সে হয়েছিল যুদ্ধের সুরুতে। সে যে কি কষ্ট, একমণ চাল জোগাড় করতেই মাইনে শেষ প্রায়। কাপড় তো আশমানের তারা। টাকার মূল্য কমে যেতে সুরু করল। জাপানের যুদ্ধ লাগবার পরে তো আরও কষ্ট সুরু হল। দেশে মা বৌকে রাখা যাচ্ছিল না, কিছু পাওয়া যায়না। ভাইটা পড়ছে, তার মাইনে। ছেলেটাও পড়া

শুরু করেছে। পিয়ারী ভাবে, যা কিছু তার সুখ গেছে দিনাজপুর সেটলমেণ্ট পর্যন্ত মৈমনসিংএ যতদিন ছিল তবু একরকম চলছিল, এরপর জীবনে সে আর স্বাচ্ছন্দ্য দেখেনি। সন্ধ্যায় তারা পৌঁছে গেল, গন্তব্য-স্থলে। একদম পাড়াগাঁ, কোন বৈচিত্র্য নেই। রাত কাটান হল কানুনগো সাহেবের ক্যাম্পে। ভোরে পিয়ারী আর খাড়ু বেরোল, একটা আস্তানা খুঁজতে। একটা অতিরিক্ত গরুর ঘর ছিল, মণিমোহন দাসের বাড়ীতে, সেটাই কোনমতে ঠিক করে নেওয়া হল। একটা দড়ির খাটিয়াও মিলল, তাতেই শোয়া। খাড়ু মাটিতেই বিছানা পেতে ফেলে। রান্নাবান্না হল বাইরে কাঠ-পাতা দিয়ে। কাজ শুরু হল। কাজের সময় ভোর পাঁচটা হতে বারোটা। খাড়ু একটু আগে চলে আসত রান্না করতে।

এখানে এসে বাড়ীতে এসে প্রথম যে চিঠি লিখেছিল তার উত্তর এল প্রায় একমাস পরে, ডিসেম্বরে। রাধু লিখেছে, খুলনার সতীশবাবু মারা গেছেন, গত পুজোর ঠিক একমাস পরে। তিনি বেরোচ্ছিলেন উকিলের বাড়ী যাবেন বলে। চৌকির নীচে একজোড়া পাম্প ছিল বহুদিনের অব্যবহৃত। পায়ে লাগে বলে কেনার পরে আর পরাই হয়নি। সেদিন কি খেয়াল হল পুরানো চটি পায়ে না দিয়ে হঠাৎ সেটাই মুছে পায়ে দিলেন। বেরুতে যাবেন, হঠাৎ ঘুরে পড়ে গেলেন। সবাই দৌড়ে এসে ধরল, কি ব্যাপার? সতীশবাবু একবার শুধু বললেন, 'জুতোর মধ্যে কি যেন কামড়েছে।' জুতো খুলে দেখা গেল কেউটে সাপের ছোট একটা বাচ্চা। তৎক্ষণাৎ ওটাকে মারে, কিন্তু সতীশবাবুকে আর বাঁচান যায় না। রাধু আরও লিখেছে, মামার শোকে মা শয্যাগত। অন্নজল ত্যাগ করেছেন, ইত্যাদি। চিঠি পড়ে তো পিয়ারী স্তম্ভিত। সতীশদাদুর বাড়ীতে সে বাবার সাথে ছিল। কত ভালবাসত তাদের। তার বিয়ের সময় তিনি কতো আনন্দ করেছেন। তার এরকম মৃত্যু হল! চোখের জলে পিয়ারী চিঠি আর পড়তে পারে না। পরদিন আর সে কাজে বেরোল না, সারাদিন শুয়ে রইল। খাড়ু অনেক সাধ্যসাধনা করে কিছু খাওয়াল।

পিয়ারী গিয়েছিল, কানুনগো সাহেবের ক্যাম্পে ফটো শীট আনতে। গিয়ে দেখে কিরণবাবুর এক বন্ধু এসেছে, তিনিও কানুনগো, পাশের

ছকায়, নাম বিনয় গোস্বামী। কিরণবাবুর বয়েস বছর আঠাশ, কালো চেহারা, শক্ত গড়ন। বিনয়বাবুর বয়েস কিছু বেশী, রং টকটকে লাল, পাতলা ছিপছিপে লম্বা গড়ন। তিনি সাহেবের হাত দেখছেন। পিয়ারী নমস্কার করে দাঁড়াল। কানুনগো ইসারায় একটু অপেক্ষা করতে বলেন। সাহেবের বন্ধু বলছেন, "তোমার ফর্চুন লাইন চল্লিশের পরে খুলবে, এই দেখনা, এখানে এসে আর কোন কাটাকুটি নেই, বলে তিনি আঙুল দিয়ে হাতের একটা রেখা দেখান। কানুনগো স্বল্পবাক লোক, কোন কথা বলেন না। বন্ধু বলেন, "মুস্কিল হল, তোমার সানলাইনটা অত্যন্ত ডিসটারবড, তাছাড়া বৃহস্পতির ক্ষেত্র তো তেমন উঁচু নয়।" কানুনগো জিজ্ঞেস করেন, "তারপর?" বন্ধু উৎসাহ পেয়ে বলেন. "তবে তোমার সবচেয়ে বন্ধু হল ঐ শনি। ওই তোমাকে শীঘ্র প্রমোশনের পথে ঠেলে দেবে।" আর্দালী এসে দুকাপ চা দিয়ে গেল। হাত দেখা বন্ধ হল। পিয়ারী ঘরের কোনের টিনের চোঙ্গা হতে শীট নিল। আর্দালী পিয়ারীকেও এক গ্লাস চা দিল।

বিনয়বাবু বলেন, "ওদিকে পশ্চিমে যেমন গরম চলছে, যুদ্ধ তো লাগল বলে। হিটলার ক্রমাগত হুঙ্কার ছাড়ছে।" কানুনগো বলেন, "কাগজ তো প্রায় দুমাস দেখি না। খবর টবর বল। দুমাস আগের খবরও বলতে পার স্বচ্ছন্দে।" দুজনেই হাসতে থাকে। বন্ধু বলেন, "আর একটা কথা হল, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শরীরের অবস্থা তেমন ভাল নয়। আবার কংগ্রেসের খবরতো শুনেছ। সুভাষবাবু কি করেন এই হল দেখবার।" কানুনগো শুধোলেন, "যুদ্ধ যদি লাগে, ঢেউ কি এদিকেও আসবে নাকি?" বন্ধু বলেন, "এবার যুদ্ধ হলে বিশ্বযুদ্ধ।" পিয়ারী আগ্রহের সঙ্গে শোনে। কানুনগো বলেন, আমার রায়গঞ্জ থানার বুঝারতের নোটটায় সার্কল অফিসার খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মনে হয় চার্জ অফিসার হ্যাচ্ বার্ণওয়েল এসে লাগাতে পারে। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা চার্জ অফিসার সম্পর্কে তোমার কি আইডিয়া?" কানুনগো সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন, "ঐ একই রকম, রাজা কর্ণেন পশ্যতি। আমার নোট দেখলে না, কিছু

না, দেখবে, এসে আমায় গালাগালি দেবে।" বিনয়বাবু চুপ করে থাকেন।

কানুনগো পিয়ারীকে নিয়ে বাইরে এলেন কতগুলি দরকারি কথা বলতে। কাজের কথা শেষ হলে, বলেন, "দেখ পিয়ারী, এ ডিপার্টমেণ্টটা বড্ড নোংরা হয়ে গেছে, কেউ কাজ চায় না, চায় শুধু তেল। আমি কি কাজ করি কেউ দেখছে না, আমি কেন মাঝে মাঝে গিয়ে সার্কল ক্যাম্পে আসর জমাই না, এই হল সামন্তমশাইর অভিযোগ। পিয়ারী প্রত্যুত্তর করে, "না ভালই হবে। তাছাড়া আপনার বন্ধু হাত দেখে যে বললেন··· ।" সাহেব হেসে জবাব দেন, "বিনয়ের হাত দেখা বোগাস। আর ওতো প্রতি মাসেই একবার এসে হাত দেখে যায়।" পিয়ারী অবাক হয়ে যায়।

ইংরেজি ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে চার্জ অফিসার মিঃ হ্যাচ্-বার্ণওয়েল সাহেব সত্যিই এসেছিলেন। তিনি কিরণবাবুর বুঝারতের নোটটাকে সত্যিই কিন্তু অরিজিনাল বলে প্রশংসা করে যান। শুধু যাবার সময় একটা কথা বলেন, "লুক সেন, আমি কান দিয়ে দেখি না, নিজের চোখেই দেখি। আমি তোমাদের ইণ্ডিয়ান অফিসার নই।" কিরণবাবুর বুঝতে আর বাকি থাকেনি, শেষের কথা কে লাগিয়েছে। আর বিনয় গোস্বামী প্রতি মাসে কেন যে তার কাছে আসে এটাও বোঝা গেল। শুধু খবর সংগ্রহ করে ওপরে লাগানো, যাকে বলে ক্লিক করা। কিরণ সেন, বিনয়গোস্বামীর নাম পরে দিয়েছিলেন, "ক্লিকের রাজা।" পিয়ারী বহুদিন পরে যখন সখের বাজারে পোষ্টেড ছিল, তখন দেখেছে, গোস্বামী সাহেব প্রমোশন পেয়ে অনেক দূর উঠে গেছেন, প্রায় কিরণ সেনের মাথার ওপর। কিরণ সেন তখন সাব-ডেপুটি চার্জ অফিসার। অথচ তাঁর মত একজন সত্যিকারের ভাল অফিসার বিরল। বাইরে যেমন ব্যক্তিত্ব, তেমনি প্রচলিত ভূমি-আইনগুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। পিয়ারী মনে করে, ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের জ্ঞান বেশী, ব্যক্তিত্ব বেশী হওয়াই হয়তো উন্নতি না হওয়ার একটা কারণ। কিন্তু যাক সে কথা। এ গ্রামে আর একজন ডাক্তারকে পিয়ারীর খুব ভাল লাগত। নাম শঙ্করী প্রসাদ হালদার, বাড়ী হাওড়া জেলার বালীতে।

বেশ রসিক আর মিশুক লোক ছিলেন তিনি। কিরণবাবুর মত লোকও ওঁর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন, তার কারণ হল শঙ্করীবাবুর মনটি ভাল, আর তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত ভদ্রলোক। হাওড়া জেলার লোক তিনি, কি করে এখানে এলেন, জিজ্ঞেস করলে হাসতেন, জবাব দিতেন না। খুব ভোরে উঠে এক পেট দই-চিঁড়ে খেয়ে ব্যাগ হাতে নিয়ে সাইকেলে বেরোতেন। ধুতি শার্টের ওপর পরা, মাথায় টুপি। রাত্রে মাঝে মাঝে ক্যাম্পে আসতেন গল্প করতে। গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। পিয়ারীর মনে আছে, তাঁর স্কুল জীবনের গল্প।

'ক্লাস এইটে পড়েন দেশের স্কুলে। পণ্ডিত মশাইর নাম ছিল হৃদয় ভূষণ ভট্টাচার্য্য। গোলগাল গড়ন, নাদুস-নুদুস চেহারা, মুখের দু'কস পানের রসে লাল, চুল ছোট করে ছাঁটা। সব সময় তিরিক্ষি মেজাজ। ছেলেরাও তেমনি, পণ্ডিতের পিছনে লেগেই আছে।

সেদিন বাসায় পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে উনুনে চড়ান ডালের দিকে নজর রাখতে বলে এক বালতি জল আনতে গেল। এদিকে ডাল উথলে উঠতেই দিশাহারা হয়ে তিনি পুরো এক শিশি তেল তার মধ্যে ঢেলে দিলেন। ব্রাহ্মণী এসে তো মহা খাপ্পা। বলেন, "এতবড় অপদার্থ তুমি, পুরো এক শিশি তেল তুমি ডালে ঢাললে। খেও, ভাত না খেয়ে ছাই খেও।" ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে ক্লাসে এল না খেয়েই। প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাসে যেতে দিলীপ বলে একটি ছেলে উঠে বলে, "স্যার মতি শব্দের রূপ বলব?" সে আরম্ভ করে দেয়, "মতি, মতি, মতয়ঃ, মতিম ··।" পণ্ডিত মশাইর স্ত্রীর নাম মতি। তিনি চিৎকাব করে ওঠেন যন্ত্রণায়— উঃ বাসায় মতির জ্বালা, আবার এখানে! বেত উঁচিয়ে আসতেই দিলীপ বসে পড়ে। মনীশ লাফিয়ে উঠে বলে, "তবে স্যার হা, হা শব্দের রূপই বলি?" বলেই সুরু করে, "হা হা, হা হৌ, হা হা হাহাম্, হাহো, হাহা, হাহা, হাহাভ্যাম্, হাহা, হাহা হাহে·· ।" সমস্ত ক্লাসই ওর সঙ্গে হা হা করে হাসতে থাকে। পণ্ডিত মশাই রাগ করে চলে যান ক্লাস হতে, আর ফিরে আসেন হেডমাষ্টারকে নিয়ে। সমস্ত ক্লাস তখন নিস্তব্ধ ও গভীরভাবে পাঠে মগ্ন।'

ফিরণবাবু ও আর সবাই শুনে হাসতে থাকেন, প্রাণ খুলে। শঙ্করীবাবু বলেন, "শুনুন, সেবার ক্লাস নাইনে, "পঞ্চতন্ত্রম" তো সুরু হল। প্রথম গল্পটি মনে আছে তো, সেই রাজার মূর্খ ছেলেদের কথা ? রাজা তাদের শিক্ষার ভার দিলেন বিষ্ণুগুপ্তর হাতে। বিষ্ণুগুপ্ত তাদের জন্য তৈরী করলেন, শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত। গল্পটা পড়ানোর পরে একদিন দিলীপকে বল্লেন, "দিলীপ, মানে বলত, অনন্তপারং কিল শব্দ শাস্ত্রম্, স্বল্পতথায়ুর্বহ-বশ্চ বিঘ্না।"

দিলীপ হাতের মুঠো পাকিয়ে দেখিয়ে বলে, "স্যার এর মানে হল, এই কীল ( ঘুষী ) শব্দ অনন্ত, তাতে আয়ুও স্বল্প হয়, বিঘ্ন অনেক।..." ব্যাখ্যা শুনে পণ্ডিতের চক্ষু তো স্থির। দিলীপকে মারবেন কি, হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েন আর কি। কিরণবাবু, পিয়ারী হাসতে থাকে। আরও কত গল্প। শান্তিপুরের ভদ্রতার গল্প।

'শান্তিপুরের ভদ্রলোকেরা নাকি, কুটুম এলে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলে, "চলে যাচ্ছেন ? ইচ্ছে ছিল, একটু জাল ফেলতাম পুকুরে। ট্রেন তখন ছাড়ার হুইসিল দিচ্ছে।' কিরণবাবু বলেন, "যদি ঐ চলন্ত ট্রেন হতেই অতিথি 'তবে রে' বলে লাফিয়ে পড়ে ? তখন কি করবে শান্তিপুর-বাসী ?" শঙ্করীবাবু বলেন, "তখন হয়ত মুখ বেজার করে বলবে, 'এই দেখুন, ট্রেনটা ছেড়ে দিলেন। মাছ ধরার লোকটাও ত নেই, শ্বশুরবাড়ী গেছে।' কিরণবাবু বলেন, "তা বটে।"

বেশ চলছিল জীবন। রাতে লণ্ঠনের আলোতে ছায়া ছায়া রহস্যময় ভাব। মাঝে মাঝে ঐ আলোতে কাজও হচ্ছে, গল্পও চলছে। আবার দিনের বেলায় খোলা মাঠে রোদে পুড়ে কাজ হচ্ছে।

এরপর খবর হল যুদ্ধ বেধেছে, উরোপে। জার্মানি আক্রমণ করেছে, ইংলণ্ড। শঙ্করীবাবু কাগজের অফিসে টাকা জমা দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা আনাতে লাগলেন। প্রত্যহ শত শত বিমান ইংলণ্ড আক্রমণ করছে, তার বিবরণ। উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলত। পিয়ারী মন দিয়ে শুনত কিন্তু ভালো বুঝতে পারত না, যুদ্ধ কি। কি করে বিমান হতে বোমা ফেলে। মনে হয়, রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ যেমন মেঘের আড়াল হতে রাম লক্ষ্মণের উপর বাণ বর্ষণ করত, তেমনি কিছু হবে।' কিরণবাবু আর

শঙ্করীবাবু রোজ পোষ্ট অফিসে গিয়ে কাগজ নিয়ে আসতেন। পিয়ারী তার দৈনন্দিন নিয়মে কাজ করে চলছে। জুন মাসের মধ্যে নির্দ্ধারিত কাজও শেষ হয়ে এল। সুরু হল তজদিগের কাজ। আকাশে বর্ষার মেঘ দেখা দিল। কিরণবাবু রেভিনিউ পাওয়ার পেলেন কিন্তু বদলী হলেন, পার্বতীপুর থানায়, সেখান হতে শেষে তিনি ফরিদপুর সেট্‌লমেণ্টে বদলী হন। পিয়ারীও মৈমনসিং ঘুরে ফরিদপুরের বহরপুরে বদলী হয়। কিন্তু তুজনের মধ্যে আবার দেখা হয় অনেক পরে কলকাতায় আলিপুরে।

কিরণ সেনের বদলীর পরে যিনি এলেন, তার নাম বিহারীলাল পট্টনায়ক। এলেন দিনাজপুর হতে। ইনি তজদিগ করবেন। ভদ্র-লোকের বাড়ী মেদিনীপুরের তমলুকে। বয়স হয়েছে এবং খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। এর সামনে কথা বলতেই ভয় হত পিয়ারীর। এমনকি কিরণবাবুর সময় যে সান্ধ্য মজলিশটুকু ছিল, সেটুকুও উঠে গেল। শঙ্করী বাবু একদিন আলাপ করতে এলেন, পরে আর আসতেন না। পিয়ারী মাঝে মাঝে ডাক্তারবাবুর বাড়ী যেত অবসরে, মাইনে পাওয়ার পর মনি-অর্ডার ফরম ভর্তি করে নিত। তখন একটু আধটু গল্প হত। ডাক্তারবাবু কোনদিন মুড়ি, কোনদিন চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে চা খাওয়াতেন। সেদিন বেলা বারোটা হবে, পিয়ারী এটেষ্টেশান বেঞ্চে বসেছে হাকিমের সঙ্গে। বেঞ্চক্লার্কের পেট ব্যথা, সে শুয়ে আছে। অফিসার কাজ করে চলে-ছেন। মাত্র দিনচারেক কাজ সুরু হয়েছে। পিয়ারী হঠাৎ দেখে অফিসার মোটা দেহ নিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে চেয়ার টেবিল নিয়ে উল্টে পড়ে গেলেন। কি হল, কি হল, বলে লোকগুলি চেঁচাতে সুরু করে। সাহেব তখনও গোঁ গোঁ করছেন, মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। মোজা গুটিয়ে ফেলা হল। পিওনরা মাথায় জল দিয়ে হাওয়া সুরু করল। পিয়ারী ছুটল ডাক্তারবাবুর বাড়ী। এমন সময় সাধারণত তিনি বাসায় ফেরেন। গিয়ে দেখে চাকরটা উঠোন সাফ করছে। পিয়ারী জিজ্ঞেস করে, "ডাক্তারবাবু আছেন ?" উত্তর হল "ছেএ।"

ভেতরে গিয়ে দেখে ডাক্তারবাবু পায়খানায় যাচ্ছেন। পিয়ারী চিৎকার করে বলে, "ডাক্তারবাবু—কল আছে, শীগগীর।" ডাক্তারবাবু পায়খানার ঘটিটা পিয়ারীর সামনে তুলে ধরে বলেন, "বসুন। আস্তে

এই কল সেরে আসি।" তিনি অন্তর্দ্ধান হলেন। দশ মিনিট পরে ফিরে এসে জামা গায়ে গলিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে, জুতো পরে বলেন, "চলুন।" পিয়ারীর মনে হল, বোধ হয় একযুগ পার হয়ে গেছে। দ্রুত এসে দেখে সাহেব তখন উঠে বসেছেন। তবে কোর্ট ছুটি। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করে জানলেন, এটা তার একটা ফিটের ব্যারাম, মাঝে মাঝে হয়। এবারে হল অনেকদিন পরে। পিয়ারী আতঙ্কিত হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়। ডাক্তারবাবু অল্প হেসে, ব্যাগ নিয়ে উঠে চলে যান।

এখানকার একটা ঘটনা পিয়ারী ভুলতে পারেনা। গোকা গ্রামে যখন সে খানাপুরি করে তখন নারায়ণ কর্মকারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। বেশ নাতুসনুতুস গড়ন, জোড়াভুরুর আড়ালে সতর্ক দৃষ্টি দেখে বোঝা যেত লোকটি সোজা নয়। বয়স হবে প্রায় পঞ্চাশ। নারাণবাবুর অনেক জমি ছিল। শেষ বয়সে কতগুলি জমি কেনেন ছেলের নামে। একটিমাত্র ছেলে প্রত্যুম্ন। রায়গঞ্জে ক্লাস টেনেএ পড়ে। পিয়ারী একবার ওকে দেখেছে বিয়ের পরেই। চেহারায় এবং স্বভাবে বাবার ধূর্তামি এতটুকু নেই। বেশ মিষ্টি, সুন্দর চেহারা। সেদিন তো বিয়ে হল পাশের গ্রামের মেয়ে সুরধনীর সঙ্গে। বৌটিও দেখতে সুন্দরী।

এটেষ্টেশানের সময় নারাণবাবু এলেন একমুখ দাড়ি নিয়ে। শান্ত, স্থির ভাব। পট্টনায়ক আটচল্লিশ খতিয়ানের তজদিগের সময় বলেন, "সেকি মশাই, লোকে পিতার জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পায়, আর আপনি ছেলের জমি নিজের নামে রেকর্ড করছেন ?"

উত্তর হল, "আজ কদিন হল ছেলেটি সুইসাইড করেছে।"

সবাই চমকে ওঠে, পিয়ারী এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। অফিসার জিজ্ঞেস করেন, "কি হয়েছিল ?"

নারায়ণবাবু বলেন, "এই বৌমার সঙ্গে মতান্তর। তারপর এই শোচনীয় পরিণতি। পিয়ারীর দুঃখ হয়, আহা অমন ফুলের মত ছেলে। অফিসার মৃত্যুর প্রমাণ পত্র দেখে রেকর্ড ঠিক করে দেন। নারায়ণ কর্মকার চলে যায়। এরপর ঠিক দশদিন পরে পিয়ারী গিয়েছিল, বদরের জন্য। ফেরার সময় নারায়ণ কর্মকারের এক

আত্মীয়ের কাছে শোনে প্রকৃত ঘটনা। এদের সঙ্গে নারায়ণবাবুদের জ্ঞাতি-শত্রুতা রয়েছে।

ঘটনা হল, নারায়ণবাবুর স্ত্রী মারা যান প্রদ্যুম্ন যখন খুব ছোট। বিয়ে আর করেননি। একবার পাশের বাড়ীর ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বোনের সঙ্গে কি একটা কেলেঙ্কারী হয়, অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তিনি রেহাই পান। এই সুরধনীকে দেখেন তিনি কাঁচনায়, সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী, ধপ্‌ধপে রং। পছন্দ হয়ে যায়। মেয়ের বাপ গরীব, নারায়ণবাবু টাকা ঢাললেন। ক'বছর সুরধনীর বাবার ঐ টাকায় সংসার চলল। শেষে নারায়ণবাবু মেয়ের পিতাকে বলেন, "প্রদ্যুম্নকে এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে তার খুব ইচ্ছে।" সেতো হাতে স্বর্গ পেল। ধুমধাম করে বিয়ে হল। একটা মাসও কেটে গেল আনন্দে। প্রদ্যুম্নতো নতুন বৌ পেয়ে আত্মহারা। সামনে পরীক্ষা, পড়াশুনো মাথায় উঠল। শেষে অনিচ্ছাসত্ত্বে যেতে হল রায়গঞ্জ। বধূ রইল শ্বশুরের কাছে। শ্বশুরের পরিচর্য্যার ভার নিল। এদিকে ছুমাস কেটে গেছে। প্রদ্যুম্নের আর ভাল লাগছেনা শুকনো পাঠ আর নীরস বোর্ডিং। রাত্রে ঘুম হয় না, অসহায়ভাবে কাঁদে। বন্ধুরা বলে, "যা না, বাড়ী ঘুরে আয়। আমাদের সাইকেল নিয়েই যা।"

একদিন সন্ধ্যের সময় সাইকেলে বাড়ীর দিকে রওনা হল প্রদ্যুম্ন। গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত অনেক হয়ে গেল। সবাই গভীর নিদ্রামগ্ন। দু একটা গ্রাম্য কুকুর মুখ তুলে ঘেউ ঘেউ করে ডেকে, আবার মুখ গুঁজে ঘুমোল।

বাড়ীর কাছে এসে ঠিক করল, না ডেকে বৌকে চমকে দেবে। সাইকেলটা সন্তর্পণে আমগাছের গুঁড়িতে রেখে পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা ঠেলে দেখল দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল বিছানা খালি। চমক লাগল মনে। পরে তাকিয়ে দেখে দরজায় শিকল তোলা। ওপাশে বাবার ঘরে মৃদু হ্যারিকেন আলোর ছটা। ভাবল, সুরধনী হয়তো বাবার ঘরে তামাক দিতে গেছে। বাবার তো সে বাতিক আছেই।

জানালা দিয়ে তাকাতেই ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা গেল। নারায়ণবাবু সুরধনীকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন, তাদের শয়নে অন্তরঙ্গতার সীমা নেই। দুজনেই গভীর নিদ্রামগ্ন।

প্রত্যুম্ন বিস্ময়ের কশাঘাতে ফিরে আসে জানালার কাছ হতে, তারপর কিছুক্ষণ দাওয়ায় বসে থাকে মুখ নীচু করে।

কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদ একসময় আকাশে ওঠে. তবুও প্রত্যুম্ন বসে থাকে। কি তার মন তোলপাড় করছিল. কেউ তা বলতে পারেনা।

ভোরে কাক ডাকলে, পরিষ্কার হলে সবাই উঠল। তখন প্রত্যুম্ন আমগাছের ডাল হতে ঝুলছে। পরনের কাপডটাই ফাঁস করেছে। মাথাটা ঈষৎ নুয়ে আছে, পায়ের কাছে সাইকেলটা গাছে হেলান দেয়া চটি ধূলি-ধূসরিত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

॥ তিন ॥

১৯৩৯ সালেব পূজোর ছুটিতে দেশ হতে ঘুরে আসবার পরে দিনাজপুরের জীবন শেষ হয়। পিয়ারীর জীবনের অনেকগুলি বছর এখানে কেটেছে। উত্তর বাংলার নরনারী, প্রকৃতির সঙ্গে তার একটা চিন্ হয়েছে। মাটির কোন স্মরণশক্তি নেই, নেই কোন ভাষা, তা নইলে নিজের স্ত্রী-পুত্র, মা, ভাইকে দেশে রেখে সে যে সখ্যতার সৃষ্টি করে গেল এদেশের মাটিতে, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কথা বলে উঠত।

শুধু কি পিয়ারীর স্মৃতিই এই জেলার বুকে রয়েছে? নেই এখানে বান রাজা বা ধর্মপাল, দেব পালদের কোন কীর্তি? ধর্মপালের বিজয় বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যেতনা কি সহস্র শ্রমিক কোদাল হাতে? রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য কোদালের কোপে সৃষ্টি হত না পুকুর? দিনাজপুরের বিরাট প্রান্তরে প্রান্তরে জলহীন শুষ্ক উচু পাড়ওয়ালা সেইসব সরোবর এখনও এখানে ওখানে ছড়ান রয়েছে। পাহাড়পুর দাঁড়িয়ে আছে অতীতের বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব নিয়ে।

আরও কি নেই? মহম্মদ তুঘ্‌লকের পতনের পর বাংলার স্বাধীন সুলতানির জন্ম। মালদার গৌড়, পাণ্ডুয়া তখন মুসলমান বাংলার

রাজধানী। দিনাজপুর তার কত স্মৃতি জড়িয়ে নিয়েছে বুকে। রাজা গণেশ দিনাজপুরের জমিদার, তার দৃপ্ত অভিযানের কাছে পাঠান সুলতানের পরাজয়। কিন্তু পরাজিত নবাবের সুন্দরী কন্যা যে গোপনে যদুকে তার প্রণয়ডোরে বাঁধছে, একথা রাজা গণেশ তো জানতেন না। বাবার মৃত্যুর পরে যদু মুসলমান হয়ে, নবাব কন্যাকে বিয়ে করে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ, দাউদ খাঁ, কালাপাহাড়, গণেশ এদের স্মৃতিও কি নেই এর বুকে? দিনাজপুরের, পূর্ণিয়ার শুকনো পুকুরগুলি থেকে চাষের সময় যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি কি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে ও উৎপীড়নের ভয়েই নিক্ষিপ্ত?

দাউদ খাঁর ছিন্ন মুণ্ডের ওপরে মুঘলবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কালা-পাহাড় মানসিংহের হাতে প্রাণ দেয়। ইতিহাস বলে, আকবর মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কি যুদ্ধে, কি রাজ্য বিস্তারে, কি শান্তিতে। তাঁর হিন্দু সেনাপতি তোডরমল্ল জমি মেপে জরীপ করলেন। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আরংজীব এলেন, গেলেন। ঘুণ ধরল মোগল সাম্রাজ্যে।

তারপর? বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকা দখল করল, শ্বেত দ্বীপের বণিকেরা, চোখ তাদের নীল, চুল তাদের সোনালী, গায়ের রং তাদের লাল। সাগর তাদের বাহন হল,।

তারা নতুন পদ্ধতিতে জমি মাপল। এদেশের ভাষা শিখে, খতিয়ান খসড়া রচনা করল। কত পরিবর্তন আনল তারা এদেশে। দিনাজপুরও সে সুবিধে হতে বাদ পড়ল না। রেল লাইন পাতা হল রুইয়া হতে দিনাজপুরে, পার্বতীপুর হতে রায়গঞ্জ হয়ে কাটিহারে। টেলিগ্রাফ এল, যোগাযোগ সাধন হল জেলায় জেলায়। আরও কত উন্নতি সাধিত হল এদেশে। পিয়ারী সেসব কথা শুনেছে। সে ও আরও অনেকে বদলী হয়েছিল মৈমনসিং সেট্‌লমেণ্টে। বিদায়ের দিন গরুর গাড়ীতে উঠবার সময় মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। পিছনের বটগাছটা ছিল গ্রামের চিন্‌ বটগাছ। খাড়ূও সঙ্গে ছিল, ও আর পূর্ণিয়া জেলা ছাড়তে রাজী হয়নি। খাড়ূ রায়গঞ্জ হয়ে কিষেণগঞ্জ যাবে ট্রেনে। বটগাছটার দিকে তাকাতেই পিয়ারীর মনটা হু হু করল

ওঠে। এক বছরের পুরানো চেনা গাছ। এখান হতে চলে গেলে, ওতো ঠিকই থাকবে। দিন-রাত্রি ঠিক চলবে, শুধু তারাই থাকবে না এখানে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে। গরুর গাড়ী চলতে শুরু করে, পেছনে ঐ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি ক্রমে ছোট হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যায়। রায়গঞ্জে এসে পিয়ারী এবং অন্যান্য সকলে ট্রেনের টিকিট কেটে রায়গঞ্জ ষ্টেশনে বসে। অফিসার আজ যাবেন না, সার্কল ক্যাম্পে থাকবেন। খাড়ুর গাড়ী বিপরীত দিকে যাবে, এখনও প্রায় দুঘণ্টা বাকী। এমনি সময় একজন মুসলমান পিওন আদাব জানাল। পিয়ারী জিজ্ঞেস করে, "তুমি কে?" সে বলে, "আমি নুরুল হক নাম্বার নাইন। একজন পিওন। এই চিঠিখানা সার্কল অফিসার দিয়েছেন, আপনি পার্বতীপুরে রেলের তারবাবুকে দেবেন। তিনি সাহেবের শালা।" নুরুল হক নাম্বার নাইন আদাব করে চলে গেল। গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী এল। পিয়ারী উঠে জানালার কাছে একটা সীটে, ষ্টেশনের দিকেই বসে। ছাড়বার ঘণ্টা দিতেই খাড়ু হু হু করে কেঁদে ওঠে। পিয়ারীর চোখেও জল। কত বছর খাড়ু নির্জন ক্যাম্পে তার সাথী। তাকে ভাত রেঁধে, বাজার করে খাইয়েছে। সে ঘুমোলে তার পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে। বন্ধুর সেরা বন্ধু, ভৃত্যের সেরা ভৃত্য, আজ তার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। চোখের জল কি বাঁধ মানে?

গাড়ী ছেড়ে দেয়। পিয়ারী দেখল খাড়ু যতক্ষণ পারল ছুটতে ছুটতে কাঁদতে কাঁদতে চলল গাড়ীর সঙ্গে। ষ্টেশনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। গাড়ী তাকে পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে সামনের দিকে পিয়ারীকে নিয়ে ছুটে চলল, যেন খাড়ুর কাছ হতে দূরে নিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ইংরেজী ১৯৪০ সন। ট্রেনিং ক্যাম্প বসেছে মৈমনসিংএর ডাকুমারা কুল্লাগড়ায়। একজন বাঙ্গালী ইন-চার্জ, চন্দ্রমোহন গোস্বামী, সাহেব অফিসারদের প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ইনি স্থানীয় লোক। সামনে একখানা মহাভারত খোলা, দেয়ালে ঝোলানো একখানা ম্যাপ। তিনি বলছেন :

"মহাভারতের উ দ্যাগ পর্বে আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ বর্তমান মৈমনসিং এর রাজা ভগদত্তের সসৈন্যে কৌরব পক্ষে যোগদান।

'ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্বুদ অর্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন॥
চতুরঙ্গ দল সহ আসে নরপতি।
মিলাইল আসি কুরুসৈন্যের সংহতি॥'

এদেশ তখন শক্তিশালী। প্রতিটি যুদ্ধে তাঁর পরাক্রমের কাছে সবাই স্তব্ধ। মহাভারতের হারকিউলিস—ভীম পর্যন্ত একবার ভগদত্ত ও হাতির কাছে পরাজিত হন।"

একজন সাহেব মৃদুস্বরে পাশের সতীর্থকে বলেন, 'আমার সন্দেহ আছে, ভীম হারকিউলিসের সঙ্গে পেরে উঠত কিনা।' গোস্বামী সাহেব মহাভারত থেকে আবৃত্তি করে শোনান :

'লক্ষ লক্ষ সেনা মার চক্ষের নিমিষে।
ভগদত্ত যুদ্ধ দেখি দুর্যোধন হাসে॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥'

"যুদ্ধের সময় ভগদত্ত দুর্যোধনের মস্ত সহায় ছিলেন। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী ভগদত্ত বৈষ্ণব অস্ত্রের অধিকারী ছিলেন। যতক্ষণ ঐ অস্ত্র তাঁর কাছে ছিল ততক্ষণ অর্জুন তাঁকে নিহত করতে পারেনি।

বর্তমান মৈমনসিং তখন মহাকাব্য বর্ণিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের

অংশ ছিল। এখানকার গারো পাহাড়ের হাতি তখন ভারত বিখ্যাত। এমন কি এর বহুযুগ পরেও এখানকার রাজস্বের সঙ্গে দশটি করে হাতিও বছরে বছরে দিতে হত সম্রাট আকবরকে। বুদ্ধদেবের সময় এ-অংশটার নাম ছিল কামরূপ। এর পরের ইতিহাস বারো শতাব্দীর। এ-শতাব্দীর প্রথমে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাংশ বরেন্দ্রভূমির পাল রাজ্যের অধীন ছিল এবং আজকের লুপ্তগৌরব মালদহের গৌড় ছিল তাদের রাজধানী। তারপর বিজয় সেন—বাংলায় নতুন হিন্দুশক্তির উদয়। তিনি বর্তমান মৈমনসিং-এর এ অংশ দখল করে নেন এবং রাজধানী স্থাপন করেন রামপাল এ। তারপর পিতার যোগ্যপুত্র বল্লালসেন পিতার স্থাপিত রাজ্য সংহত করে বিজয় বাহিনী এগিয়ে নিয়ে যান; সমাজ সংস্কার করে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। তার চিহ্ন আজও টাঙ্গাইলে মিলবে।

তারপর লক্ষ্মণ সেন। যৌবনে তাঁর বিজয় অভিযান অনেকের মনে ভীতির উদ্রেক করেছে। বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অনেকটা দায়ী। তাঁর রাজত্বকালেই কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কিন্তু ভারত ও বাংলার তখন এক যুগসন্ধিক্ষণ। পৃথ্বিরাজের তরাইয়ের পরাজয়ের পরেই লক্ষণ সেন রাজ্য হারিয়ে বিক্রমপুর গিয়ে রাজত্ব করেন। তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, দেশ ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে অন্ধকার। মীন্‌হাজ্‌ লিখেছেন, 'সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী বঙ্গবিজয় করে'—অসম্ভব নয়, কিন্তু তার পশ্চাতে ছিল বিরাট মুসলমান বাহিনী।

এর সঙ্গে তুলনা করুন আর এক যুগসন্ধিক্ষণ। পলাশীর প্রাঙ্গণে নবাবসৈন্যের তুলনায় ইংরেজ বাহিনী অকিঞ্চিৎকর, মাত্র তিন হাজার। ক্লাইভ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'যতলোক আমাদের দেখতে এসেছিল সেদিন মুর্শিদাবাদের দ্বারপ্রান্তে, তারা প্রত্যেকে যদি একটা করে ঢিল ছুঁড়ত, তা'হলে আমরা শেষ হয়ে যেতাম। দুটি উক্তি একই রকম নয় কি?

এরপরের মৈমনসিংএর ইতিহাস মানে. ঢাকার ইতিহাস।" সাহেব অফিসাররা উসখুস করছে। গোস্বামী সাহেব সুরু করেন, "মোগল আমলে বাংলার বারভুঁইয়ারা বিদ্রোহ করেন। বর্তমান কিশোরগঞ্জ

মহুকুমার অধীশ্বর ঈশা খাঁ তাঁর কোচ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেন। বিদ্রোহ দমন করতে এলেন মানসিংহ দিল্লী থেকে। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে ঈশা খাঁ তাঁর কাছে পরাজিত হলেন। মানসিংহ তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন বাইশটি পরগণার সনদ নিয়ে।" ইউ, টি, অফিসাররা এ ওর গা টেঁপে, বলে, 'এ ন্যাশনালিস্ট হিন্দু অফিসার।' আর একজন বলে, 'হাশ্, হি উইল বি আওয়ার এক্জামিনার।' একজন ঢেঙ্গা সাহেব উঠে বলেন, 'এর সঙ্গে সেট্‌লমেন্টের সম্পর্ক কি?' গোস্বামী সাহেব বলেন, "এটা হল পার্সপেক্‌টিভ। পারস্‌পেক্‌টিভ ভাল না হলে কি ছবি উঠবে মনে?" অফিসারটি বসে পড়ে।

গোস্বামী সাহেব বলতে শুরু করেন, "এরপর বৃটিশরাজ মৈমনসিংএর শাসনভার গ্রহণ করেন, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। মৈমনসিংএর নিজের ইতিহাস তখন পর্যন্ত কতটুকুই বা।" 'হ্যাট্‌স্ ইনটারেস্টিং'—বলে একজন শিক্ষার্থী অফিসার। গোস্বামী সাহেব হাসেন, "কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় এখানে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়। বঙ্কিমবাবু এই বিষয় অবলম্বনে 'আনন্দমঠ' নামে একখানা দেশাত্মবোধক বই লিখেছেন, পারহ্যাপ্‌স ইউ অল নো হ্যাট্।" সবাই নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানান, তারা জানে। প্রথম দিনের ক্লাস শেষ হয়ে যায়।

প্রায় মাসখানেক এখানে ট্রেনিং ক্যাম্প বসেছে, অফিসারদের শিক্ষার জন্য। সেট্‌লমেন্ট ট্রেনিং না হলে, কোন সিভিলিয়ানের চাকরী আরম্ভ করার হুকুম নেই। সরকারের সকলপ্রকার রাজস্বের মধ্যে ভূমি রাজস্বই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সকল বিবাদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ভূমি-বিবাদ। তাছাড়া জ্ঞান? মাটি সম্পর্কে ভৌগলিক ও বিবাদ আইনের জ্ঞানই তো পৃথিবীর সকল জ্ঞানের সেরা। অফিসাররা সকালে মাঠে ট্রেনিং নিত, আমিন এবং কানুনগোদের কাছে। বিকেলে ঠাণ্ডা মাঠে ক্লাস নিতেন ওপরের অফিসাররা।

পিয়ারী চারজন অফিসারের এক গ্রুপকে ট্রেনিং দিত। তারা কিছুক্ষণ মাঠে কাজ করেই ছায়ায় বসে গল্পগুজব করত, সিগ্রেট খেত। তাদের মধ্যে রোগামত, লম্বা একজনের নাম ছিল স্টিভেনসন।

কোন কাজ করত না, পিয়ারীকে ডাকত, 'ইউ, আ-মিন্-মিন্-মিন্।' পিয়ারী জানত, এরা সকলেই পরে বড় বড় হাকিম হবে, তখন এদের সঙ্গে দেখা করাও চলবে না। তাই সে কোন কথা না বলে, যারা ইচ্ছুক তাদের নিয়েই কাজ চালাত। পরবর্তী জীবনে আরও অনেক অফিসারকে সে ট্রেনিং দিয়েছে, তারা এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমিনরা কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে।

* * *

॥ দুই ॥

দেখতে দেখতে এদের নিয়ে একমাস কেটে যায়। শেষদিকে এরা একটু মনযোগ দিল। শেষ পরীক্ষার দিন পরীক্ষান্তে স্টিভেনসন সাহেব বাংলা প্রশ্নপত্র হাতে ক্যাম্পের ইন-চার্জ অফিসারকে বললেন, "দেখুন মিঃ গোস্বামী, আপনাদের বাংলাভাষা খুব কঠিন।" পিয়ারী উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, এই অফিসারটা তাকে বড় জ্বালিয়েছে। গোস্বামী সাহেব বলেন, "হোয়াই?" সাহেব বলেন, "হোয়াই দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন 'জলখাবার' এণ্ড 'খাবার জল'?" অদূরে একটি টিউবওয়েল বসান হচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে, হেসে গোস্বামী সাহেব বলেন, "আপনাদের ভাষায়ও ওরকম আছে।" সাহেব প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলেন, "ও, নো নো, ইউ ক্যাণ্ট ফাইণ্ড ছাট।" গোস্বামী সাহেব বলেন, "দেন হোয়াই দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন 'ওয়াটার পাইপ' এণ্ড 'পাইপ ওয়াটার'?" স্টিভেনসন অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, "ইয়েস, দেয়ার ইজ ছাট ডেভিল অল্‌সো ইন্ ইংলিশ।" তারপর দ্রুতবেগে প্রস্থান করেন। পিয়ারী মহাখুশি। বেয়াড়া সাহেবটা বেশ জব্দ হয়েছে আজ।

দুদিন পরে ফেয়ারওয়েল হল, তারা বিদায় নিয়ে যে যার কর্মস্থলে চলে গেলেন।

এই ট্রেনিংএর পর পিয়ারীর পোস্টিং হল নেত্রকোণা মহকুমার দুর্গাপুর থানার কালিয়াড়া গ্রামে। প্রথমে হবে খানাপুরি ও পরে

বুদ্ধারন্ত। সামনে গারো পাহাড়, আসাম রাজ্য। নদী সোমেশ্বরী। থানার কাছে নদীর ওপর ফেরী।

এখানে এসে একজন চেনম্যান যোগাড় করতে হল, নাম মধুসূদন। এর পূর্বে যে আমিন এখানে কিস্তোয়ার করেছিল, তার চেনম্যান। সার্কল অফিসার সেই চন্দ্রমোহন গোস্বামী, হেডকোয়ার্টার সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। নতুন পরিবেশে খানাপুরি কেমন অদ্ভুত লাগছিল, তাছাড়া স্থানীয় লোকদের ভাষাও পৃথক।

আমিন জীবনে কোন বড় ঘটনা নেই, সাধারণ তুচ্ছ জীবন। কিন্তু তার মধ্যে এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলোর মূল্যই কি কম! প্রত্যেকটা বড় বদলীর সঙ্গে জেলা পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের চেহারা, পোষাক-আশাক, ব্যবহার, এমনকি ভাষারও পরিবর্তন হচ্ছে। থাকতে হয় তাদের গ্রামের মধ্যে ঘরবাড়ী খুঁজে একেবারে মাটির বুকের কাছে। সুতরাং আমিনরা যেমন দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে তেমন আর কেউ নয়। বাবুরা রেলপথে শহরগুলি দু'একদিন ঘুরে এসে বলেন, দেখে এলাম অযোধ্যা, দার্জিলিং কিম্বা ঢাকা। কিন্তু সত্যিই কি দেখা হল? সব দেশের শহরগুলির চেহারা মোটামুটি একই। সেখানে বেশীরভাগ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকের বাস, তাদের চিন্তাধারাও এক। কোন দেশের শহর বুঝতে কষ্ট নেই। গ্রামে থেকে, গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে মিশলে তবেই সে দেশ চেনা হয়।

দেশের চিঠি এল, সামনের বছর থেকে বনো আর দেশের স্কুলে পড়তে পারবে না; কারণ সে স্কুলে মাইনর ক্লাসের উপরে আর নেই, শহরে যেতে হবে। পিয়ারীর দুশ্চিন্তা আরও একটু বাড়ল। কোথায় ওকে রাখা যায়, গোপালগঞ্জে বা মাদারীপুরেতো তেমন চেনাশুনা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পড়াশুনায় ভাল হয়েছে, ভাইটাকে পড়াতেই হবে। চিন্তার আরেকটা কারণ ঘটেছে দেশের অবস্থার কথা শুনে। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। ক্ষেতে ফসল ভাল হয় নি। কি করা যায়? চিন্তা করে কোন সমাধান পাওয়া যায় না। এতদূর থেকে আর কি করা যায়। চিন্তা ছাড়া? টাকা হাতে থাকলে না হয় পাঠিয়ে দিত।

কানুনগো সাহেবের নাম উমাপদ বসু, বাড়ী বরিশালে। নাদুস-নুদুস চেহারা, বেশ রসিক। মাঝে মাঝে আবার অদ্ভুত ব্যবহার করতেন। ইন্সপেক্সনে বেরিয়ে গাছের নীচে বসে সিগ্রেট ফুঁকতেন। আর্দালীর উপর আদেশ, কোন উপরওয়ালা তাঁবুতে এলে বলবে, বেরিয়ে গেছেন। আমিনদের ওপর আদেশ ছিল, 'অফিসার এলে বলবে, "আমি রোজ পরিদর্শন করতে যাই।" মোটা মানুষ, একটু সাইকেল করলেই হাঁপিয়ে পড়তেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "আরে বাপু, খাটলেই কি সরকারী চাকরীতে উন্নতি হয়? হয় না। শুনবে গল্প?" বলে গল্প শুরু করতেন :

১৯০৯ সনের কথা, ছাকচী সাহেব সেট্‌লমেণ্ট অফিসার। এক কানুনগো রোজ ভোরে মাঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে পুকুরে মুখ ধুয়ে ধীরে সুস্থে ক্যাম্পে ফিরত। মাঠে কিস্তোয়ার চলা সত্ত্বেও ইন্সপেক্সনে যেতই না। বেশ চলছিল, চলতও, যদি না সার্কল অফিসারের সঙ্গে বিবাদ করত। জলে বাস করে তো আর কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। সার্কল অফিসার ব্যাপারটা সম্বন্ধে তদন্ত করে হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট দেন। ছাকচী সাহেব চার্জ অফিসার ও সার্কল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে গোপন তদন্তে এসে রাতে উঠলেন কাছাকাছি একটা বাংলোতে। ভোর আটটা নাগাদ ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পে এসে পৌঁছলেন।

এতগুলো অফিসারকে একসঙ্গে আসতে দেখে আর্দালী তো ভিরমী যাবার উপক্রম। চার্জ অফিসার বললেন, "তোমার অফিসার কোথায়, ডাক।" আর্দালী মাইলখানেক দূরে এক জলার ধারে মাঠের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করে খবর দেয়। তিনি তখন দাঁতন করছেন। খবর শুনে কানুনগো মাথায় হাত দেন, মনে মনে সার্কল অফিসারকে গালাগাল দিতে থাকেন।—আচ্ছা আগে এ বিপদ হতে পরিত্রাণ পাই, তারপর তোমায় দেখে নেব। একটু ভেবে আর্দালীকে বলেন, "তুই বল গিয়ে, সাহেব এখন যেতে পারবে না, ভীষণ ব্যস্ত কাজে। আর্দালী আবার ছুটে গিয়ে শেখানো কথা বলে। চার্জ অফিসার রেগে আগুন,

"নো, নো। কল হিম। যাও ডেকে আন।" আর্দালী আবার ছোটে। কাহ্নুনগো সাহেব বলেন, "যাও, আবার গিয়ে বল, আমি যেতে পারবনা, ভীষণ ব্যস্ত। তাঁরা এখানে আস্থন।" আর্দালীর মুখে একথা শুনে সবাই ক্ষেপে লাল। জল-কাদা ভেঙে সবাই চলল কাজ দেখতে। আর্দালী পথ দেখায়। সার্কল অফিসারের চোখে মুখে ক্রুর হাসি—এতদিনে তোমাকে পাওয়া গেছে, আজ তোমার চাকরির দফা গয়া। তারা পুকুর ধারে এসে প্রথমে কাউকেই দেখতে পায় না। হঠাৎ মাঝ পুকুর হতে কাদা জল ঠেলে ভুস করে ভেসে ওঠে কানুনগো। উঠেই আবার ডুব। কি ব্যাপার? ছাকচী সাহেব তো অবাক। মাথা খারাপ হল নাকি? তিনি চীৎকার করে ডাকেন, "ইউ বাবু, বাবু.........।" কানুনগো ততক্ষণে জলের তলায়। আবার জল, শ্যাওলা মাথায় নিয়ে ভেসে উঠতেই তিনি ডাকলেন, "ইউ কানুনগো...।" কানুনগো একবার নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুব। এবার সবাই মিলে চিৎকার করে ডাকতে কানুনগো উঠে এল। ধুতি, শার্ট জলকাদা মাখা, মাথায় শ্যাওলা, অদ্ভুত চেহারা।

ছাকচী সাহেব কড়া স্থরে প্রশ্ন করলেন, "ওখানে কি করছিলেন?" কানুনগো সকলকে করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে বলেন, "আজ্ঞে স্যার, ম্যাপ অনুযায়ী তিনটে মৌজার সীমানা হল ঠিক ঐ জায়গাটা। ওখানে একটা ট্রাইজাংশান পিলার থাকবেই। কিন্তু কেন পাচ্ছি না? তাই আজ ভোরে উঠেই খুঁজতে সুরু করেছি।" ছাকচী সাহেব চার্জ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'হাউ ওয়াণ্ডারফুল! আমার মনে হয় আপনার চার্জে এমন সিনসিয়ার কানুনগো আর নেই। চার্জ অফিসার স্বীকার করেন। সত্যিই, এই মাঘের শীতে কোন কানুনগো সাতসকালে গিয়ে কাদাজলে ডুব দেবে? সারাপথ তাঁরা সার্কল অফিসারের মুণ্ডপাত করলেন। পরের বছরই কানুনগোর প্রমোশন হয়।

গল্প শুনে সকলে হাসে। বলে, "এ গল্প কোথায় পেলেন স্যার, এতো ছাকচী সাহেবের সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্টে নেই।" উমাপদ বাবু

কপট ক্রোধে বলেন, "এসব কি সেট্‌লমেণ্ট রিপোর্টে থাকে নাকি? এ গল্প লোকের মুখে মুখে চলে আসছে।"

পিয়ারী বোস সাহেবের মুখে আরও অনেক গল্প শুনেছে। নম্র ব্যবহারের জন্য তিনি পিয়ারীকে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে পিয়ারী তাঁর বাড়ীতে এসে কাজ দেখিয়ে নিয়ে যেত। তিনি ইতিহাসে এম-এ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে একবছর প্রফেসরিও করেছেন। প্রায়ই বলতেন, 'দেশমাতৃকা' কথাটার বড় ভুল মানে করা হয় আমাদের দেশে। দেশ মানে তো মাটি নয়, দেশ মানে জনগণ, দেশের উন্নতি মানে জনগণের উন্নতি। এটাই যেন আমাদের নেতারা ভাল করে বোঝেন না। পিয়ারীও তখন বোঝেনি, বুঝেছিল রিটায়ারের পরে ১৯৫৮ সনে, ডায়মণ্ড হারবারে একটা ঠিকা জরীপের কাজে গিয়ে! তখন দেখেছে মথুরাপুরে, ডায়মণ্ডহারবারে, কুলপীতে ভাল ভাল রাস্তা তৈরী হয়েছে, বাস চলছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। কিন্তু গ্রামগুলি শ্মশানতুল্য। লোকের স্বাস্থ্য নেই, শিক্ষা নেই, পর্যাপ্ত আয় নেই, কাজে উৎসাহ নেই। অনেকেই পেট ভরে দু'বেলা ভাত খেতে পায় না। এসব দেখে পিয়ারীর মনে পড়ত উমাপদ বাবুর কথা। তিনি বোধ হয় ঠিকই বলতেন।

গগনপুরে কাজ পুরোদমেই চলছে। আকাশে-মাটিতে ফাল্গুনের ছোঁয়াচ, আমগাছে গুটি ধরেছে। একদিন সকালে পিয়ারী মধুকে বলে মাঠে না গিয়ে একটা মুরগি জোগাড় করতে —সাহেবকে খাওয়াবে। দুপুরে ফেরার পথে সাহেবকে নেমন্তন্ন করে এল। সন্ধ্যায় নিজেই মুরগি রান্না করল, একটু রসুন কুঁচি দিয়ে। এভাবে সে রান্না করতে শিখেছে দিনাজপুরে এক মুসলমান আমিনের কাছে। রান্না হলে, গেল সাহেবকে ডাকতে। তিনি তখন চিঠি লিখছিলেন, শেষ হলে পিয়ারীকে বললেন, "এখনই খাব কি! তার চেয়ে একটু চা খাও, গল্প কর, ঠিক আটটায় উঠব।" আর্দালীকে ডেকে চা করতে বললেন। তাঁর হাতে একখানা ঝক্‌ঝকে বই দেখে পিয়ারী জিজ্ঞেস করল, "স্যার, ওখানা কি বই?" তিনি বললেন, "এখানা ইংরেজী ইতিহাসের বই, এদেশের কথাও আছে। শুনবে?" পিয়ারী মাথা নাড়ে। আর্দালী

চা দিয়ে বলল, "স্যার. একবার দেখে আসি, আমিনবাবু খাবার ব্যবস্থা কি করেছেন।" তাকে ইঙ্গিতে যেতে বলে চায়ে চুমুক দিলেন। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সুরু করেন :

'তোমরা ভাবছ যে ইংরেজই বুঝি প্রথম জরীপ করল ভারতবর্ষ। কিন্তু তা নয়। সর্বপ্রথম শের শাহ জমির শ্রেণী হিসেবে রাজস্ব নির্ধারিত করবার চেষ্টা করেন। পাট্টা কবুলতির প্রচলনও তিনিই করেন। কিছুদিন সে ব্যবস্থা চলার পর ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আকবর রাজা তোডরমল্লকে দিয়ে সমগ্র রাজ্য জরীপ করান। মৈমনসিংহ তখন ছিল 'বাজোয়া' সরকারের মধ্যে। তখন এই বাজোয়ার বাৎসরিক খাজনা ছিল, ১০টি হাতি, ১৭০০ ঘোড়সওয়ার, ৪৩৫০০ পদাতিক এবং ৯,৮৭,৯২১ আকব্বরি সিক্কা টাকা। বর্তমান ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়ার কিছু অংশ নিয়ে এই সরকার। ১৭২২ খৃষ্টাব্দের সেট্‌লমেণ্টে জাফর খাঁন "সরকার" ইউনিট ছেড়ে, বাংলাদেশ ১৩টি চাকলা এবং ১৬০০ পরগণায় ভাগ করেন। মৈমনসিংহের অধিকাংশই তখন ছিল চাকলা জাহাঙ্গীর নগরের মধ্যে। পরগণা ছিল ২৩৬টি আর খাজনা ছিল ১,৯২,৮২৯ টাকা। ইংরেজ রাজত্বে, ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংকে ভিন্ন কালেক্টরেটের অধীন করা হল। প্রথম কালেক্টর, এইচ বারোজ। হেড কোয়ার্টার ঢাকা। মৈমনসিং জিলার সূচনা এভাবেই হল। এরপর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল, স্যার জন শোর খরচ কমাবার অছিলায় এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মৈমনসিং ও ভুলুয়া মিঃ রোগটনের অধীনে আনলেন। কিন্তু সুবিধে হল না। ভুলুয়াকে আবার পৃথক করা হল। রোগটনের পরে এলেন মিঃ ষ্টিফেন বেয়ার্ড। তিনি ইংলণ্ডে বোর্ড অব ডিরেক্টর্সকে একখানা চিঠি দিলেন। চিঠিখানা মৈমনসিংহের ইতিহাসের একখানা মূল্যবান দলিল। তিনি লিখলেন যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাওয়ারা ও বইগণবাড়ীর মাঝে কাগদায় মৈমনসিংহের হেড কোয়ার্টারের জন্য একটা উত্তম জায়গা পাওয়া গেছে। যথাসময়ে ইংলণ্ড থেকে মঞ্জুরী এল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ হতে কাগদা, নসিবাবাদ বা মৈমনসিংহ হল হেডকোয়ার্টার।"

বোস সাহেব সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। পিয়ারী ততক্ষণে হাঁফিয়ে

উঠেছে। তিনি বলেন, "ভাবছি, এ নিয়ে একখানা বই লিখব।" হয়েছে, এখন উঠতে পারলে বাঁচে পিয়ারী। মাংস বোধ হয় এতক্ষণে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে। বোস সাহেব বইখানা নেড়েচেড়ে বলেন, "শুনবে, ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে এ জেলার ইতিহাস ? পিয়ারী মাথা চুলকে বলে, "স্যার, রান্না যে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।" বিশাল দেহ নিয়ে বোস সাহেব এবার উঠলেন।

পিয়ারী রেঁধেছিল, ভাজা, মসুর ডাল, মাংস ও কুলের টক। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন তিনি। বললেন, "বাড়ী ছেড়ে এসে এমন মাংস আর খাইনি হে।" পিয়ারী বলে, "কি আর রেঁধেছি স্যার। এদেশে কিছু মেলে যে খাওয়াব ? হতো আমাদের নারানপুর—।" সাহেব বলেন, "ঠিক কথা, একেবারে পাণ্ডববর্জিত দেশ। সাহেবের খাওয়ার পরে পিয়ারী, মধু ও আর্দালী খেতে বসে। খেতে খেতে পিয়ারী বলে, "স্যার, খানাপুরি হয়ে গেলে কি করতে হবে আমাদের ?" বোস সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, "বুঝারত।" পিয়ারী খাওয়ায় মন দেয়। জ্যোৎস্না রাত, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে পিয়ারী সাহেবকে একটু এগিয়ে দিতে গেল। একটা মাঠ পার হয়ে তবে ক্যাম্পের রাস্তায় পড়তে হয়। বোস সাহেব বলেন, "তুমি এবার যাও, আমি যেতে পারব।" পিয়ারী ইতস্ততঃ করে। তিনি বলেন, 'কি, কিছু বলবে ?" সে মাথা নাড়ে। পিয়ারী বলে, "স্যার, বাড়ীর জন্য মনটা বড্ড খারাপ, বুঝারত স্নুরু হবার আগে যদি কয়েকটা দিন স্যার……।" বোস সাহেব আঁতকে উঠে বলেন, "ফরাসী ছুটি ? সর্বনাশ, আমি পারবনা দিতে। সার্কল অফিসার গোস্বামী সাহেব রিপোর্ট ঝেড়ে দিক আর কি, আমার নামে।" তিনি আর দাঁড়ান না, হন্ হন্ করে এগিয়ে যান। পিয়ারী মাথা হেঁট করে ফিরে আসে। আরও কতদিন থাকতে হবে—চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। উঃ এতদিন ! সে বাঁচবেনা। চোখে জল এসে পড়ে।

## ॥ তিন ॥

এবছর বর্ষা নামল প্রচণ্ডভাবে, অনেকটা অকালেই। রাধু ম্যালেরিয়ায় পড়ল। রোজই বিকেলে কাঁপিয়ে জ্বর আসে, বলো মোটা কাঁথাগুলি গায়ে চাপিয়ে দেয়। ভোরে আবার গা ঠাণ্ডা। বৃদ্ধ কবিরাজ মথুরামোহন কয়েকটা গুলি দিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। তিনি বললেন, "ম্যালেরিয়া ঠিক আয়ুর্বেদোক্ত রোগ নয়, তাই সারতে চাইছে না। রোজ ভোরে উঠে তুমি কালোমেঘের পাতার রস খেও।"

পিয়ারীকে চিঠি দেওয়া হল। পিন্টুর কষ্ট। মাস দুয়েক ভুগে রাধুর শরীর অস্থিচর্মসার। পারুলবালারও দুশ্চিন্তার একশেষ। টাকা নেই, ছেলের পরিচর্যা, তারপর ঘরে রোগী। চাইলেও টাকা পাওয়া যাবে না কারুর কাছে। জ্ঞানদাবাবু অশক্ত, চক্রবর্তি গিন্নী বাতের রোগী। আর তাছাড়া, তাদের আয়ও বিশেষ নেই। রাধুর অবশিষ্ট চুড়ি ক-গাছাও বাঁধা পড়ল। জিনিসপত্রের দাম মানুষের সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পারুলবালা দিশেহারা হয়ে পড়ে, ভাবে, এবার পিয়ারী এলে এখানকার পাট উঠিয়ে ওর সঙ্গেই চলে যাবে। সে আর চিন্তা করতে পারে না। রাধু যতক্ষণ জ্বরে কাঁপে, খোকা রাধুর কাছে বসে কাঁদে। ভাল সাবু মেলেনা, একটু মিশ্রি নেই দোকানে, কে এতসব সামলায়।

শ্রাবণে মাঠ-ঘাট থৈ থৈ করছে জলে, সারা গ্রাম কচুরিপানায় ভর্তি। আমিন বাড়ীর উঠোনে প্রায় এক কোমর জল। বৃষ্টি সুরু হল খুব জোরে। ক্ষুদিরামের বাড়ীর নৌকা ডাঙ্গা হতে ঠেলে জলে নামান হল, গরমের সময় আলকাত্‌রা মেখে রাখা হয়েছিল। যারা আলকাত্‌রা কিনতে পারেনি তারা কাঁচা গাব দিয়ে নৌকায় মাঞ্জা দিল। জেলেদের গাব দেওয়া জাল বেরুল। মাছরাঙ্গা পাখীগুলি চিত্র-বিচিত্র দেহ নিয়ে রয়না গাছের ডালে নিস্পৃহভাবে বসে রইল। আর আকাশে রইল জলভরা মেঘ আর মেঘের গর্জন। এমনি করেই বর্ষা কেটে শরত এল হাসিভরা রোদ নিয়ে।

রাধু সেদিন সকালে র াঁধছিল। পিণ্টু পেছনে বসে এটা ওটা নাড়ছে। রাধুর চোখমুখ বসে গেছে, পিঠের হাড় দেখা যাচ্ছে। ম্যালেরিয়া পিশাচ যেন দেহের লাবণ্য শুষে নিয়েছে। পিণ্টু বলে, "মা, বাবা কবে আসবে?" রাধু কোনমতে চোখের জল চেপে বলে, "এই তো দিন পনেরো পরেই।" বনোর এখনও ছুটি হয়নি, এবারে সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবে।

পিণ্টু জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ মা, বাবা আমার জন্য খেলনা আনবে?" রাধু ঘাড় নেড়ে জানায়, আনবে। ভাবে, এমন বাপ-ন্যাওটা ছেলেও তো আর দেখিনি। আমরা এত করছি, একটু কৃতজ্ঞতা নেই। রান্নাঘরের পেছনে আমগাছের ডালটার উপর একটা কাক কর্কশ স্বরে ডাকছে। পারুলবালা কুলোয় করে কিছু আমসি রোদে দিয়েছিল, হাত মুঠো করে কৃত্রিম ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গিতে বলে, "হুস্ যাঃ।" ছেলেটা বিদেশে, কেমন আছে কে জানে। কাকটা উড়ে যায়। মায়া তাদের ঘাটে স্নান করে চলে যায় ভিজে কাপড়ে, ভিজে পায়ের ছাপ উঠোনে আলপনার মত দেখায়। পারুলবালা বলে, "বৌ, দুপুরে একবার আসিস্, খৈ টা একটু বেছে দিয়ে যাবি। রাধুর তো জ্বরই ছাড়ছে না, কি সোহাগীকে যে ঘরে এনেছি!" মায়া ঘাড় নেড়ে চলে যায়। রাধু শুনে কোন প্রতিবাদ করে না, আবছা দৃষ্টিতে জ্বলন্ত কড়াইয়ের দিকে তাকায়। চোখ হতে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ে।

পিণ্টু বলে, "মা, তুই কাঁদিস না, বড় হলে তোকে আমি এ—ত বড় রেলগাড়ী কিনে দেব।" রাধু চোখের জল মুছে ড াঁটা, কাঁঠালের বিচি আর কুমড়ো কড়াইয়ের গরম তেলে ছেড়ে দেয়। পারুলবালা এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, "এত দেরী কেন? শীগ্ গির কর, বেলা বাড়ছে না?"

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলিষ্ঠ পরুষ হাতে তার চোখ টিপে ধরে। পিণ্টু প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, আমার বাবা।" রাধু চমকে ফিরে দেখে কখন এসে নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়িয়েছে পিয়ারী। মার চোখ ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে পিয়ারী। পারুলবালা, 'আমার বাবা', বলে আদুরে মেয়ের মত পিয়ারীকে জড়িয়ে ধরে। হাসতে থাকে পিয়ারী।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

পুজোর ছুটিটা বেশ আনন্দেই কাটল। বনো পড়তে পড়তে একদিন বলে, "দাদা, 'আমিন' কথার ইংরেজী হল, 'সারভেয়ার।' পিয়ারী ভাইয়ের বিদ্যার বহর দেখে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, "আর 'বদর আমিনের' ইংরেজী ?" বনো 'বদর আমিন' কথাটা শুনে হেসে গড়াগড়ি। বলে, "জানিনা দাদা এসব বিদঘুটে কথার মানে।" কাকার হাসি দেখে পিণ্টুও হেসে হেসে বলে, "তুমিতো একটা বদর আমিন।" পিয়ারী ছেলের বুদ্ধিতে অবাক। আশ্চর্য, ও জানল কি করে ? ভাইয়ের পড়ার সুবিধের জন্য পিয়ারী চক্রবর্তি বাড়ীর বিশ্বনাথ বাবুকে ধরল। বিশ্বনাথবাবু দেশে থাকেন, বনোর পড়াশুনায় আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। ছেলেটি দরিদ্র, কিন্তু মেধাবী। তিনি কথা দিলেন, ফরিদপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে বিনা খরচে বনোর থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন। একখানা চিঠিও তিনি লিখে দিলেন।

পুজোর পরে রাত্রে একটু শীত শীত ভাব। আবদুল গাছিরা খেজুর গাছগুলি চেঁছে দিল। রসের সময় এসে পড়েছে। সেদিন পিয়ারী ও পিণ্টু দুপুরে ঘুমোচ্ছে, বাড়ীর আমগাছটার ডালে বসে একটা পাখী ডাকছে, "গৃহস্থের খোকা হক।" রাধু আর মায়া হাসছে, পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিচ্ছে। পারুলবালা কাশীদাসী মহাভারত পড়ছে সুর করে। বনো যতীন মাষ্টারের বাড়ী গেছে অঙ্ক কষতে। পূর্ববাংলার হেমন্তের দুপুর নিস্তব্ধ। মাঠে আমন ধানে হলুদ রং ধরেছে। বাংলাদেশে এসময়টা আশার সময়, ঐশ্বর্যের সময়। এসময় প্রতি বাড়ীতে দুপুরে বিশ্রামের পালা। বাড়ীর কর্তারা তৈলসিক্ত দেহ ও ভুড়িটি ভিজে গামছা দিয়ে ঘষে হুঁকোতে টান দিতে দিতে ঘুমিয়েছেন। বৃদ্ধারা কেউ রামায়ণ, কেউবা মনসামঙ্গল পড়ছেন। বধূরা ঘর কেটে ষোলগুটি মোগল পাঠান ( মোঙ্গল পাঠা ) খেলছে। গ্রামের যুবকরাও অলস মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করছে, একটু পরেই সেনেদের দালানে 'শৈব-

সাধনা' থিয়েটারের রিহার্সাল দেবে। এ বইটা ক'বার যাত্রাও হয়ে গেছে। মায়া চলে গেলে রাধু ঘরে এসে দেখে পিয়ারী ঘামে নেয়ে উঠেছে। পিণ্টুর মুখের উপর কতকগুলি মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। আহা! ঘুমন্ত লোকটাকে কত অসহায় মনে হয়। আস্তে আস্তে এসে আঁচল দিয়ে ঘামটা মুছে দেয়।

পিণ্টুকে ঠিক করে শুইয়ে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করে রাধু। ঘুমের ঘোরে পিয়ারী একখানা হাত রাধুর কোলে তুলে দিল। রাধু হাতখানা নিয়ে নিজের গালে, মুখে বুলোয়। সারাবছর লোকটাকে কাছে পাওয়া যায় না, শুধু পুজোর ক'টা দিন। মানুষ সংসার প্রতিপালনের জন্য কত কষ্ট করে, কিন্তু এমন করে একা একা বিদেশ বিভুঁয়ে কটা লোক পড়ে থাকে। ঝড় নেই, বাদল নেই, কেবল মাঠ আর মাঠ। এ কেমন চাকরী করে পিয়ারী ? কোথাও স্থির হয়ে দুদিন বসবার জো নেই, আজ এ গাঁ, কাল সে গাঁ, এ জেলা থেকে ও জেলা। সব স্বামী-স্ত্রীই তো একসঙ্গে থাকে, তাদের কপালেই শুধু সে সুখটুকু নেই।

কিছুক্ষণ বাদেই পিয়ারীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাধুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ও কি, তুমি কাঁদছ ?" রাধু আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। পিণ্টু আড়মোড়া ভেঙ্গে বাবাকে পাশে দেখে খুশিতে গলা জড়িয়ে ধরে। রাধু বলে, "জান গো, ক'মাস আগে মুকুন্দ দাসের দল এসেছিল, তারা তোমাদের সেট্‌লমেণ্টের গান একখানা গাইল।" গানটা পিয়ারীও শুনেছে বরিশালের এক আমিনের কাছে।

"সেটলমেণ্টের জরীপে, লোহার শিকলে মাপে,
দেশে দেশে আমিন আইল ভাই।
গাড়ী ঘোড়া ছিল যত, লেখে তারা অবিরত,
ছাগল-ভেড়া তারও নিস্তার নাই।" ইত্যাদি

পিয়ারী হেসে বলে, "আগে আমিনদের কত সম্মান ছিল, বাবাই তো কত সম্মান পেয়েছেন। দশজন গ্রামের লোক বিচারে ডেকেছে, মামলা-মোকর্দমায় পরামর্শ নিয়েছে, টাকাও আয় হয়েছে। এখন যেন আমিনদের সম্মান ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।"

রাধু বলে, "আচ্ছা, কানুনগো কেমন দেখতে ?" পিয়ারী হেসে

বলে, "মানুষের মতই।" রাধু একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে, "আমি কি তাই বলেছি নাকি?" পিয়ারী বর্ণনা দেয়, "এই হাফ প্যাণ্ট পরা, শার্ট কোমরে গোঁজা, পায়ে জুতো, মাথায় টুপি। চড়ে সাইকেল।"

রাধু বলে, "কানুনগোরা তো ঘোড়ায় চড়ে জানতাম।" পিয়ারী বলে, "আজকাল রাস্তাঘাট অনেক হয়েছে, সাইকেলেই তো সুবিধে। খরচ কম। সব অফিসারই প্রায় সাইকেল চড়ে আজকাল।"

রাধু প্রশ্ন করে, "অপিচার কি?"

পিয়ারী মহা বিব্রত হয়ে বলে, "এই তোমাদের যেমন শ্বাশুড়ী, আমাদের তেমনি অপিচার।" ঠাট্টা মনে করে রাধু রাগ করে উঠে যায়। ফিরে আসে চা নিয়ে, সঙ্গে সরভাজা।

সেদিন খুব ভোরে উঠে বনো আর পিণ্টু পাটখড়ির নল দিয়ে রস খাচ্ছে, পিয়ারী খাচ্ছে চা, চায়ের বড় ভক্ত হয়ে পড়েছে পিয়ারী। অবশ্য গ্রামদেশেও চা আজকাল খুব চালু হয়েছে। পারুলবালা জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁরে পিয়ারী, শুনছি ফরিদপুরে নাকি সেট্‌লমেণ্ট সুরু হচ্ছে?" পিয়ারী বলে, "জানিনা তো।" পারুলবালা বলে, "শুনছি তো তাই। তুই এখানে বদলী হয়ে আসবি তো?" পিয়ারী বলে, "কোথায় দেয় কে জানে। তাছাড়া নিজের গ্রামে কাজ না করাই ভাল, অপ্রিয় হতে হয়।" পারুলবালা বলে, "সে যাই হক, ফরিদপুরে বদলী হয়ে এলে তোর সঙ্গে আমি থাকব। বনোর তো একটা ব্যবস্থা হচ্ছেই।" পিয়ারী বলে, "সে দেখা যাবে তখন।"

বনো পড়তে বসেছে। পিয়ারী পিণ্টুকে নিয়ে একটু ঘুরতে বেরোল। প্রথমে ক্ষুদিরামের বাড়ী গেল। টেঁপি পুজোয় তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে দেশে এসেছে। ক্ষুদিরাম গুড় মাপছিল, বড় এক টুকরো গুড় সে পিণ্টুর হাতে দিল। কিছুক্ষণ সেখানে গল্পসল্প করে ক্ষুদির নৌকা নিয়ে ওপারে গিয়ে আবার এক ধাক্কায় নৌকাটা এপারে পাঠিয়ে দিল। এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায় বসন্তদের বাড়ী। সেখান থেকে ফেরবার পথে বিশ্বনাথবাবু ডেকে বলেন, "শুনছি, এ জেলায় শীগগির সেট্‌লমেণ্ট সুরু হবে। তুমি তখন কোথায় থাকবে?" পিয়ারী বলে, "এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।" তিনি বলেন, "এখন যেখানে আছ, সেটা কেমন?"

পিয়ারী বলে "আছে একরকম, তবে আমাদের দেশের কাছে কিছু নয়। বড় একটা নদী আছে ব্রহ্মপুত্র, আর উত্তরে পাহাড়। আমি আছি সুসঙ্গ দুর্গাপুরে। সেখানেও নদী একটা আছে, সোমেশ্বরী। লোকের কথা বোঝা যায় না ভাল করে। এ রকম খাওয়া দাওয়া, জল হাওয়াও নেই।"

যুদ্ধের কথা উঠতে বিশ্বনাথবাবু বলেন, "এই যুগসন্ধিক্ষণে অনেককিছু পাল্টাবে বলে যুদ্ধ এসেছে। মানুষের লোভ, দম্ভ, হিংসা, অহংকার, ঘৃণা আজ শেষ সীমায় পৌঁছেছে বলেই এই যুদ্ধ। এরপরে পৃথিবীতে স্থাপিত হবে নতুন বিধান—শান্তি।" তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯৪৩ সনে ফরিদপুরে কেস করতে গিয়ে কোর্টের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনদিন হাসপাতালে থাকার পরে মারা যান। বেঁচে থাকলে তিনি দেখতেন, তাঁর কথা ঠিক হয়নি। যুদ্ধের পরেও মানুষের লোভ, দম্ভ, হিংসা, অহংকার, ঘৃণা শেষ হয়নি, নতুন রূপ নিয়েছে মাত্র।

সেদিন দুপুরে কুমড়ো ডাঁটার তরকারি দিয়ে ভাত খেতে খেতে পিয়ারী বলে, "কি চমৎকার যে হয়েছে খেতে, এরকম ক'দিন খেতে পারলে মোটা হয়ে যেতাম।" পারুলবালা পাথরের বাটিতে করে চালতে আর রসের অম্বল দিয়ে যায়। বড় কষ্ট হয় পারুলবালার। ছেলেটা বাইরে ঘুরে আর না খেয়ে কি চেহারা হয়েছে, যেন একখানা পোড়াকাঠ। ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, "আর দুটো দিন থেকে যা না, শরীরটা একটু সারুক।" পিয়ারী হেসে মাথা নেড়ে বলে, "তা হয় না।" পারুলবালা হবিষ্যি ঘরে গিয়ে খেতে বসে।

রাধু ইসারা করে বলে, "হ্যাঁ, আরো দিন পনেরো থাকোনা।" বনোর স্কুল বন্ধ, সেও খেতে বসেছে দাদার সঙ্গে। পিণ্টু বসেছে বাবার সঙ্গে, একথালায়, চারদিকে ভাত ছড়াচ্ছে আর বকবক করছে। পাশের ঘরে পারুলবালা খাচ্ছে। রাধু চাপা গলায় বলে, "কি, বললে না, থাকবে কি না? থাকলে—।" একটা কুমড়ো কামড়ে খেতে খেতে পিয়ারী মিটমিট করে হাসতে থাকে, কোন কথা বলে না।

রাধু রেগে ভেংচি কেটে বলে, "আহা রঙ্গ দেখনা।" বনো বলে, "দাদা, তুমি শুধু আমার কানে কানে বল।" পিয়ারী বলে তার কানে কানে। পিণ্টু চেঁচিয়ে বলে "বাবা, আমার কানে।" অগত্যা তার

কানেও বলতে হয়। ছেলে চেঁচিয়ে উঠে, "এ, বাবা বলেছে থাকবে।" রাধু হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে থাকে। পাশের ঘরে পারুলবালাও শুনেছে, সে ডাকে, "পিণ্টু, মাথা খাবিনা, আয়।" "যাই ঠাকুমা," বলে পিণ্টু এক লাফে উধাও হয়।

## ॥ দুই ॥

কাজে যোগ দিতে দেরী হলেও ক্ষতি হয়নি, কারণ উমাপদবাবুও এক মাসের ছুটিতে আছেন। খানাপুরির কিছু বাকী ছিল, পিয়ারী তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলে। ডিসেম্বরের দু'তারিখ কানুনগো সাহেব কাজে যোগ দিলেন। আমিনরা সকলে মিলে আগেই পরামর্শ করে ঠিক করেছিল। তারা অবিচলিত কণ্ঠে বলল যে তারা ঠিক সময়েই এসেছে। গজানন দে, কৃপানাথ পাত্র, মহিউদ্দিন শেখ, তফাজ্জল হক, সবাই কিছু না কিছু দেরীতে এসেছে। এবার আমিনদের সঙ্গে কানুনগোর খুঁটিনাটি নিয়ে লেগেছে। উমাপদবাবু সম্বন্ধে আমিনরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

গজানন দে বলে, "পরতাল টানতে জানে না, আমরা পরতাল টেনে ঘরে নিয়ে সই করিয়েছি কিস্তোয়ারের সময়। অথচ, আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনবে না।"

মহিউদ্দিন বলে, "কিস্তোয়ারের সময় আমার একটা শীটে জঙ্গল কাটার খরচ দেবে না। আমিও মেরেছি ফাঁকি। অতবড় শীটে কটা মাত্র প্লট হয়েছে, ধরুকতো, যদি ক্ষমতা থাকে।"

কৃপানাথ বিড়িতে একটা টান মেরে বলে, "দাওনা সার্কল অফিসারের কাছে ব্যাটার নামে বেনামী চিঠি ছেড়ে।" পিয়ারী বলে, "তাহলে তোমরাই বিপদে পড়বে। শীট সই হল কি করে?" সবাই ভাবে, তাইতো।

ইংরেজী ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার বেষ্টিন সাহেব আদেশ দিলেন, ভাল আমিন দিয়ে বুঝারত সুরু করতে। তিনি

কয়েকজন ভাল আমিনের নাম রেকমেণ্ড করে পাঠালেন, তার মধ্যে পিয়ারীর নামও ছিল। স্বরু হল বুঝারত। এর মধ্যে সার্কল অফিসার একবার এসে তদ্বির করে গেলেন।

যুদ্ধের সময় এ বিভাগে অনেক রদবদল হয়। শেষ সাহেব ডি. এল আর ছিলেন কার্টার সাহেব। সাহেবরা 'হোম' রক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এ বিভাগে সাহেব অফিসার কমতে কমতে প্রায় শেষ হয়ে এল। মৈমনসিং সেট্‌লমেণ্টে বেষ্টিন সাহেব ১৯৪১ সনের আগস্টের প্রথম কটা দিন ছিলেন। ফরিদপুর সেট্‌লমেমেণ্টর স্বরুতে কোন সাহেব অফিসারই ছিলেন না। তখন থেকেই সেট্‌লমেণ্ট বিভাগ পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে যায়।

দেশ হতে খবর এল। বনো ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় খুব ভালভাবে পাশ করেছে, বৃত্তি না পেলেও স্কুলে বিনা বেতনে পড়তে পাবে। বিশ্বনাথবাবু সামনের বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে যাবেন, তিনি বনোকে নিয়ে ফরিদপুর হাই স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। অবশ্য বই কেনার জন্য কিছু টাকা চাই। থাকার ব্যবস্থা রামকৃষ্ণ মিশনে।

পিয়ারী উল্লসিত হয়ে সবাইকে চিঠি পড়ে শোনায়। সেদিন আর মন দিয়ে কাজ করতে পারে না। বুঝারতের সময় রেকর্ড লিখতে লিখতে হঠাৎ প্রজাদের বলে, "শুনেছ, আমার ভাই এবার ছাত্রবৃত্তি পাশ দিয়েছে।"

সন্ধ্যায় কানুনগো সাহেবের বাসায় গেল, তিনি তখন আলো জ্বেলে কি সব পড়ছিলেন। ওকে দেখে বললেন, "বোস।" পিয়ারী বসে জিজ্ঞেস করে, "স্যার, কি পড়ছেন?" তিনি বইটি একবার উল্টেপাল্টে বলেন, "নাম হল, 'ওয়ার এণ্ড পীস্‌, লেখক কাউণ্ট লিও টলস্টয়।" পিয়ারী ও নাম কখন শোনেনি। উমাপদবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কি ব্যাপার?" পিয়ারী বলে, "একটা সুখবর দিতে এলুম স্যার।"

উমাপদবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বলেন, "সুখবর, কি সুখবর?" পিয়ারী বলে তার ভাইয়ের খবর। তাদের বংশে এ পর্যন্ত কেউ ছাত্রবৃত্তি পাশ দেয়নি। অফিসার বলেন, "বেশ, বেশ. পড়াশুনা বন্ধ করবে না যেন। চাণক্য শ্লোক শুনেছ তো, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,

বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।" পিয়ারী বলে, "না স্যার, তবে বহু কষ্টে পড়াচ্ছি, এই তো মাইনে।" আরও কিছু কথাবার্তার পরে সে বিদায় নেয়।

হাতিপোতা গ্রামে যখন বুঝারত হচ্ছিল, তখন এক সাধু এসে টেবলের সামনে দাঁড়ায়। পিয়ারী খতিয়ান খুলে দেখল সাধু পঞ্চানন রায়ের জমিতে অনুমতি দখল। এ গ্রাম তার খানাপুরি করা নয়, তবে সাধুকে দেখেছে। গ্রামটা তেমন দূর নয় তার ক্যাম্প হতে। সাধু মুর্শিদাবাদ রাধামাধব আশ্রমের একজন ভক্ত, অত্যন্ত বিনয়ী, ভগবৎ-প্রেমী, নম্র। নাম, তুলসী চরণ বাবাজী। সুন্দর একখানা মাটির ঘর তৈরী করেছেন, প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ। যুঁইফুলের গাছে ফুল ফুটেছে। সকাল সন্ধ্যা ধূপ ধুনো দিয়ে ঘরে বিগ্রহের আরতি। ভালই লাগত পিয়ারীর। পঞ্চানন রায় সাধুকে এতদিন থাকতে দিয়েছে, কিন্তু এখন আর রাজী নয়। সেট্‌লমেন্টের পর্চায় কে এক সাধু এসে নাম লেখাবে, তা হবে না। পাকা, ঝানু লোক তিনি। সাধু বলে, "বাবা, নাম ওঠাতে আমি চাই না, তবে ভগবানের আশ্রম আমি তুলতে পারব না। আমিন মহিউদ্দিনকে দিয়ে পঞ্চাননবাবু চেষ্টা করেছেন সাধুর নাম কাটাবার, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। এমন কি, মহিউদ্দিনকে লোভ দেখিয়েও সুবিধে হয়নি।

খানাপুরির পরে পঞ্চাননবাবু অনেক চেষ্টা করলেন তাকে তুলতে, ভয় দেখিয়ে, কিন্তু সাধুর ওই একই কথা। পিয়ারী বুঝারতের সময় কোন পরিবর্তনই করে না। পঞ্চাননবাবু বলেন, "তুলসীচরণ, তুমি কেউটে সাপের সঙ্গে খেলা করছ, এখনও বলছি, তজদিগের আগে উঠে যাও।" সাধু বলে, "তজদিগ্, বুঝারত জানিনা, আমি নামও লেখাতে চাইনা। তবে উঠবনা। তুমি ঠাকুরকে উঠিয়ে এখানে শান্তিতে থাকতে পারবেনা।"

এর একমাস পরে একদিন সকলে সকালে উঠে দেখে সেখানে রাধামাধবের আশ্রম, মঞ্চ, তুলসী গাছ কিছুই নেই। সাধুকে পাওয়া গেল অচৈতন্য অবস্থায় এক মাঠের মধ্যে। এক চাষী পরিবার তাকে সেবা যত্নে বাঁচিয়েছে। সাধু অভিশাপ দেয় পঞ্চানন বাবুকে, "তুই নির্বংশ হবি।" পরে মুর্শিদাবাদে ফিরে যায়। এরপর তজদিগের সময় পঞ্চানন বাব র

কোন বেগ পেতে হয়নি তুলসীচরণের নাম কাটাতে, কারণ তিনি সেখানে একটা ধানভাঙ্গা কল কলকাতা হতে কিনে বসিয়েছিলেন। ওখানে একটা আধপাকা ঘরও তিনি করেছিলেন। সবাই বলত পঞ্চাননবাবু নির্বংশ হবে, ওর সর্বনাশ হবে, কিন্তু ঘোর কলিযুগ বলেই হয়ত সেটা সম্ভব হয়নি।

চৈত্রের শেষে উমাপদবাবু বদলী হয়ে গেলেন, কিশোরগঞ্জে। এখানে এলেন মহম্মদ রজ্জব আলী, রং কালো গড়ন লম্বা, বয়স প্রায় বেয়াল্লিশ। চিবুকের নিচে একগুচ্ছ দাড়ি। ইনি তজদিগ্ করবেন। খুব গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, ইনি। পিয়ারীকে পেলেই ইনি বোঝাতেন, ইসলাম মানে হল শান্তি। অথচ মুসলমানরা কেউ শান্তিতে নেই। এ জন্য তিনি উলেমাদের দোষ দিতেন। বলতেন, এ নিয়ে তিনি একখানা বই লিখবেন। বইএর নাম হবে "ইসলাম শান্তিতে নেই।" এ ভদ্র-লোকের কথাও পিয়ারীর কাছে উমাপদবাবুর মতই লাগত। যতক্ষণ কাছে থাকত শোনার ভান করত, আর বেরিয়ে গিয়েই হাঁফ ছাড়ত।

সুসঙ্গের জমিদারদের একটা কাছাড়ী ঘরে এটেষ্টেশান ক্যাম্প বসল। প্রথমে আটদশখানা খতিয়ান করে রজ্জব আলি ঘরে গিয়ে গড়গড়া টানতেন। সার্কল অফিসার একদিন এসে ধরে ফেলায় সে কৌশল আর চলল না। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে চলল। এখানে এত আমিনের প্রয়ো-জন নেই। একমাত্র কৃপানাথ থাকল, বাকী সবাই বদলী হয়ে গেল। পিয়ারী গেল দুর্গাপুরে, সার্কল অফিসারের একশো তিন ধারার কেসে সহায়তা করবে। তল্পিতল্পা গোটাতে হল।

দুর্গাপুরের জীবনটা মন্দ কাটেনি। সার্কল অফিসার গোস্বামী মশাই খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন। এই কাজপাগলা অফিসারটির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পিয়ারী মাঝে মাঝে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তবু তো এখানে পোষ্ট অফিস, থানা, সাবরেজিস্ট্রি অফিস আছে; অবসর যাপন করা যায়।

বাড়ী হতে ক্রমাগত তাগিদ আসছে টাকার জন্য, বনো স্কুলে ভর্তি হয়েছে। পিয়ারীর শেষ সম্বল দশটা টাকা সে পাঠিয়ে দিল মা'র নামে। উঃ, টাকা, টাকা, টাকা, সবাই টাকা চায়। মাঝে মাঝে যেন পিয়ারী খুব

ক্লান্ত বোধ করে। এত অভাব, তবুও অন্যায়ের পথে সে পা বাড়ায়নি। এই সততার মূল্য তাকে দিতে হয়েছে, জীবনভোর কাটাতে হয়েছে নিদারুণ দারিদ্র্যে। পিয়ারী দেখেছে, এ পৃথিবীতে সৎ যেমন আছে, অসতেরও অভাব নেই। তাদের জোরও কম নয়। ভালমন্দের এ লড়াইতে কখনো কখনো সে জিতেছে। অনেক অসাধু কর্মচারীর কাছ হতে পিয়ারী ধাক্কা খেয়েছে, কিন্তু কি করতে পেরেছে সে, চোখের জল মোছা ছাড়া ?

এর পর বর্ষা এসে পড়ল। মৈমনসিং এর সেট্‌লমেণ্টের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এল। এত দুঃখের মধ্যেও এখানকার একটা ঘটনা মনে পড়লে হাসি পায়। পিয়ারীর পাশের ঘরটায় থাকত উপেন্দ্র নামে কানুনগো সাহেবের এক আর্দালী। কানুনগো সাহেব বেরিয়ে গেলেই সে তাঁর মাথার তেল নিয়ে মাখত। ঘিয়ের বোতল থেকে ঘি নিয়ে খেত। একটু পাউডার স্নো ঢালাঢালি করত। খুব সৌখিন ছিল ছেলেটা। জামা কাপড়ের ও বাহার ছিল।

সামনের সাবরেজিস্ট্রি অফিসের বাড়ীটার দিকে ওর খুব নজর ছিল। পিয়ারী দেখত, প্রায়ই ও জানালা দিয়ে এ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মুখ-ভঙ্গি করে। লক্ষ্য হল সাবরেজিষ্ট্রার বাবুর একটি বয়স্থা মেয়ে। মেয়েটিকে পিয়ারীও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু উপেন্দ্রর ওপর তার মনোভাব সে জানতে পারেনি।

উপেন্দ্রর অবস্থা এদিকে বেসামাল। পিয়ারীকে যখন তখন ধরে উপদেশ চায়। পিয়ারী বলে, "সর্বনাশ, ওর মধ্যে যেওনা। মার খাবে।"

কিন্তু প্রেমে আর রণেতো ন্যায়-অন্যায় বিচার করা চলে না। হঠাৎ একদিন উপেন্দ্র একটা পঞ্জিকা এনে একটা বিজ্ঞাপন তাকে দেখায়।

"১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য।

সম্মোহিত বশীকরণ রুমাল।

এক অত্যাশ্চর্য্য আবিস্কার !

"দেবদূতদ্বয়কে বশীভূত করিয়া সম্মোহন বিদ্যার দ্বারা এই রুমাল প্রস্তুত। এই রুমালের অধিকারী যে কোন লোককে হাতের মুঠোয়

আনিতে, প্রণয়ে বিজয়ী হইতে, মামলা-মোকর্দমা, পরীক্ষা, চাকুরী, ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জনে সমর্থ হইবে। নারী হউক, পুরুষ হউক, যাহাকে আপনি পছন্দ করেন, তাহাকে এই রুমাল দেখাইলেই সে বশীভূত হইবে। ইহা দ্বারা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারিবেন। অবিলম্বে ইহা একবার গ্রহণ করুন এবং গ্রহণের প্রথম বারেই ইহার বিস্ময়কর ফল প্রত্যক্ষ করুন।

মূল্য—২৸৶০। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রফেসর ঃ—গ্রেট মেসমেরিজম্ হাউস্। জলন্ধর সিটি।"

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ত্রিশূলধারি এক সন্ন্যাসীর ছবি। পিয়ারী প্রশ্ন করে, "এতে কি হবে ?" উপেন্দ্র বলে, "রুমাল কিনে শেফালীকে বশ করব।" মেয়েটির নাম শেফালী।

বিজ্ঞাপনটা পড়ে পিয়ারীর যে কৌতূহল হয়নি, এমন নয়, তবু জিজ্ঞেস করে, "যদি কিছু না হয় ?"

উপেন্দ্র বলে, "হ্যাঁ, প্যারিদা হবেই। সেদিন আমি ভাল করে মাথায় তেল মেখে, মুখে স্নো পাউডার মেখে, জানালায় দাঁড়িয়ে আছি, শেফালী আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।"

পিয়ারী নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলে, "তবে দেখ।"

এত সব ব্যাপার অফিসার কিন্তু জানেন না। তিনি সেই আটটায় এটেন্ডেশানে বসেন, আর উঠতে উঠতে বিকেল। উপেন্দ্র ২৸৶০ পাঠিয়ে দিল ডাকে। এর দিন কুড়ি পরে সত্যিই একটা ভি-পি এল ওর নামে। সেটা ছাড়িয়ে আনতে আরও তুটাকা মত লাগল। উপেন্দ্র ওটা লুকিয়ে রাখল। সুবিধেমত ব্যবহার করতে হবে। বেশ খুশি খুশি লাগে ওকে। পিয়ারী অনেক অনুরোধ' করেছিল একবার দেখাবার জন্য, উপেন্দ্র রাজী হয়নি। বলে, "ওতে গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তোমাকে দেখালে তোমার নাকে গন্ধ গেলে, তুমি বশীভূত হয়ে যাবে। পরে দেখো। আগে শেফালী আর তার বাবাকে বশ করে নিই। একবার গন্ধ শোঁকাতে পারলেই হয়।" পিয়ারী আর কোন মন্তব্য করে না।

এক রবিবার বিকেলে, সে সার্কল অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে,

দেখে উপেন্দ্র সেজে গুজে বেরোচ্ছে, হাতের মুঠোতে কি যেন। শেফালী বাড়ীর বাইরের মাঠে বেড়াচ্ছে। কানুনগো সাহেব, রোববার হলেও একটা তদন্তে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ যেন কি হল, উপেন্দ্র হাতের মুঠোয় লুকোন রুমালখানা, শেফালীর নাকে চেপে ধরতেই, সে ভয়ে প্রাণপণে চীৎকার করে ওঠে। গোস্বামী মশাই ছুটে গেলেন, সাবরেজিষ্ট্রার ছুটে এসে পায়ের জুতো খুলে উপেন্দ্রকে মারতে মারতে ছুটলেন। জুতোর কয়েক ঘা খেয়ে ওর নেশা ছুটে গেছে। উপেন্দ্র প্রাণপণে ছুটে এসে রাস্তায় উঠে, মাঠে নামল। পেছনে জুতো হাতে সাবরেজিষ্ট্রারবাবু তখনও ছুটছেন। আধ মাইল গিয়েও তাকে ছুটতে দেখে ও আবার গতিবেগ বাড়িয়ে উধাও হয়ে গেল। সারারাত হৈ হৈ। উপেন্দ্রর অফিসার এসে শুনে বলেন "স্কাউণ্ড্রেলটাকে আমি জেলে দেব। ফিরে আসুক আগে।" কিন্তু স্কাউণ্ড্রেলটা আর ফিরে আসে নি। মারের চোটে কি তবে শেফালীকে ভুলে গেল? পিয়ারীর মনে পড়ল ১৯৪১ সালের দুর্গাপূজোয় মনটা খুবই খারাপ ছিল তার। সার্কল অফিসার আদেশ দিলেন, দেশে এবার কেউ যেতে পারবে না। সে বাড়ীতে চিঠি লিখে দিল যে এবার বাড়ী যেতে পারবে না। মাইনের টাকা থেকে বাড়ীর টাকা পাঠিয়ে দিল।

পূজোর ক'দিন সে কি অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা! ঘুমের ঘোরে যেন কানে বাজে ঢাকের বাজনা, রাধু, পিণ্টুর মুখ ভেসে ওঠে। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। চোখে আর ঘুম নামে না। সব অফিস বন্ধ, সবাই দেশে চলে গেছে। শুধু তারা, সেট্‌লমেণ্টের লোকেরাই কাজ করছে। কত পাপ করেছিল, তাই আমিনের চাকরী হয়েছে। পূজোর ছুটি শেষ হতেই আবার সবাই এল। সাবরেজিষ্ট্রারবাবু আর তার মেয়েও এল। থানার যারা দেশে গিয়েছিল তারাও ফিরে এল। আবার সেই পুরানো দুর্গাপুর। সেট্‌লমেণ্টে কাজ হয়, সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে লোকে দলিল রেজিষ্ট্রী করতে আসে, থানায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি হয়। হেল্‌থ সেণ্টারের ডাক্তার অনিমেষবাবু বেড়াতে গেলে, সহাস্যে অভ্যর্থনা জানান।

এর পর শীত জমজমাট হয়ে এল। প্রাচ্যেও যুদ্ধ লেগেছে, দলে দলে

লোক কলকাতা ছেড়ে বোমার ভয়ে পাড়াগাঁ আসছে। এখানে সৈনিক রিক্রুটমেন্ট সুরু হয়েছে, দেশময় হুলস্থুল।

দেশ হতে চিঠি এল, বাড়ীতে চোর পড়েছিল। সিঁদ দিয়ে সব জিনিস নিয়ে গেছে। পরণের কাপড়খানা ছাড়া আর কিছুই নেই। অবিলম্বে টাকা না পাঠালে, তারা না খেয়ে থাকবে। তারা আর একলা থাকতে সাহস পায় না। দেশ বিদেশী লোকে, দালালে, ছেলে ধরায় ভর্তি হয়ে গেছে। পিয়ারী চোখে অন্ধকার দেখে। সার্কল অফিসারকে চিঠি দেখায়। চোখ হতে টপ টপ করে জল পড়ে। এত গম্ভীর অফিসারের মুখও নরম হয়। তিনি পকেট হতে দুখানি দশটাকার নোট পিয়ারীকে দিয়ে বলেন, "বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।" পাশে এক কানুনগো শৈলেশ সেন ছিলেন, তিনিও একটা দশ টাকার নোট ওকে দেন। সমস্ত টাকাটা সে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। কাজও প্রায় শেষ। একদিন সার্কল হাকিম হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠালেন, কমপ্লিশন রিপোর্ট। এরপর যা কিছু কাজ তো সদরে।

এ বছরই সেট্‌লমেন্ট অফিসার বেষ্টিন সাহেব সেট্‌লমেন্ট হতে বিদায় নেন। বহুদিন তিনি এদেশে কাটিয়েছেন, এদেশের উপর তাঁর একটা মায়াও জন্মেছিল। বিদায় অভিনন্দনের সময় সেকথা বলে তিনি দুঃখ করলেন। বললেন যে, সেট্‌লমেন্ট যে সততা, নিষ্ঠা, ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার মনোবৃত্তি জন্ম নিয়েছে, তা বহু কষ্টার্জিত, তা যেন বিলুপ্ত না হয়। সমাগত ভদ্রলোকদের তিনি ধন্যবাদ জানান। এরপর খাওয়া দাওয়া হল। পিয়ারী উপস্থিত ছিল সে পার্টিতে।

বড়দিনের ছুটি বেশ লম্বা। পিয়ারী দেখল বদলীর আদেশ আসছে অনেকের, তারও এল বলে। ফরিদপুর সেট্‌লমেন্ট সুরু হয়েছে। এই বদলীই তো সে চায়। এবারে যেখানেই পোষ্টিং হোক, মা, রাধু ওদের নিয়ে থাকবে। আলাদা থাকার খরচ আর পোষায় না।

ডিসেম্বর আসতেই বদলীর আদেশ এল পিয়ারীর, ফরিদপুর সেট্‌লমেণ্টে। মনটা খুব প্রসন্ন, নিজের দেশতো।

মৈমনসিং থেকে বিদায় নিল সে একদিন। রাজা ভগদত্তের

ঈশাখাঁর দেশ, ব্রহ্মপুত্র নদীবিধৌত বুদ্ধদেবের পুরাতন কামরূপ সে ছেড়ে চলল। দেশে যাবার জন্য মনটা উৎফুল্ল ছিল বলে, ততটা দুঃখ বাজেনি।

ফরিদপুর সেট্লমেণ্টে এসে জানল, তার অফিসার রণেন সেন। দেখা হলে নমস্কার করল। পিয়ারী বলল, বাড়ী গিয়ে মা বৌকে নিয়ে আসবে, ওখানে ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে। অফিসার বলেন, "পেস্কার আগেই চলে গেছে, সে লিখেছে, চন্দনার পারে শ্রীশ সেনদের বাড়ী, আমার জন্য ঠিক করেছে। আমিতো ফ্যামিলি নিয়ে থাকব না, তুমিই ওখানে ওঠো। আমি ক্যাম্পেই ব্যবস্থা করব।"

পিয়ারী কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় নিল। যাবার পূর্বে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট অম্বিকা মজুমদারের বাড়ী, রাজেন্দ্র কলেজ, চোল সমুদ্রের মাঠ, ঈশান স্কুল, মরা পদ্মা দেখে নিল। বনোর স্কুল খোলা, ওর সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে দেখা করে একরাত্রি রইল। পরদিন চকবাজার হতে কিছু কেনাকাটা করে রাতের ট্রেণে দেশে রওনা হয়ে গেল। বনোয়ারী ও আর একটি মিশনের ছেলে এসে ট্রেনে পিয়ারীকে তুলে দিয়ে গেল।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

ইংবেজি ১৯৪২ সনের ফরিদপুর। রিভিশনাল সেট্লমেণ্ট সুরু হয়েছে। ই. বি. আর এর কালুখালি জংশন হতে যে লাইন ভাটিয়া-পাড়ার দিকে গেছে, তারই ষ্টেশন রামদিয়া, বহরপুর, কামারখালি, মধুখালি, ঘোষপুর,··· ব্যাসপুর, ভাটিয়াপাড়া। খুব ভোরে যে ট্রেণখানি প্রায় রাত চারটাব সময় ঘুমন্ত যাত্রীদের নিয়ে এসে বহরপুর দাঁড়াল, সেদিন জানুয়ারীর পনেবো তারিখে। বহরপুর তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। আকাশের তারাগুলি যে যার স্থান অদল বদল করে অস্তাচলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। একটু পরেই শুকতারা উঠবে। গাড়ীর গতিও বেশী

নয়। ডাক নামল, দু একজন স্থানীয় কারবারী নামল, আর নামল একটা কামরা হতে জন আষ্টেকের একটি দল। ওদের সঙ্গে বাক্স, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, আরও অনেক জিনিসপত্র। প্রচণ্ড শীত, ষ্টেশন মাষ্টার চেয়ারে বসে আছেন আপাদমস্তক আলোয়ান মুড়ি দিয়ে। ভেতরে কাজ শেষ হলে, গেটে এসে দাঁড়ালেন। হাঁকলেন, "কোথারে রামপিয়ারী, ঘণ্টি দে না।" বহরপুরের লোকেরা গভীর ঘুমের মধ্যে শুনল স্টেশনের ঘণ্টা আর গাড়ীর হুইস্‌ল। গার্ড বাঁশি বাজিয়ে সবুজ আলো দেখাতে গাড়ী এগিয়ে চলে। সুখ-সুপ্ত বহরপুরের অধিবাসীদের মনে ঘুমের মাঝে একটু শুধু সাময়িক চেতনা দিয়ে গাড়ী ডান দিকে বাঁক ঘুরে দূরের পথে রওনা হল।...

স্টেশন মাষ্টার টিকিট নিচ্ছেন। বিরাট দলটি দেখে একটু বিস্মিত হলেন। আলো তুলে দেখে, টিকিটগুলি হস্তগত করে বলেন, "আপনারা ?"

"সার্ভে পার্টি।"

"ও," বলে মাষ্টারমশাই পথ ছেড়ে দিলেন, "তা যান, ক্যাম্প হয়েছে সামনের বাজারে।"

সবাই বেরিয়ে এসে রাস্তার মোড়ের বটগাছটার নিচে দিয়ে ডাইনে ঘুরে, পানের বরজের মালিক অশ্বিনী দাসের বাড়ী ছাড়িয়ে এসে ক্যাম্পের পথে এগোয়। ক্যাম্পে পেস্কারবাবু আগেই পেঁছেছিলেন। মিনিট ছয়েক লাগল পেঁছতে। পেস্কার দরজা খুলতে, সেন সাহেব প্রশ্ন করলেম, "পিয়ারীলাল সরকার আসেনি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার আদেশে সেনবাবুদের ছনের বাড়ীটা ওকে দিয়েছি।" রনেণবাবু আর কোন কথা বলেন না। এখন কোন মতে বিছানা পেতে শুতে পারলে হয়। যা কষ্ট গেছে রাত্রে।

বহরপুর-রামদিয়ার জীবনে নতুন জোয়ার এল। সমস্ত কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকরীজীবীদের মধ্যে নড়াচড়া সুরু হয়েছে। শ্রীশ সেনদের ছোট ছেলে শক্তি সেন ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। এদের বাসায় পিয়ারী আছে। অনেকে অধিকার রক্ষার জন্য দেশে এসে বসবাস করছেন। সেটলমেণ্ট হয়ে গেলে আবার কর্মস্থলে ফিরে যাবেন।

কাজ সুরু হয়ে গেল। কিস্তোয়ার শেষ হয়ে গেছে, এখন খানাপুরি, বুঝারত। তিনজন আমিন এসেছে, তার মধ্যে ছুজন এখান হতে অনেকটা দূরে আছে, আর সে আছে এখানে। অন্য ছুজনের নাম— আবছুল গণি ও বলরাম মান্না।

মাসের শেষদিকে কাজ সুরু হল। পিয়ারী একশো করে খতিয়ান বই, খসড়া, টেবিল নিয়ে পিওন সুবলকে বলে, "চল।" নতুন মাঠ, ঘাট, পুকুর, নতুন দেশ, নতুন পরিচয়। প্রথম দিন মাঠে যেতেই চোখে পড়ে শিশির ভেজা হলুদ ধানের উপরে কুয়াশা ভেদ করে রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

অভাব অনটন ভরা, মরচে পড়া মনটায় যেন একঝলক রৌদ্রালোক পড়ল। কি আনন্দ, কি আনন্দ। এখানে টাকার কথা নেই, ছেলের পাণ্ডুর মুখ নেই, মার ঈর্ষাতুর চাহনি নেই। সামনে উদার প্রকৃতি আর প্রজারা। সেতো এখানকার অধীশ্বর। সত্যিইতো পৃথিবী আনন্দময়, শুধু আমরাই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি বলেই তো, এই আনন্দলোক আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। মাটির রূপই বা কতো, কোথাও সবুজ ধানক্ষেত, কোথাও চা, কমলালেবুর বাগান তৈরী করে নিজের রূপ প্রকাশ করছে। চিরযুবতী, চিরসুন্দরী এই পৃথিবী নতুন প্রাণের সঙ্গে সখ্যতা করবার জন্য তো সর্বদাই প্রস্তুত। প্রথম দিন বেলা বারোটা পর্যন্ত কাজ করল এই কুসুমদিয়া গ্রামে। তারপর রোজ কাজ চলল, খানাপুরির খতিয়ানগুলি সে ভরে আনত রোজ। প্রজারা সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত। মাঠে সময় এমনি করে কেটে যেত। ছুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে শক্তি সেনের বারান্দায় যেত। সে সেখানে বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করত। ঘর্মাক্ত বলিষ্ঠ দেহ। পেশীগুলি ব্যায়ামের সময় কেমন ওঠা নামা করে। শক্তি সেন বলে, "বসুন।" পিয়ারী একটা বেঞ্চে বসে বসে ব্যায়াম দেখে। এতবড় বাড়ীতে শক্তি সেন একা আছে, চাকর বংশী ভাত রেঁধে দেয়। ব্যায়ামান্তে, গল্প করে শক্তি সেন। পিয়ারী লক্ষ্য করে, এ লোকটি অদ্ভুত। নতুন ধরনের কথাবার্তা বলে। কি শক্তি লোকটার দেহে, তেমনি জোর তার কথায়।

শক্তি সেন বলে, "কবে শেষ হবে আপনার কাজ, কলেজ যে কামাই

হচ্ছে।" শক্তিবাবু ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে বি, এ, পড়ে। পিয়ারী বলে, "খানাপুরি শেষ হলে ঘুরে আসুন। বুঝারত আরম্ভ হতে প্রায় সেই বৈশাখ।" পিণ্টু এসে আড্ডা জমায়, শক্তি সেনের সঙ্গে। শক্তি সেন তাকে শেখায় নতুন ছড়া, শোনায় নতুন গল্প। অন্ধকারে পিণ্টু আগে বেরোতে ভয় পেত। শক্তি সেন বলল, "ভয় বলে কিছু নেই, পিণ্টু। ওকি এগুচ্ছো না কেন ? ঐ অন্ধকারকে ভয় ? আচ্ছা দাঁড়াও।" টর্চ জ্বেলে বলে, "দেখলে, কিছু নেই।" পিণ্টু টর্চের আলোতে বীর-দর্পে এগিয়ে যায়, মার কাছে।

সেদিন এসে মাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনায়,

"ওগো সই ললিতে,<br>
ধরো একটি পলিতে,<br>
অন্ধকার গলিতে,<br>
নাহি পারি চলিতে।"

আরও কত ছড়া কাটে সে। পিয়ারীকে শক্তি সেন বলে, "ও খুব মেধাবী ছাত্র হবে। পড়াবেন ওকে।" জায়গাটা পিয়ারীর মন্দ লাগছে না। যুদ্ধের হাওয়া কম, জিনিসপত্রের দামও খুব বেশী নয়। তবুও সংসারে দুঃখ নামে। সেদিন রাত্রে সে খেতে বসেছে, পারুলবালা বলে, ' 'চাল কিন্তু নেই পিয়ারী। আজই শেষ।"

"সেদিন চাল আনলাম, আজই নেই মা।"

পারুলবালা, একটু কঠিন কণ্ঠে বলে, "কতগুলি পেট খেয়াল আছে ?"

পিয়ারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। ক'টাকাই বা মাইনে, তা কবে ফুরিয়ে গেছে। ভোরে উঠেই তো কাজ, কি করে যে চাল জোগাড় করতে যাবে, কে জানে। কোন মতে ভাত খেয়ে উঠল। রাতে শোবার আগে রাধু বলে, "শুনলে, কাল মা কেমন বল্লেন, পিণ্টুর জামা কিনেছ, বনোর আনোনি।" পিয়ারীর আরও এক দফা মন খারাপ হয়। বনোতো এখানে নেই, এলে, জামা কেনা যাবে না ! সে লক্ষ্য করছে মার ব্যবহার যেন দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। কোন কথা না বলে স্ত্রীর হাত হতে পানটা নিয়ে সে শুতে যায়।

শীতের শেষে বহরপুর, রামদিয়া, নবাবপুর গ্রামগুলির খানাপুরি শেষ হলে, শক্তি সেন বলল, "এবার কদিন আমি তো ঘুরে আসতে পারি।"

পিয়ারী বলে, "তা পারেন। কিন্তু এপ্রিলের পনেরোই থেকে বুঝারত স্থুরু হবে। খানাপুরির অল্প বাকী।"

শক্তি সেন বলে, "ওঃ এর মধ্যে ঘুরে আসব।"

কদিন পরে শক্তি সেন, চাকরটাকে রেখে বিদায় নেয়। আকাশ বাতাস তখন বসন্তের আগমনী গাইছে। বৃক্ষশাখায়, চন্দনা নদীর জলেও তার ছোঁয়া লেগেছে। মাঠে কাজের সময় শোনা যায়, দূর গ্রাম সীমান্তে 'বৌ কথা কও' পাখী ও কোকিলের গান ; আম্র মুকুলের গন্ধে মন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রজাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিয়ারী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

সেদিন কাজের শেষে সে ফিরছে, হঠাৎ বোসবাবুদের বাড়ীর কাছ হতে শোনে, তাদের কলকাতা হতে আনা রেডিওটা গাইছে, একটা স্থুন্দর গান ঃ

'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।'

পিয়ারী একটু দাঁড়ায়। স্থুবল টেবিল নিয়ে আগে চলে গেছে। এ গানে কি মায়া আছে কে জানে। মনে হয়, পিয়ারীর কাকে যেন জীবন-ভোর জানা হয়নি। তাকে মাঝে মাঝে, হঠাৎ আবছায়া মত চোখে পড়ে, আবার মিলিয়ে যায়, ইসারায় হাতছানি দিয়ে। তাকেই কি খুঁজছে সারা জীবন? কিন্তু কে সে? অশিক্ষিত আমিন তার হদিস জানে না।

গান শেষ হয়ে যায়। পিয়ারী হাঁটে। একটু কৌতূহল হয় পিয়ারীলালের, বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়, দেখে কে আছে ঘরে। একটি স্থুন্দরী কিশোরী গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে, স্থুন্দর মুখের দুপাশ দিয়ে চিকণ কালো, পরিপাটি করা চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে। যেন ঘুমন্ত রাজকন্যা। পিয়ারী বুঝল এই বোসবাবুর বোন, কলেজে পড়ে। পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে বলে, মা-ভাইএর সঙ্গে দেশে এসেছে। মার মুখে বর্ণনা শুনেছে। পিয়ারী সরে আসে, থাক এসব চিন্তা আর কেন? তারপর বাড়ীর পথ ধরে। রেডিও কিন্তু তখনও মুখর।

ফাল্গুনের প্রথমে একদিন কানুনগো সাহেব ইনস্‌পেকশান করে করে গেলেন।

সেদিন নদীর ধারে কাজ হচ্ছিল, কতকগুলি জেলে নদী হতে মাছ ধরছে। পিয়ারী কাজ রেখে নদীর পারে যায়। একজন জেলে চারটি বড়বড় সরল পুঁটি পিয়ারীকে দেয়, বলে, দাম লাগবে না। পিয়ারী বলে, "না, দাম নিতেই হবে।" ওরা হাসে, এই কটা মাছের আবার দাম কি? প্রজাদের মধ্যে সাহাদের ছোট ছেলে প্রণব সাহা ছিল, সে বলে, "আপনি এখানে চারটি মাছ নিতে এমনি করছেন, ওদিকে আমিনরা দেখুন গিয়ে, এ হেন জিনিস নেই, না নিচ্ছে। সবাই একবাক্যে বলে, "এমন আমিনবাবু তারা দেখেনি। কারুর কাছে কিছু চাইবে না।" পিয়ারীর বুক গর্বে ফুলে ওঠে। এসব কথা রণেন সেনের কানেও যেত।

প্রণব বলে, "এর কি মূল্য আছে, আমিনবাবু। তাদেরই বা কি ক্ষতি হচ্ছে, আর আপনিই বা কি লাভ করছেন?" পিয়ারীর মনটা আবার অপ্রসন্ন হয়ে যায়। সত্যিই কি, সৎ অসৎ এ তফাৎ নেই?

বৃদ্ধ রাইরচণ বলে, "না বাবু ধম্মোই লাভ। আমাদের পিয়ারীবাবুর ভাল হবে।" পিয়ারী আবার কাজে মন দেয়।

বহরপুর বাজারে চাল প্রায় নেইই। সরকার হতে গ্রুয়েল কিচেন (লঙ্গরখানা) করে দিয়েছে। চাল, ডাল, নুন, তরকারি এক সাথে পাক করে বিতরণ করা হয়। তাই পাবার জন্যে মানুষের কি ভিড়। গ্রামের যুবকেরা সবাই মিলে এটা পরিচালনা করছে। রাতে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ছে, দুঃস্থ মধ্যবিত্ত যারা তাদের গোপনে সাহায্যের জন্য, তারা তো এসে লাইনে দাঁড়াতে পারে না। এর মধ্যে আছে, প্রণব সাহা, গোপেন দাস, শুভেন্দু সরকার, ভূষণ মণ্ডল। সরকারি কর্মচারী যারা আছে, তারা পালা করে এসে রান্না এবং পরিবেশনে সহায়তা করেন।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই বুঝারত সুরু হল। পিয়ারী শক্তি সেনকে একখানা পত্র লিখে দিল। শক্তি সেন দিন পাঁচ ছয়েকের মধ্যেই এসে উপস্থিত হল। সেন সাহেব পিয়ারীকে এবং অন্য দুজন আমিনকে বোঝালেন, "এইটাই আমার শেষ কাজ, এটা খুব ভাল করে

করবে। এরপর কানাইপুরের এটেষ্টেশানে আমাকে যেতে হবে।" পিয়ারী মাথা নেড়ে বলে, "যতদূর আমার সাধ্য ভাল করে করব।" অন্য ছজন আমিনও তাই বলল। পুরোনো আমিনদের একথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। মৌজার ম্যাপ এবং খতিয়ানকে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখে। পিয়ারীলাল শীটের কাজের সময় নাক মুখ ঝেড়ে কাজ সুরু করত। ছুটো সরু পেন্সিল রাখত, শীট চোঙ্গার মধ্যে যত্ন নিয়ে পুরে মুখ বন্ধ করত।

এরপরে ১৯৫৫ সনে সে দেখেছে খাদ্য বিভাগ হতে আমিন এসেছে, তাদের কেউ বা ম্যাট্রিক কেউ বা আই, এ, কেউ বা বি, এ পাশ। তাদের প্যান্টশার্টের ঝিলিক দেখেছে পিয়ারী, কিন্তু জরীপে তেমন আগ্রহ দেখেনি।

অনেকদিন পরের একটা ঘটনা। ১৯৫৫ সনে মুর্শিদাবাদে তোপখানার কাছে একটি গ্রামে চার্জ অফিসার তাকে পাঠান তদন্তে, "নতুন আমিনরা কি করছে দেখে এস।" পিয়ারী গিয়ে দেখল, যেখানে আমিনের থাকার কথা সে সেখানে নেই। পিয়ারীর খুব ভয় হল, মুর্শিদাবাদে এ অঞ্চলে বনের মধ্যে অনেক পুরোনো কুয়ো আছে, তার মধ্যে পড়েনি তো। আবার ভাবল, কলকাতায় পালায়নি তো। একটা লোক আসছিল, তাকে পিয়ারী প্রশ্ন করে, "এখানে আমিন কোথায় কাজ করছে, মিয়াসাহেব ?" লোকটি রুষ্ট হয়ে বলল, "আমি মিয়া সাহেব নই, আমি একজন নবাবের বংশধর, ২।৵০ বৃত্তি পাই। তা ওদিকে তো দেখেছিলাম।"

আর একটু এগুতেই বেশ মিষ্টি বাঁশির সুর কানে এল। আরে এ সুর যেন চেনা, বহরমপুরে সেদিন দেখা সেই হিন্দী সাপের বইর গান, 'মেরে দিলমে পুকারে আযা'।

আর একটু হাঁটতেই চোখে পড়ল একটা বড় ল্যাংড়া আমের গাছের নিচে টেবিল, চেন, চোঙ্গা শীট সব পড়ে, আর আমিনবাবু গাছের ডালে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। পিয়ারী ফিক করে হেসে ফেলে ডাকে, "আসুন, নেমে আসুন।" আমিন নেমে এল, বলল. "কিছুই বুঝতে পারছিনা কি করব।"

পিয়ারী ও অন্যান্য আমিনরা কানুনগো সাহেবদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে চলে আসে। ষ্টেশনের পথে পিয়ারীর জুট রেগুলেশন বিভাগের একজন পি, এল, এর সঙ্গে দেখা হয়। নাম অমিয়লাল সেন। বাড়ী বরিশাল জেলায়। অমিয়বাবু কুশল জিজ্ঞেস করেন, তারপর প্রশ্ন করেন, "আর কতদিন বাকি কাজ শেষ হবার?"

পিয়ারী উত্তর দেয়, "দেরী আছে। আপনাদের?" "আমাদের কি শেষ আছে? ইশাক সাহেব যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন আমাদের। পাট যেন বেশি চাষ না হয়, এ বাণী আমাদের চাষীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে তো।" অমিয়বাবু শ্রদ্ধায় গদগদ। তাকে ছাড়িয়ে পিয়ারী বাড়ীর পথ ধরে।

বৈশাখের মাঝামাঝি কি যেন হল, একদিন সবাই ঘুম হতে উঠে শোনে, কারা যেন রেল লাইন তুলে ফেলেছে, টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে। কিন্তু কে যে করেছে কেউ জানে না। সেদিনটা আর গাড়ী এলো না, খুব থমথমে ভাব। পরদিন পুলিশ এসে গ্রাম ঘিরে ফেলল। লাইন মেরামত চলল, তার ঠিক হল। পুলিস গ্রামের ক'জন যুবককে বেছে বেছে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বাদ পড়ল, শক্তি সেন।

আবার গাড়ী চলল, মানুষজন ওঠা নামা করতে সুরু করল ষ্টেশনে। বহরপুর, রামদিয়ার জীবন সহজ পথেই চলল। এর মধ্যে একটা খবর এল, বিকেলের গাড়ীতে নীরোদ সাহা বলে একটি যুবক রেলের নীচে আত্মহত্যা করেছে। গ্রামে হৈ হৈ পড়ে যায়। শক্তি সেন যায়, সবাই যায় দেখতে। পিয়ারী ভয়ে যেতে সাহস পায় না, ও দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবেনা। রাত্রে শক্তি সেন ফিরে এসে বলল, "ব্যাপারটা আসলে কিছুই নয়। এর জন্য যে নীরোদ প্রাণ দেবে, তা কেউ বুঝতে পারে নি। ও এই গ্রামের সুনীল রাহার বোন কল্পনাকে পড়াত। মেয়েটির সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়। রাতে লুকিয়ে নীরোদ কল্পনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও করত মাঝে মাঝে। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সুনীলের বাবা মেয়েকে কলকাতায় গোপনে পাঠিয়ে দেন। এতদিন পরে এই বৈশাখে কল্পনার বিয়ে হয়ে যায়, কোথায়

ষেন। সেই খবর নীরোদ কদিন আগে শুনতে পায়, সুনীলের কাছে। বোনের বিয়ে হয়ে গেলে ও ফিরে এসেছে। তারপর আজকের এই ঘটনা।"

পিয়ারী দুঃখ করে, আহা, এমনি করে রেলের তলায় গলা দিল!

শক্তি বলে, "এমন করে আত্মহত্যার কি মানে হয়? একটা মেয়ের জন্য একটা মূল্যবান জীবন বিসর্জন। এরকম সেন্টিমেণ্টালদের মৃত্যুই ভাল। এর চেয়ে দেশের কাজ করে মরলে লোকে নাম করত।"

বুঝারতের কাজ চলছে। আমিন জীবন, যখন যেখানে কাজ করে তখন সেখানকার লোকেরা যত্নআত্মি করে। কেউ ডাব খাওয়ায়, মিষ্টি আনে, কেউ দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করে। তখন প্রায় সব আমিনবাবুরা অন্যান্য লোকের বাড়ীতে খেয়ে কাজ করত, এতে নিন্দারও কিছু ছিল না। পিয়ারী অবশ্য মাঝে মাঝে যে খায়নি তা নয়, তবে সে বেশীর ভাগই চেন-পিওনকে দিয়ে রান্না করাত। তাহলেও এ নিয়ম আর পরে চলত না। কোন বাড়ীতে কিছু খাওয়া দাওয়া করলেই লোকে অপবাদ দিত। পরে অন্য বাড়ীতে খেয়ে কাজ করা, এ প্রথা সেট্‌লমেণ্ট হতে উঠে যায়।

পিয়ারী ২৪ পরগণা সেট্‌লমেণ্টে যোগদানের পরে, শ্যামনগর হতে তার সোজা পোষ্টিং হয় ভাঙ্গরে, কাশীপুরে। নাংলা পালপুর মৌজায় একটা বিচার ছিল, চাটুজ্জেদের অন্নদাবুড়ি আর মিত্তিরদের মধ্যে। এটেষ্টেশান হাকিম মজুমদার সাহেব প্রথম দিন শুনানীর পর পিয়ারীলালকে সরজমিন তদন্তের আদেশ দিলেন। সেই রাত্রেই মিত্র বাড়ীতে কি একটা ভুরিভোজনের আয়োজন ছিল, তাদের বাড়ীর বড় তরফের বড় ছেলের স্কুল ফাইনাল পাশ উপলক্ষ্যে। পোলাও রান্না হল, খাসি কাটা হল। পিয়ারীর নিমন্ত্রণ ছিল, সেই রাত্রে সরল মনে খেয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল সে। রাত্রেই কে যেন এসে বুড়ির কানে কথাটা লাগিয়ে দিল। "তোমার তদন্তের তো কাজ শেষ, আজ রাত্তে মিত্তিররা আমিনবাবুকে খাসি কেটে খাইয়েছে।"

সকালে পিয়ারীলাল শীট খসড়া নিতে এসেছে। অফিসার বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এমনি সময় বুড়ি এসে আছাড় খেয়ে পড়ল ক্যাম্পের বারান্দায়। কি ব্যাপার? কিন্তু বুড়ি কোন কথাও বলে না, ওঠেও না, শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদে। দু'চার জন করে লোক জমতে শুরু করল, রগড় দেখতে।

শেষে অফিসার আসতে হেঁচকি তুলে বলে, "কি হবে গো সাহেববাবু আমার তদন্তের। আমিনবাবুকে কাল যে মিত্তিররা খাসি কেটে খাইয়েছে। তবে তো—।" মজুমদার সাহেবের কান তো লজ্জায়, অপমানে লাল হয়ে ওঠে, আর পিয়ারীর অবস্থা তখন সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তের মত। শুধু পৃথিবী দ্বিধা হলেই হয়। এ জীবনে পিয়ারীলাল সরকার কখনও এমন অপমানিত হয় নি। সমবেত লোকেরা দু'একটি মন্তব্য করছে, কেউ ভাল, কেউ মন্দ। মজুমদার সাহেব বলেন, "চল বুড়ি, আমি এনকোয়ারী করব, আমি তো আর খাসি খাইনি।" কোনমতে অবস্থা আয়ত্তে আসে। এরপর থেকে পিয়ারী খুব সতর্ক হয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠে আম পাকল। কিন্তু পূর্ব বাংলার আমে পোকা বেশী। মালদা, দিনাজপুরের আমের সে মনোহারিত্ব এখানে নেই। বনোয়ারীলাল এল গ্রীষ্মের ছুটিতে। যতদূর সে পারল আম কাঁঠাল, জাম, জামরুল যোগাড় করল ওদের খাবার জন্য। এদিকে বুঝারতও শেষ হয়ে এসেছে। এর মাঝে হঠাৎ পিণ্টুটা খুব জ্বরে পড়ল। পিয়ারী বুঝারতের কাজগুলি বুঝিয়ে সাহেবকে ফেরৎ দিয়ে এল। শুধু বহরপুরের শীট ও রেকর্ড খসড়া রেখে দিল, একবার ভাল করে চেক করে দু'তিন দিন পরে ফেরৎ দেবে।

আজ আর পিয়ারী বেরোল না। মাথায় নানান চিন্তা। হয়তো নতুন জায়গায় যেতে হবে বদলী হয়ে। জীবনে আজ সন্ধ্যার এই ছবিটি, যা আজ পরম সত্য, বাস্তব, দুদিন পরে তো তা হারিয়ে যাবে। মনটা কেমন করে। এই বহরপুর, রামদিয়া, এই রেল লাইন, চন্দনা নদী সব তাদের নক্সায় থাকবে। পুরানো নবাব বাড়ী তার আলামত থাকবে, মাঠে মাঠে নারকেল, বট, আমগাছ থাকবে; ঘোষ, বোস, সেন,

সাহা, রশিরা থাকবে, কিন্তু থাকবে না শুধু সে, যে প্রতি প্লটে পা রেখে রেখে এই জমির রেকর্ড তৈরী করেছে। ভাবলে কেমন যেন লাগে।

কত জায়গা সে ঘুরল, কত বিচার সে দেখল, কত অপরূপ মানুষ সে প্রত্যক্ষ করল। মাটির কোন মায়া নেই। মায়া মানুষের প্রাণের। মাটি কেনা যায় না কোনদিন, কোনকালে। কোন মূর্খ কবে মাটি কিনে রাখতে পেরেছে! শুধু বিবাদ এড়াবার জন্যই তো তার ভোগস্বত্বটি কিনে কোবালা করেছে। অথচ এই মাটির জন্য, কত লাঠালাঠি কত রক্তারক্তি। মানুষ যে মায়ের গর্ভে জন্মায়, সেই মাকে মানে না, বাবাকে হত্যা করে, ভাইএর মাথা কেটে উপঢৌকন পাঠায়, সবই এই জমির জন্য। একবার ভাবেনা কে আপন, মাটি, না আপন জন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, পুরোনোদের দাবী শিথিল হয়ে আসে নতুনের দাবীতে। তখন হাস্যকর মনে হয়, এই হানাহানি। পিয়ারীই তো কতো দেখেছে, তার এ জীবনে। হীরাঝিল, জগৎশেঠের বাড়ী, মুর্শিদাবাদের নবাবদের ধ্বংসাবশেষ। মীরজাফর আলীখাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা, আবার বিলুপ্তি। ইংরেজদের আমল, নতুন শাসন ব্যবস্থা, আর পিয়ারী তো তারই ফসল। কত দেবী সিংহ, কাশিমবাজারের মহারাজা, দিনাজপুর, বর্ধমানের মহারাজা, বারুইপুরের চৌধুরী, ভূষণার সীতারাম, টাকীর রায়চৌধুরী, জয়নগরের মিত্র আরও কত জমিদাররা তাদের শক্তি ও দম্ভ নিয়ে কালের স্রোতে হারিয়ে গেল। এখন শুধু তাদের ক্ষীণ চিহ্ন বর্তমান।

কাল এগিয়ে চলেছে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনেরও বা কত রূপান্তর হল। প্রজাদের যুগ এগিয়ে আসছে। আর মিথ্যে রসিদ দিয়ে প্রজা উচ্ছেদ চলবে না। চোখ রাঙানিকে ভয় করে জমিদারের পা ধরে কাঁদবে, সেদিন এখন ক্রমবিলীয়মান। মানুষ অনেক বুদ্ধিমান হয়েছে আজকাল।

পিয়ারীলাল শুনছে, দেশের স্বাধীনতার দাবী নিয়ে জোর লড়াই চলেছে। আর কেউ ইংরেজদের রক্ত চক্ষুকে ভয় করছে না। মহাত্মা গান্ধী, নেহরু ও অন্য সব নেতারা বন্দী। সুভাষ বসু গোপনে দেশের

বাইরে চলে গেছেন। পিয়ারী বৃটিশ বুনিয়াদের সৃষ্টি। তার তেমন ভাল লাগে না, ইংরেজরা চলে গেলে দেশ চালাবে কে ?

আবার ভাবে, এবার যুদ্ধে ইংরেজরা উৎখাত হবে। সবাই বলছে। যুদ্ধের হাল চাল সে কিছু বোঝে না, শুধু দেখে চাল, ডাল, তেল কাপড়ে যেন আগুন লেগেছে। একটি ছেলে আলোয়ান গায়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। পিয়ারী তাড়াতাড়ি চোরের মত উঠে দরজা খুলে রাধুকে ডাকে। রাধু একটা ধামা আনে। চাল, ডাল, একখানা কাপড় দিয়ে যায় ছেলেটি। বলে, "এক সপ্তাহের ডোল দিয়ে গেলাম আমিনবাবু।" কাপড়খানা পেয়ে রাধু খুশি হয়। ছেলেটি আবার আলোয়ান খুলে ভাঁজ করে বগলে করে চলে যায়।

পারুলবালা বলে, "পিণ্টুর জ্বর বেড়েছে। পিয়ারী ভেতরে এসে দেখে, সত্যিই জ্বর খুব বেড়েছে। পারুলবালা ওর মাথার কাছে বসে হাওয়া করতে সুরু করল। পিয়ারী ভাবে, বাংলার মা ছেলেকে ভালবাসে বলেই তো, বৌএর সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া করে। তবুও, ভালবাসা তো মিথ্যে নয়।

বাইরে অসংখ্য জোনাকি পোকা জ্বলছে, যেন জীবনের অসংখ্য অভাব। পিয়ারী বলে, "মা, আমি রামদিয়ায় চললাম, ডাক্তার আনতে। খুব ভাল মনে হচ্ছে না।" চিন্তিত মুখে পিয়ারী বেরিয়ে যায়।

শক্তি সেন এল, "আমিনবাবু আমি যাচ্ছি, আপনি বসুন।" পিয়ারী কৃতজ্ঞতা বোধ করে ছেলেটির কথায়। হবে না কেন, শিক্ষিত, মার্জিত ছেলে বি, এ পড়ে।

পিয়ারী বাইরে এসে বসে। মাথায় তার অসংখ্য চিন্তা। ছেলের অসুখ বদলী কোথায় যেতে হবে, বহরপুরের শীট, খামড়া রেকর্ডগুলি শেষ-বারের মত দেখতে হবে। জীবনে তার প্রতিষ্ঠা নেই, শুধু ঘুরে বেড়ান।

রামদিয়ার ডাক্তার ক্ষীতিশবাবু এসে ছেলেকে দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তিনি পিয়ারীর সততা সম্পর্কে জানেন, বলেন, "না, বিদেশী অতিথির কাছ হতে পয়সা নেব না।"

শক্তি সেন দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, "আপনার কাছে এ গ্রামের অনেক ঋণ, তা আগে শোধ হক।"

পিয়ারী কৃতজ্ঞ চিত্তে ডাক্তারবাবুর হাত ধরে অনুনয় করল "যদি, কাল একবার আসেন।"

ডাক্তারবাবু বলেন, "আসব বইকি। ভয় পাবেন না।"

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

শক্তিবাবু বলেন, "পিয়ারীবাবু আমি আজ রাত জাগব। একটায় আমায় তুলে দেবেন।" পিয়ারী সশ্রদ্ধ চোখে এই যুবকের দিকে তাকায়। বলিষ্ঠ, কালো, দীর্ঘদেহী এই যুবকের হৃদয়ও বিশাল।

পিয়ারী বলে "ডাকব।"

শক্তি সেন বলে, "পিয়ারীবাবু, আপনারা এত পরিশ্রম করেন, মাঠে মাঠে, রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ে, আর আপনাদের কি দুরবস্থা। কেন কাজ করেন, বিদ্রোহ করতে পারেন না। সব আমিন একসঙ্গে গিয়ে বলুন, এ মাইনেতে আমাদের চলছে না। ইংরেজ রাজত্বে ফাটল ধরবে।"

অন্ধকারে পিয়ারীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এমন কথা কেউ বলতে পারে! সাহেব অফিসারদের দীর্ঘ দেহগুলি চোখের ওপরে ভেসে ওঠে; ফকাস্, কিণ্ডর্সলি, পিনলে, কার্টার, হিল, বার্জ, বেল সাহেব। আমিন কানুনগো তো দূরের কথা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পর্যন্ত শোনেনি সাহস করে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে।

শক্তি সেন বলে, "অবশ্য স্বাধীনতার পরে আপনাদের অবস্থাও ভাল হবে। আপনাদের এই ওল্ড সিস্টেম অব মেজারমেণ্টও বদলাবে। থাক, আমি চলি। ঠিক একটায় ডাকবেন, মেয়েদের কারুর জাগার প্রয়োজন নেই।" শক্তি সেন চলে গেল।

রাত প্রায় দশটা হল। সবাই একে একে খেয়ে শুয়ে পড়ে। বনো আগেই খেয়ে শুয়ে পড়ল। রাধুকে পারুলবালা বলে, কিছু কাঠ দিয়ে গরমজল বসিয়ে রাখতে, যদি ছেলে পায়খানা করে ঠাণ্ডা জল ছোঁয়াবে না। রাধু রান্নাঘরে গেল জল বসাতে। অল্প অল্প আগুনে দুখানা লম্বা কাঠ দিয়ে এল, যদি একটু একটু করে আগুন জ্বলে, জল গরম থাকবে।

রাধুর দুচোখে কালি পড়েছে অশান্তিতে, অভাবে। দুরাত ঘুমোয় না। সে শুতে যায়। পারুলবালা বলল, "আমি ঘুমোব না, প্রয়োজন হলেই আমাকে ডাকবি। একটু বিছানায় গা দেব।"

পিয়ারী জেগে রইল, ছেলের শিয়রে। রাত বেড়ে চলেছে, মশার গুঞ্জনও চলেছে সমান তালে। পিণ্টু নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। পিয়ারী একবার কপালে হাত রেখে পিণ্টুর জ্বরের তাপ অনুভব করে মুখ বিকৃত করে। ডাক্তারবাবু বলেন, "ভয় নেই।"

ঘুম এমনই, যদি না ভাঙ্গে, তাকেই বলে মৃত্যু। ঘুম এসে পিয়ারীর দুচোখ আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবুও জোর করে চেষ্টা করে জেগে থাকতে।

গভীর কালো রাত, আকাশ যেন শত শত তারার চোখ দিয়ে পিয়ারীর দিকে, এই ঘরের দিকেই তাকিয়ে আছে। নীচের জোনাকিগুলো যেন আকাশের তারারই ফুলকি, নিমগাছটার মধ্য দিয়ে ঘুরে মরছে। পিণ্টু নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু কাশছে আবার ঘুমোচ্ছে। পিয়ারী খুব সন্তর্পণে উঠল, মশারীটা ফেলে চারদিক গুঁজে দিল। ঘরের কোণে রাখা চোঙটি খুলে শীটটা বের করে স্কেল, ডিভাইডার নিয়ে বসল। খসড়ার সঙ্গে সব মিলিয়ে দেখে নিল। তারপর বহরপুরের যতগুলি পানবরজ ছিল, উঁচু পুকুর ছিল সেগুলি ভাল করে আঁকল, তারপর শীটটা বন্ধ করে তুলে রাখল। খসড়া রেকর্ডগুলি বেঁধে রেখে দিল।

অন্ধকার রাত, বাইরে একটা শব্দ হলে ভয় হয়। সন্তর্পণে হ্যারিকেন উঁচু করে দেখল, পিণ্টু নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। সেনদের দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। এখনও তো একঘণ্টা। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসে। একটা মাদুর পেতে নিয়ে ঘরের কোণে একটু চোখ বুজল। যাক, এগুলি কাল কানুনগো সাহেবকে দিতে পারবে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ বহুকণ্ঠের চিৎকারে ধড়ফড় করে উঠে বসে। আগুন, আগুন, আগুন, চিৎকারে লাফ দিয়ে উঠতেই জানালা দিয়ে দেখে রান্নাঘরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে, ধোঁয়া আর আগুনের আভায় চারিদিক আলো হয়ে উঠেছে। বাইরে অনেকে চেঁচাচ্ছে, আমিন ঘরের ভেতরে, পিণ্টু ঘরের মধ্যে। আগুন ততক্ষণে রান্নাঘর ছেড়ে শোবার ঘরে এসে পেঁৗছে গেছে। খড়ের ঘর, মহাউল্লাসে আগুন ঘরের চালে নৃত্য করছে। ঘরের দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা, পিয়ারীবাবু, আমিনবাবু, আগুন লেগেছে।

পিয়ারীলালের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাইতো, বহরপুরের ম্যাপ, খসড়া পুড়ে গেলে তো সর্বনাশ। একলাফে ম্যাপের চোঙটা আর রেকর্ডের

বাণ্ডিলটা নিয়ে দরজা খুলে বাইরে আসতেই, শক্তি সেন বলে, "পিণ্টু কোথায়? পিণ্টুকে আনেন নি? ঘরের ভেতর রয়েছে? একি ম্যাপ রেকর্ড বগলে।" পিয়ারীর তখন খেয়াল হল, সে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে পিণ্টুরে, তোকে মেরে ফেললাম।" জনতা তখন হায় হায় করছে। কথা বলার সময় নেই, ধোঁয়া আর আগুনের হল্কায় টেঁকা যাচ্ছে না। শক্তি সেন একলাফে ঘরে ঢুকে পড়ল, তার স্যাণ্ডো গেঞ্জী গায়ে পেশী-বহুল দেহ যেন কঠিন কর্তব্যের আভাস পেয়ে নেচে ওঠে, তার পরেই সে ধোঁয়া আর আগুনের সমুদ্র হতে বেরিয়ে এল পিণ্টুকে বুকে নিয়ে। পিণ্টুর গায়ে আঁচও লাগেনি। বাইরে আসতেই, পারুলবালা ঝাঁপিয়ে পড়ে পিণ্টুকে বুকে তুলে নেয়। পিয়ারী শক্তি সেনের দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, "বাবা আপনি আমার ছেলেকে আজ জীবন দিলেন, নইলে···।

সমস্ত লোক ভর্ৎসনার চোখে পিয়ারীর দিকে তাকায়। বোসবাবুর মেজ ছেলে এগিয়ে এসে বলেন, "আপনি ছেলেকে আগুনের মাঝে ফেলে ম্যাপ, খসড়া নিয়ে বেরোতে পারলেন? ধন্য লোক আপনি।" পারুলবালা তীব্র দৃষ্টিতে পিয়ারীর দিকে তাকিয়ে পিণ্টুর মাথায় হাত বুলোয়।

বনোয়ারীলাল বলে, "মা পিণ্টু তাকাচ্ছে, ওর গা দেখ ঠাণ্ডা।" সবাই দেখে সত্যিই তাই, পিণ্টুর জ্বর পড়ে গেছে। রাধু অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি কটাক্ষ করল। যদি ছেলের কিছু হত! পিয়ারী চোখ নীচু করে রইল। সমাগত জনতাব যে একাংশ আগুনে জল ঢেলে নিবোল, তারা উপায় না দেখে জল ঢালা বন্ধ করে দিল। যাক সেনেদের দালানতো একটু দূরে, কোন ভয় নেই। কাছাকাছি কোন বাড়ীও নেই। সবাই এখন পিয়ারীলালের প্রতি ধিক্কাবে মুখব হয়ে উঠল। শক্তি সেন বলল, "যা জিনিসপত্র বার করা গেছে সেগুলি আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল বংশী।"

পিয়ারীলাল সেই বহ্নি-উৎসবের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে যুক্তকরে ছেলের জীবন রক্ষার জন্য প্রণাম করে, তার দুই চোখ দিয়ে অজস্র অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। শক্তি সেন কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে জনতার সঙ্গে কথায় যোগ না দিয়ে পিয়ারীকে বলল, "যদি ভগবান থাকেন, তাহলে তার সৃষ্টিকে ভালবাসার জন্য, কাজের এই গভীর আত্মনিমগ্নতার জন্য

তিনি নিশ্চয়ই বিচলিত হবেন। জানি না, সাধনার কোন স্তরে উঠলে মানুষ নিজের রক্ত মাংসের ছেলেকে ভুলে আগুনে ফেলে, নিজের কর্তব্য করতে পারে। ভারতবর্ষে যেদিন সাধারণের ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন এ ঘটনা সেখানে নিশ্চয়ই স্থান পাবে।" শক্তি সেন পিয়ারীকে হাত জোড় নমস্কার করে।

ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুন তখনও।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### ॥ এক ॥

মানুষের জীবন নদীর স্রোতের মত। একটা একটা করে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যেতে যেতে তার আয়ু শেষ হয়ে আসে। বহরপুরের পরেও কত বছর কেটে যায়। ঘুরতে হয় ফরিদপুরের ধুলদী হাট, শিববামপুর, চৌদ্দরশি, ভেদরগঞ্জ, পালং, চান্দের চর, উজানী, নড়িয়া, ভুজেশ্বর, জাজিয়া,··· । ঐ একই কাজের পুনরাবৃত্তি। ১৯৪৫ সনে জুটরেগুলেশানে কাজ করতে হয়। কোথাও স্থিতি নেই। ১৯৪৬-১৯৪৭ সনে বরিশালে সেট্‌লমেণ্টের কাজে ঘুরে বেড়াতে হল সায়েস্তাবাদ, চরবাড়ীলামপুর, বাসণ্ডা, ঝালকাটি, আরও কত জায়গায়। তার নাম, বিবরণ আজ স্মৃতির পাতায় অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কত বিবরণ, কত ঘটনা, কত দৈন্য, কত জীবনধারা সে দেখেছে। মনের ওপর দাগ কেটে কেটে তারা মনকে প্রায় অনুভূতিহীন করে তুলেছে। তার কাছে এমন মানুষের জীবনধারা-প্রবাহে সব জায়গায়ই তো একই নিয়ম। ব্যতিক্রমগুলি শুধু মানুষের গড়া, কাল্পনিক। মানুষ যদি দেশের গ্রামের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ না থেকে, সারা পৃথিবী ঘুরে দেখত, তাহলে সে সঙ্কীর্ণতাটুকু তার ঝড়ে পড়তো।

এরপর এল দেশব্যাপী পরিবর্তন। দেশ স্বাধীন হল। ভারত-পাকিস্তান হল। কত লোক বলি হল তার সীমা রইল না। নোয়াখালি, বরিশাল, ঢাকায়, কতলোকের রক্তে বোবামাটি লাল হল, কত নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গিয়ে, হারিয়ে গেল চিরজনমের মত। তার কোন হিসেব নেই। আরও হারিয়ে গেল, দেশের মাটি, পূর্ববঙ্গ।

যশোর গেল, খুলনা গেল, বরিশাল, ফরিদপুর, মৈমনসিং, রঙ্গপুর আরও কত। সে মাটি নাকি এখন আর এপারের লোকের নয়। যে চৌদ্দপুরুষের ভিটেতে তারা দুঃখে কষ্টে জীবন কাটিয়েছে, তারা কোন মন্ত্রবলে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পরে, পর হয়ে গেল। তারপর সে কি ওলোট পালট। সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়ে কে কোথায় হারিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। বারো জেলার ঘণ্ট হয়ে কলকাতার আশেপাশে কতো কলোনি গড়ে উঠল; যে যেখানে পারল মাথা গুঁজল। আর যাদের কিছু উপায় নেই, তারা পড়ে রইল সহস্র জাতির লোকের আনাগোনার পথের উপর, তাদের সন্ধানী চোখের সামনে।

২১শে আগষ্টের অপশানে পিয়ারী আলিপুর এসে যোগ দিল। আবার সেই পুরানো ২৪ পরগণা। প্রথম পোষ্টিং হল টাকীতে। নদীপারের ভাঙ্গা জমিদার বাড়ীতে হল তাদের ক্যাম্প। সামনেই তরঙ্গময়ী ইছামতী, ওপারে খুলনা। বাসা করল ঢাকুরিয়ার এক জবরদখল কলোনিতে। ক্ষুদিরাম ও তারা পাশাপাশি রইল। জ্ঞানদাবাবু ও খুড়ীমা উঠলেন এক ভাড়া বাড়ীতে। ১৯৪৮ সনে জ্ঞানদাবাবু মারা যান, হঠাৎ। খুড়ীমাকে, তার ভাইপোরা এসে নিয়ে যায়, তাদের কাছে গুমো-হাবড়ায়।

॥ দুই ॥

১৯৪৭ সনের পরে আরও সাতটি বছর পার হয়ে গেল। ১৯৫৫ সন। ১৯৫৩ সনের আইনে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা ঘোষিত হল।

এখন হতে সমস্ত জমির মালিক সরকার।

পিয়ারী দেখেছে, মুর্শিদাবাদে ১৯৫৫ সনে যখন সে ইউ. টি. কানুনগোদের ইমামবাড়ীতে ইনসট্রাকটার ছিল, তখন হাজার দুয়ারীতে নবাবের সভা হতে, মাননীয় আইনমন্ত্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঘোষণা করলেন, জমিদারী উচ্ছেদের কথা। সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, ১৩৬২ সন, বাংলা। প্রজাদের মুখে হাসি ফুটল। সে সব কথা কারুর তো অবিদিত নেই। তারপর··· ? তারপর পিয়ারী গড়িফায় ঘুরল ধপধপি গেল, শেষে ভাঙ্গরে কাশীপুরে অনেকদিন বদর আমিনের কাজ

করল। এটেস্টেশান শেষ হবার পর, সে বদলী হল শখের বাজার সার্কল ক্যাম্পে। ২৪ পরগণা তার চাকরীর প্রথম কর্মস্থল, আবার বহুদিন পরে জীবনের প্রান্তে সেখানে ফিরে এল। কিন্তু কত পরিবর্তন হয়ে গেছে এসব জায়গার! সে সব ঘরবাড়ী, মানুষজন কোথায় গেল। সব নতুন যেন আজ, এমন কি বর্তমান সেট্‌লমেণ্ট পর্যন্ত। এ সেট্‌ল-মেণ্ট হল জমিদারী উচ্ছেদের জন্য, ভূমিহীনদের জমি দেবার ব্যবস্থার জন্য কিন্তু এবার খানাপুরি হল না, কিস্তোয়ার হল না, বুঝারত হল না; সোজা খসরা এনকোয়ারীর পর এটেস্টেশান।

আইনও বদল হল। নতুন নতুন আপত্তির ধারা হল। সব নতুন। পিয়ারী এ আইন ভাল বোঝে না, সে বোঝে মাঠ, মাটির সঙ্গে পরিচয়ই তার নিবিড়। এতবড় পবিবর্তন যেন সে ভাল চোখেই দেখত না। আর সে বয়সও নেই, এ রূপান্তরের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর।

পরিবর্তন কি শুধু সেট্‌লমেণ্টে আর দেশেই হয়েছে? তার জীবনে কি কম পরিবর্তন এল। বনো আই-এ পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছে। মাইনে পায় দেড়শো টাকা। কতগুলি তুচ্ছ কারণে সে দাদার সঙ্গে পৃথক হয়ে পড়ল। পারুলবালা চলে গেল বনোর সঙ্গে। মাকে হারিয়ে পিয়ারী খুব কেঁদেছিল।

পিণ্টু মন দিয়ে পড়ছে, তার মাথা যেন কাকার চেয়েও ভাল হয়েছে। মাইনে তার কিছু বেড়েছে, কিন্তু তবুও সংসার যেন অচল। কলকাতা সহরে টাকা না হলে যেন কেউ কাউকে খাতির করে না।

এই সময় পিয়ারীর এক একটা দিন যেন দুঃখ কষ্টের প্রতিমূর্তি। ঘরে চাল নেই, তরকারি নেই, পয়সা নেই। পিণ্টু টিউশনি করে নিজের খরচ চালায়। ম্যাট্রিকের সময় সেবার ভাল নাম পাল্টে নিয়েছে, কিশোরীলাল সরকারের পরিবর্তে এখন নাম হয়েছে, অমল কুমার সরকার। পিয়ারীর পছন্দ হয়নি, বংশের ধারাকে এভাবে পাল্টে দেওয়া। ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে সে মুখ নীচু করে জবাব দিয়েছে, "নতুন যুগ বাবা, ও নাম কি মানায়।" পিয়ারী ভয়ে আর কোন কথা বলে নি, কি জানি ছেলে যদি আরও কিছু বলে। শিক্ষিত ছেলেতো। রাধুর ভারি পছন্দ হয়েছিল ছেলের নতুন নাম। মা-ছেলেতে খুব ভাব, কেবল সেই যেন কক্ষচ্যুত হয়ে

পড়ছে। ছেলে মাকে শহরের নতুন গল্প শোনায়, মা অবাক হয়ে শুনে বলে, ভারি আশ্চর্য তো। পিয়ারীর মনে হয় ঐ ভারি আশ্চর্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে তার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব : তুমি কি করলে।

পিয়ারীও ভাবে, সত্যিই তো, কি করল সে, জীবনব্যাপী দুঃখকষ্ট ভোগ ছাড়া ? মানুষের কাছে ছোট হওয়া, মাথা নীচু করে থাকা, অভাব অভিযোগের সঙ্গে লড়াই করা ছাড়া ? চোখের দৃষ্টিশক্তিও কমে এসেছে। খুব সাবধানে চলতে ফিরতে হয়। শরীরে শক্তিও তেমন যেন নেই।

সেদিন ১৯৫৮ সনের শীতের প্রারম্ভে, দুপুরে, শখের বাজারে পিওন দিয়ে সেট্‌লমেণ্ট অফিসার তাকে ডেকে পাঠালেন। পিয়ারী ভাবল, ভালই হল, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে বিশ্রাম করা যাবে। রেভিন্যু অফিসার ব্যানার্জী সাহেবের কাছ হতে ছুটি নিয়ে সে পিওনেব সাথে বাসে উঠল।

মোমিনপুব এসে গাড়ী বদল করে তিনতলার অফিসে যেতেই, হেডক্লার্ক তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলেন, "নিন, সই করুন এই খাতায়।"

পিয়ারী কম্পিত হস্তে বাংলায় সই করল। চিঠিখানা ইংরিজীতে, অন্য এক বাবুর কাছ হতে সে পড়িয়ে নিল। বাংলা অর্থ করে তিনি বললেন, "তোমার পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হল আজ, কাল থেকে চাকরীতে আর আসতে হবে না। এই কদিনেব মাইনে সামনেব এক তারিখ এসে নিয়ে যাবে।"

পিয়ারী নিথর, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তাহলে তার আর চাকরি নেই ? এব কি অর্থ ? মনে পড়ছে, সেই বহু বছর আগে খুলনার সাতক্ষীরার এক গ্রামে ফকাস সাহেব এসেছিলেন, পিয়ারী তখন যুবক। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা বলতো গাণ্টাব চেনের লেংথ কত ?

পিয়ারী চট করে উত্তব দেয়, একশো লিঙ্ক বা বাইশ গজ।

সাহেব উজ্জ্বল চোখে তাকান।

বেশ বেশ এই প্লটটা মাপতো।

পিয়ারী একার-কমৃব ও ডিভাইডার দিয়ে মেপে বলে, এক একর ত্রিশ শতক।

সাহেব প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলতো খতিয়ানের কোন কলমে দখল লেখা থাকে।

পিয়ারী বলে, তেইশ কলমে।

ফক্কাস সাহেব খুশি হয়ে বলেন, আই সি, তুমি ভবিষ্যতে একজন গুড আমিন হবে। তার হাতেই তো তার চাকরী। আর আজ? সেদিন ঐ কোণটায় সে প্রথম নিয়োগপত্র পায়।

ইংলিশ অফিসে সকলে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। একজন পিওন এসে বলল, "দেখি আমিনবাবু চেয়ারটি ছাড়ুনতো, এই রেভিন্যু অফিসারকে একটু বসতে দিন।"

পিয়ারী উঠে ধীরে ধীরে বাইরে এল। কোথায় গেল তার আমলের সেই সব লোকগুলো? এরা কারা? সব নতুন মুখ। তাহলে সেও চলল.........?

তিনতলা হতে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে দাঁড়াল গোপাল নগর রোডের ওপর।

একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল দৈত্যের মত বিরাট লাল বাড়ীটার দিকে. তার মায়া নেই, দয়া নেই, সে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। তার মাথার উপর বিরাটকায় জাতীয় পতাকা সগর্বে উড়ছে।

পিয়ারী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সেদিকে তাকিয়ে। কাল থেকে তাহলে সে আর আসবে না এখানে? তার প্রয়োজন তবে ফুরালো?

পিয়ারীর জীবন এইতো শেষ। এখন তো কোন রকমে কটা দিন বেঁচে থাকা। দিন গুজরান করা। কলকাতা শহরে ছুটকো কাজও তেমন মেলে না। তাছাড়া তার চোখেও আর তেমন জোর নেই। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা কাঁপে।

তবু কাজের চেষ্টা করতে হবে, আয়ের চেষ্টা করতে হবে যতদিন পিন্টু না দাঁড়ায়। ঘরে বসে সে অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন চিন্তা করছিল।

বাইরে রাধু আর পিন্টু আলোচনা করছিল। টালিগঞ্জ হতে পারুলবালা আর বনো এসেছে বেড়াতে। তারা সেখানে বাসা ভাড়া

করে আছে, বনোর বিয়ের চেষ্টা চলছে। নানা কথার পরে, বনো বলে, "দাদা একদম আহাম্মকের মত কাজ করেছে। সারা জীবন পরিশ্রম করল, কিছু করতে পারল না। কত আমিন ফন্দী ফিকির করে পয়সা রোজগার করছে। উনি ভারি সাধুমহারাজ সেজে কাটালেন। এখন বোঝ।"

রাধু বলে, "সারাটা জীবন আমার হাড় মাংস কালি কালি হল। একখানা ভাল কাপড় কোনদিন পরতে পারলাম না। একজোড়া জুতো চোখে দেখলাম না।"

পিন্টু মায়ের দিকে করুণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "জীবনের অভিজ্ঞতা হতে কোন উইজডমই বাবার হয়নি, তাই এই অবস্থা।"

পিয়ারী শুনছে ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু বলবার কিছুই নেই। এইতো জীবন। মানুষ, পরিজন, সমস্ত জীবনের পাওয়া সুখ একনিমেষে ভুলে যায়, যদি একদিনও সে দুঃখ পায়। একি, চোখে জল আসছে কেন? মনে হল, না, একেবারে যে তার কোন শিক্ষা জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হতে হয়নি, তা নয়। দুটি শিক্ষা তার জীবনে হয়েছে। এক, মাটি কোনদিন কেনা যায় না। সে আপনও হয় না। মাটি নারীর মত, দাপটের বশ। যখন যার অধীনে, তখন তার গান গাইবে।

দ্বিতীয়, মানুষও কোনদিন আপন হয় না। যতদিন সে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারলনা, ততদিন সে বাধ্য। পাখীর মত তার স্বভাব। পক্ষিশাবক যতদিন না উড়তে শিখল, ততদিন মাব বাসায় থাকে। মার মুখ হতে খাদ্য খায়। তারপর একদিন যখন তার পাখায় জোর এল, তখন সে চিরপবিচিত নীড় ছেড়ে অনন্ত আকাশে উড়ল। কোথায় পড়ে রইল তার মা, কে তার ঠিকানা রাখে।

হ্যাঁ এই দুটি সত্যই সে জীবনে খুঁজে পেয়েছে। দুফোঁটা চোখের জল টপ টপ করে তার হাতের উপর পড়ল। যেন জীবনেব দুটি শিক্ষা।

"মাটিও আপন হয়না, মানুষও আপন হয়না।"

সমাপ্ত